প্রথম অধ্যায়

বিমল কর : জীবন ও সমকাল

বাংলা গল্পের ধারায় বিমল কর হলেন এক তত্ত্বদ্রোহী স্রষ্টা। ভাববস্তুর গভীরতা ও প্রকরণের অভিনবত্বে তিনি বাংলা গল্পকে স্বতন্ত্র শিল্পসুষমায় সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্পের চিরাচরিত ধারণাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের শৈল্পিক স্পৃহা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। বরং বিমল করে'র সৃষ্টির নান্দনিক প্রভাবে বাংলা গল্পবিশ্ব বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনিবার্য এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। জীবন ও গল্পের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে তিনি শিল্পিতভাবে বারে বারে অতিক্রম করতে সাহসী হয়েছেন। ফলে বাংলা গল্পের ইতিহাসে বিমল কর হয়ে উঠেছিলেন এক ছক-ভাঙা গল্পকার। ঘটনাবহুল সমকাল ও অভিজ্ঞতাময় বিচিত্র জীবনই তাঁর নতুন মাত্রার গল্প সৃষ্টিতে প্রেরণা হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিকের কাছে বৃহৎ আধার হল তাঁর নিজস্ব জীবন। চলমান কালের নানা মাত্রায় নিষিক্ত জীবনই যেন রূপায়িত হয়ে ওঠে সাহিত্যে। সমকালের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে জীবনের বিচিত্র স্বরায়নকে আত্মস্থ করেই বিমল কর গল্প সৃজনে মগ্ন হয়েছিলেন। বিশ শতকীয় সময় যেমন তাঁর মনোজগতকে জারিত করেছিল, তেমনি এই সময়পৃক্ত জীবনবোধই প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন গল্পে। সমকাল বিমল করের সাহিত্যিক সত্তাকে ক্রমশ নির্মাণ করেছে। আর তিনি সৃষ্টির মধ্যে সমকালের ভাষ্যকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাই একুশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিমল করে'র গল্পের পুনর্মূল্যায়নে তার জীবন ও সমকালকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

১৯২১ খ্রিঃ ১৯ সেপ্টেম্বর (১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ৩রা আশ্বিন) উত্তর চব্বিশ পরগণার টাকির নিকটে নদীসংলগ্ন প্রত্যন্ত গ্রাম শঙ্খচূড়ায় মামার বাড়িতে বিমল করের জন্ম। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত-বসিরহাট সংলগ্ন নলকোড়া গ্রামে ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান। মা নিশিবালা কর ছিলেন গৃহবধূ। বাবা জ্যোতিষচন্দ্র কর এবং জ্যাঠা সতীশচন্দ্র, কাকা নগেন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি করতেন। ছোটকাকা হরিচরণ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া

শেষ করে কোলিয়ারিতে চাকরিরত ছিলেন। বিভিন্ন সাংসারিক কারণে ও বড়দের চাকরির সুবাদে ছোটোবেলায় জন্মভূমির সঙ্গে বিমল করের তেমন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে নি। শৈশব ও কৈশোরে তিনি হাজারিবাগ-ধানবাদের রেল কোয়ার্টার, কালিপাহাড়ি-জামাডোবা কোলিয়ারি, আসানসোল-কুলটি বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুমা শরৎকুমারীর অভিভাবকত্বে সবার সঙ্গে মিলে মিশে দিন কেটেছে। ধানবাদের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে বাল্যশিক্ষা লাভ করার পর বিমল কর ধানবাদ একাডেমি, আসানসোল রেলওয়ে স্কুল, কুলটি ম্যাকমিলান ইনস্টিটিউশনে ক্রমান্বয়ে পড়াশুনা করে ১৯৩৯ খ্রিঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শৈশবকালে হাজারিবাগের রেলওয়ে কোয়ার্টারে বোনের আকস্মিক মৃত্যু এবং পরবর্তীতে ১৯৩৪ খ্রিঃ বিহারের ভূমিকম্পে অজস্র মানুষের মৃত্যু তাঁর চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। ফলে তাঁর চেতনায় মৃত্যুবোধ ক্রমশ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে, বিমল করের সৃষ্ট সাহিত্যে মৃত্যুচেতনা প্রায়শই অনিবার্য সত্যরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শারীরিক-মানসিক দ্বিবিধ যন্ত্রণার অসহনীয় অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে সম্যকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে বিমল করের বক্তব্যে তারই প্রকাশ—

> ‘অ-নেক অনেক পরে আমি অনুভব করলাম, সদ্য কৈশোরের সেই দীর্ঘ অসুস্থতা, নিঃসঙ্গতা, শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক কষ্ট আমার জীবনে একটা যেন গভীর দাগ রেখে গিয়েছে। আবার উপকারও অনেক করেছে।...ওই ছ’মাস রোগশয্যায় পঙ্গু হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে আমি কত শীর্ণ, বিবর্ণ, শুষ্ক হয়ে উঠেছিলাম—তার কথা কবে ভুলে গিয়েছি, কিন্তু কৈশোরের ওই দিনগুলি বিশেষ এই পরিবেশে আমাকে অন্যভাবে কত কী হাতে গুঁজে দিয়ে যাচ্ছিল তার কথা তো ভুলিনি।’[১]

শারীরিক-মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেও ছোটোবেলায় বিমল করের বাড়িতে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ছিল। ধানবাদ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের পাঠাগারের সৌজন্যে শৈশবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর–সুকুমার–দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে তিনি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সময় রেল

কোয়ার্টারে 'মেঘনাদবধ' যাত্রা দেখে মুগ্ধ এই বালক মাইকেল-কৃত্তিবাসের প্রভাবে স্বয়ং মেঘনাদকে কেন্দ্র করে বীরত্বমূলক পালা রচনা করেছে। সেজকাকার সংগৃহীত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', এমনকি 'দেশ' পত্রিকাও সে মুগ্ধ হয়ে পড়ে চলেছে। কালীপাহাড়ি কোলিয়ারিতে সেজকাকার বাড়িতে পায়ের আঘাতে ছয় মাস শয্যাশায়ী অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র–শরৎচন্দ্র–রবীন্দ্রনাথ–প্রভাতকুমারসহ মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' প্রভৃতি পাঠে ক্রমশ বিমল করের সাহিত্যিক সত্তা জারিত হয়। শৈশব-কৈশোরে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন সেজকাকিমা। তবে সাহিত্যপাঠ কিংবা সাহিত্য আলোচনায় সেজকাকিমার প্রশ্রয় থাকলেও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তিনি কারোর কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করেন নি। ফলে, ছোটোবেলা থেকে মন ও মননের স্বকীয় তাগিদে বিমল কর সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট অভিমত —

> '....সাহিত্য রচনার প্রতি আগ্রহ বোধ করার ব্যাপারে পারিবারিকভাবে আমায় কেউ উৎসাহিত করেন নি; এমন কি যে সেজকাকিমা আমার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন তিনিও আমায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হতে বলেন নি। সাহিত্যপাঠের সুযোগ এবং রুচি ছাড়া পারিবারিকভাবে আমি কিছুই পাইনি। বরং এ বিষয়ে তাঁদের ঘোরতর আপত্তিই দেখা গেছে।'[২]

বড়ো হয়ে কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ার বা ম্যানেজার হওয়ার ব্যক্তিগত সাধ থাকলেও বাড়ির গুরুজনেরা বিমল কর'কে ডাক্তার করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে আই.এস.সি. ক্লাসে তাঁকে ভর্তি করা হল। ইতিমধ্যে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কলকাতায় তার প্রভাব পড়তে থাকে। মহানগর জুড়ে নেমে এল 'ব্ল্যাক আউট'। পরীক্ষা শেষের পর জামাডোবায় গিয়ে ভাগা রেলওয়ে লাইব্রেরির কল্যাণে বিমল কর ন্যুট হামসুন, টুর্গেনিভ, লিও টলস্টয়, ইবসেন, বুনিন প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। টলস্টয়ের 'হোয়াট মেন লিভ বাই' গল্প পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। দেশীয় সাহিত্যের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের সংস্পর্শে এসে তাঁর সাহিত্যবোধ প্রসার লাভ করে। গল্পের ক্ষেত্রে টলস্টয় এবং নাটকের ক্ষেত্রে ইবসেনই বিমল করে'র আদর্শ হয়ে ওঠে—

> ‘ইবসেনের নাটকের তখন থেকেই আমি এত অনুরাগী হয়ে উঠেছিলাম যে, মনে হত—আমি যদি কোনোদিন নাটক লিখি–ইবসেন হবে আমার আদর্শ। কিংবা আমি যদি কোনোদিন গল্প লিখতে পারি—টলস্টয়ের ‘হোয়াট মেন লিভ বাই’ ধরনের দু’একটা গল্প লেখার চেষ্টা করব।’[৩]

প্রত্যাশিত ফলাফল না হওয়ায় অভিভাবকরা বিমল করকে শ্রীরামপুর কলেজে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠের জন্য ভর্তি করে দেন। কিন্তু তাঁদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। শ্রীরামপুর থেকে পালিয়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা নিমজ্জিত হয়েছে সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়। ‘পথের দাবী’ অনুসরণে রচিত হয়ে গেল নাটক। কিন্তু মানের নিরিখে সেই নাটক উত্তীর্ণ হল না। ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ পটপরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুকে হেনস্তা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু জনমানসে গভীর ছাপ ফেলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করল। এশিয়া–আফ্রিকা–ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও আতঙ্কের বিবরণ বিমল করের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে —

> ‘জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পর বোঝা গেল, যথার্থই বিশ্বযুদ্ধ লেগে গিয়েছে। য়ুরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া—সর্বত্রই তখন যুদ্ধের ধোঁয়া।...কলকাতার চেহারা যেন চোখে পলকে পালটে গেল। শুরু হয়ে গেল শহর ছেড়ে পালানো। যাকে বলা হয় ইভাক্যুয়েশান।’[৪]

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে কলকাতা ত্যাগ করে হাজারিবাগের ধানোয়ার রোডের বাড়িতে চলে গেলেন বিমল কর। দেশ-বিদেশের বিবিধ সাহিত্যের সংস্পর্শে এলেন তিনি। আনাতোল ফ্রাঁসের ‘দি অ্যাসপিরেশনস অফ জাঁ সারভে’ উপন্যাস তাঁকে প্রাণিত করে। যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেলে আবার তার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন; বন্ধুদের সহায়তায় বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। কলেজে পড়ার সময় কলকাতা জুড়ে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রাম পোড়ানো, ছাত্রদের মিছিল, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ইত্যাদি নানা ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এইসময় ভয়ংকর এক সামুদ্রিক

ঝড়ে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা বিমল করের অন্তর্জগতে আলোড়ন তুলে যাচ্ছিল।

এই অবস্থায় মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে বিমল কর এ.আর.পি.তে ওয়ার্ডেন হিসেবে প্রথম কাজে যোগদান করেন। চাকরির পাশাপাশি বন্ধু অরুণ ভট্টাচার্যের প্রেরণায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় ও র‍্যাডিক্যাল পার্টি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাল প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বিমল কর স্বীয় সাহিত্যিক সত্তার আত্মপ্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কলেজের বন্ধু সুনীল দত্ত ও শিশির লাহিড়ীর সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন একটি সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকার নাম হল 'পূর্বমেঘ'। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প 'গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি'। 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং তথ্য দিয়েছেন —

> 'পত্রিকার নাম 'পূর্বমেঘ'।....এই নামের পেছনে একটা যুক্তি ছিল, অর্থ ছিল। 'পূর্বমেঘ' হল প্রস্তুতির পর্ব। সেই অর্থে পত্রিকার নাম 'পূর্বমেঘ'।'[৫]

বিমল করের লেখক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেজকাকা, সেজকাকিমা ছাড়াও আরো অনেকের বিশেষত বন্ধুদের উৎসাহ-অবদান আছে। এক্ষেত্রে সুনীল গুপ্ত, শিশির লাহিড়ী ও অরুণ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসময় রাধারমণ চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রবর্তক' পত্রিকায় তাঁর 'সৈনিক' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

এ সময় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। বিয়াল্লিশের আগস্টে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের রেশ থামার আগেই সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর। ১৯৪৩ খ্রিঃ এই মন্বন্তরের সময় এ.আর.পি.তে কর্মরত বিমল কর অজস্র মানুষের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছেন। বেঁচে থাকার জন্য চলছে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। সময়ের চোরাটানে ধ্বস্ত হচ্ছে মানুষের ন্যায়-নীতিবোধ, সর্বত্রই ধরা পড়ছে মানবিক মূল্যবোধের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ১৯৪৩ খ্রিঃ ভয়াবহ মন্বন্তর ইত্যাদি ঘটনা বাঙালির সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, পরবর্তীকালে 'দেওয়াল' উপন্যাসের তিনটি খণ্ডে বিমল কর যথাযথভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন। পরের দিকে মন্বন্তরের পটভূমিকায় তিনি 'মানবপুত্র' নামে একটি অসাধারণ গল্পও রচনা করেন।

ইতিমধ্যে মতান্তরের কারণে বিমল কর এ.আর.পি. চাকরি ত্যাগ করলেন। নৌবাহিনীতে চাকরি লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর সেজকাকার চেষ্টায় তিনি আসানসোলে চাকরি পেলেন। অ্যামিউনিশান প্রোডাকশন ডিপোয় ক্লার্কের চাকরি। এই আসানসোলে কর্মরত থাকার সময় 'প্রবর্তক' পত্রিকায় 'অম্বিকানাথের মুক্তি' নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর সেজকাকার উৎসাহে তাঁকে বেনারসে রেলের অ্যাকাউন্টস্ অফিসে যোগদান করতে হয়। বেনারসের আড়াই বছরের চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে কখনোই সুখকর হয়ে ওঠে নি। এই সময়কালে নিঃসঙ্গতা-যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হওয়ার প্রসঙ্গ তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন —

> 'বেনারস আমার একেবারেই ভালো লাগত না; মানসিক হতাশায় ভুগতাম, শরীর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে যেতে লাগল, মনের মতন কোনো সঙ্গী পেতাম না, যথার্থ বন্ধু বলে কেউ ছিল না, মেলামেশা করতেও ইচ্ছে করত না।'[৬]

বেনারসে থেকেই বিমল কর দেশজুড়ে ঘটে চলা অজস্র ঘটনাকে উপলব্ধি করেছেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ও নেতাজির অন্তর্ধান, পাকিস্তান দাবি উত্থাপন, হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনায় দেশজুড়ে আলোড়ন চলছে। বেনারসেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা 'হোয়াট ইজ মার্কসিজম্' পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় র‍্যাডিক্যাল পার্টি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ তৈরি হয় এবং এই পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কলকাতার বন্ধুদের উৎসাহে বিমল কর পুনরায় সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোযোগ দেন। তাদের তাগাদায় রচিত হল 'সায়ক' নাটক। 'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পটির খসড়াও এখানে থেকেই তিনি প্রস্তুত করেন। লেখালিখির মধ্য দিয়েই তিনি বেনারসের যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্ত থাকতে সচেষ্ট হয়েছেন —

> 'নিজের মনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হয়ত তখন মাঝে মাঝে একটু লেখাটেখা এবং পড়াশোনার দরকার ছিল। 'পিয়ারীলাল বার্জ'–নামে আমার একটা গল্প আছে। কলকাতা থেকে অরুণের তাগাদা পেতাম বলে লিখেছিলাম খসড়া করে, 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় সেটি ছাপা হয়।'[৭]

১৯৪৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। বেনারস থেকে বিমল কর স্বেচ্ছায় আসানসোলের ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টস্ অফিসে বদলি নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু ধরাবাঁধা চাকরিজীবন ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে তিনি চাকরি ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। বন্ধুদের সঙ্গে র‍্যাডিক্যাল পার্টিতে যোগদান করে বিমল কর রাজনীতিতে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেন। কলকাতায় বউবাজারের বাড়িতে থেকে চলে চাকরিলাভের চেষ্টা। ১৯৪৬ খ্রিঃ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরাগ' পত্রিকায় চল্লিশ টাকা বেতনে বিমল কর সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই 'পরাগ' পত্রিকা উঠে গেল। বন্ধু সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিমল কর 'পরাগ' পত্রিকার প্রেস লিজে নিয়ে নেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে সেই প্রেস চালাতে তিনি ব্যর্থ হলেন।

১৯৪৬ খ্রিঃ ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর ডাক দেয়। ১৬ থেকে ১৮ই আগস্ট তিনদিন জুড়ে কলকাতায় চলল তাণ্ডবলীলা। ধর্মের নামে অজস্র মানুষের প্রাণ গেল। কলকাতাসহ সারা বাংলাদেশ, বিহার জুড়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নারকীয়তা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায়—

> 'আগস্টের সেই ভয়াবহ দাঙ্গার পর তার জের আর কাটছিল না। গোটা বাংলাদেশেই মাসের পর মাস ছোটখাট হাঙ্গামা ঘটেই যাচ্ছিল। ওদিকে বড় বড় ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। যেমন নোয়াখালি। নোয়াখালির ঘটনা আজ নিছকই ইতিহাস হয়ত, কিন্তু সেদিন তার বীভৎসতা সারা দেশকে শিহরিত ও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গান্ধীজী ছুটে গিয়েছিলেন নোয়াখালিতে। বিহারেও দাঙ্গা হচ্ছিল।'[৮]

এই সময় বন্ধুদের সঙ্গে বিমল কর 'রহস্য রোমাঞ্চ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে তৎপর হলেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গল্পের অনুসরণে বিভিন্ন বন্ধুরা গোয়েন্দা-ভূতুড়ে-রহস্য ইত্যাদি গল্প লিখে পত্রিকাটি ভরিয়ে তোলেন। ১৯৪৬ খ্রিঃ পূজার সময়

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যদিও এই পত্রিকাটিরও আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। এই 'রহস্য রোমাঞ্চ' পত্রিকার সূত্রেই গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে প্রথমবার পরিচিত হন বিমল কর। লেখক গৌরকিশোর পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠেন। দাঙ্গা চলাকালীন পুলিশের ভ্রান্তিতে বিমল করকে জেলে যেতে হয়। যদিও বেশ কিছুদিন পরেই জামিন পান। এদিকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশভাগের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অসংখ্য মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে গেল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতায় খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ হল। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার পর দাঙ্গার অভিযোগ থেকে তিনি মুক্ত হলেন। পুজোর সময় হাজারিবাগে গিয়ে স্থিত হতে পারলেন না বিমল কর। চাকরির সন্ধানে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

বন্ধুদের সহায়তায় বিমলবাবু সদ্য প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় 'সাব এডিটর' পদে চাকরি পেলেন। বেতন ছিল একশ টাকা। এই পত্রিকায় থাকাকালীন তিনি প্রথম স্বনামে একটি বই রচনা করেন। গ্রন্থটি হল 'ছোটদের শরৎচন্দ্র'। ছোটদের জন্য লিখিত এই গ্রন্থটি সাহিত্যিক মূল্যের নিরিখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিছু দিনের মধ্যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাবে এই পত্রিকা থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের অক্লান্ত চেষ্টায় 'সত্যযুগ' পত্রিকায় যোগ দেন বিমল কর, যদিও সেই চাকরি স্বল্পস্থায়ী ছিল।

দেশভাগ-স্বাধীনতা লাভের পর পরই ১৯৪৮ খ্রিঃ গান্ধিজিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র উদ্বেগ। একই সঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ও বাড়ছিল শহরে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশে তীব্র আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে বিমল কর কলেজপাঠ্য বায়োলজির গ্রন্থ অনুবাদ করছেন। মণি পাল'এর 'ভারতী প্রকাশনী'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বিদ্যালয়-পাঠ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করলেন। প্রথমটি হল 'পুরাণের গল্প' এবং দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান বিষয়ক 'নীল আকাশের কোলে'।

সুনীল ধর সম্পাদিত 'নতুন জীবন' পত্রিকায় বিমল কর প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। যদিও দু-তিন কিস্তির পর সাময়িকভাবে লেখাটি বন্ধ করে দেন। সাধুভাষায় লেখা এই উপন্যাসটি প্রথমে 'ঝড় ও শিশির' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি

উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন। তবে নতুন মুদ্রণে উপন্যাসটির পরিবর্তিত নাম হয় 'বনভূমি'। নিজের প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয় —

> 'আমার প্রথম উপন্যাস 'বনভূমি'। সাধু ভাষায় লেখা। প্রচলিত উপন্যাসের ছক বা ধরন তাতে অনুপস্থিত। এই উপন্যাসটির আদি নাম ছিল 'ঝড় ও শিশির'। পুনর্মুদ্রণের সময় তার আমূল সংস্কার করি, এবং নামটাও পরিবর্তন করি।'[৯]

'ভারতী প্রকাশনী' থেকে বাণিজ্যিক স্বার্থের তাগিদে তিনি 'হ্রদ' উপন্যাসটি রচনা করেন। যদিও এই উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে তাঁর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ—

> 'বলতে বাধা নেই, 'হ্রদ' আমার প্রথম ছাপা উপন্যাস হলেও তার কোনো সাহিত্যমূল্য নেই। ব্যবসায়িক কারণে ওটা লিখেছিলুম, নিছকই পাঠককে হালকা আনন্দ দেবার জন্যে।'[১০]

এরপর গৌরকিশোর ঘোষের উদ্যোগে সংসারী হন বিমল কর। ১৯৫১ খ্রিঃ ১০ জুন কোচবিহারের মেয়ে গীতা সরকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কলকাতার পাইকপাড়ার বাসায় তিনি স্ত্রীসহ বসবাস শুরু করেন। বিয়ের পরপরই 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিমল কর পুনরায় যোগ দেন। পত্রিকার আর্থিক টানাপোড়েনে বিরক্ত হয়ে তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ' ত্যাগ করে 'সত্যযুগ'এ চলে আসেন। ১৯৫২ খ্রিঃ বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে বিমল কর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'উত্তরসূরী' নামে এই পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে বিমল করের নাম থাকলেও সম্পাদক ছিলেন শিবনারায়ণ রায় এবং নারায়ণ চৌধুরী। 'পরিচয়' পত্রিকাকে আদর্শ করে সম্পাদকদ্বয় এই পত্রিকা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 'উত্তরসূরী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ পেল বিমলবাবুর গল্প 'ইঁদুর'। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলল এই গল্প। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি —

> 'ইঁদুর' গল্পটিই আমাকে লেখার জগতে নিয়ে এল বললে ভুল হবে না।'[১১]

'ইঁদুর' গল্পটির মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ী মূল্যবোধ ও আত্মপ্রতারণার যথার্থ রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল। এই গল্প সমকালীন পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছিল। বন্ধু গৌরকিশোর এই গল্প 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে পড়তে উৎসাহ দেন। এই গল্পের পাঠজ অভিব্যক্তি সম্পর্কে সাগরময় ঘোষের মন্তব্য —

'বেশ কিছুদিন পর 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় বিমল কর-কে আবার
খুঁজে পেলাম। তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি পড়ে আমি লাফিয়ে উঠেছি।
যে করেই হোক বিমল করকে খুঁজে পেতেই হবে।'[১২]

'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে বিমল কর'কে উপস্থিত করেন গৌরকিশোর ঘোষ। এরপর সাগরময় ঘোষের অনুরোধে 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫২ খ্রিঃ নভেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হল বিমল করের 'বরফসাহেবের মেয়ে।' পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ খ্রিঃ এপ্রিলে 'দেশ'-এ বেরোল তাঁর পরবর্তী গল্প 'মানবপুত্র'। এই গল্প শুধুমাত্র সর্বজনে প্রশংসিত হয় নি, একই সঙ্গে বিমল করের সাহিত্যিকসত্তাকে উত্তরণের দিকে এগিয়ে দেয়। গল্পকারের আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ —

'এরই কোনো ফাঁকে আমার 'মানবপুত্র' গল্প দেশ পত্রিকায়
প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় গল্প।
লেখাটা এমনই উতরে গেল যে এরপর আর আমাকে দ্বিধার
মধ্যে পড়তে হয়নি। নিজের ওপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জাগল।
মনে হল, হয়ত পারব।
পেশাদারি লেখক জীবনের সেই শুরু।'[১৩]

এরমধ্যে হঠাৎ একদিন 'সত্যযুগ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় 'জনসেবক' পত্রিকায় 'বারো ভূতের গল্প' নামে বিমল কর ফিচার লিখতে শুরু করেন। একইসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে তাঁর নানা গল্প প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই দুই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত সাগরময় ঘোষ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্রমাগত উৎসাহ তাঁকে সৃজনশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। ১৯৫৩ তেই 'বরফসাহেবের মেয়ে' নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ পায়। ১৯৫৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে দেশ পত্রিকায় 'আত্মজা' নামে একটি গল্প লিখলেন বিমল কর। প্রশংসার সমান্তরালে নিন্দার ঝড় উঠল তীব্রভাবে। 'শনিবারের চিঠি'তে গল্পকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন সজনীকান্ত দাস। বিমল করকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন — 'তুমি নির্মল কর বিমলে করে মলিন মর্ম মুছায়ে।' সমালোচকদের দ্বারা বিদ্ধ হলেও ১৯৫৪ খ্রিঃ মার্চ মাসেই দোলের পর দিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠানের 'দেশ' পত্রিকার কর্মী হিসেবে যোগদান করেন বিমল কর। আর্থিক অনিশ্চয়তাকে অতিক্রম করে শুরু হল এক সাহিত্যিকের সৃজনশীল

জগতের পথে মহাযাত্রা।

'দেশ' পত্রিকায় প্রুফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই গল্প নির্বাচনের প্রাথমিক দায়িত্বও বিমল কর'কে দেওয়া হয়। 'হর্ষদেব' ছদ্মনামে তিনি 'দেশ'এ একাধিক ফিচার লেখেন। 'হ্রদ' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব এলে বিমল কর নিজস্ব সম্মতি দেন। সমকালের অজস্র ঘটনা ও ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি ভিন্ন মাত্রার সাহিত্য সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। জীবনের বিচিত্র স্বরায়ন উপন্যাস-গল্পে শৈল্পিক ভাষ্য লাভ করে। আপন সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর সৃজনশীল সত্তা মুক্তির সন্ধান করে—

> 'লেখকের কাছে অভিজ্ঞতা এক বড় সম্পদ। সম্পদ হলেও কোনো লেখকের পক্ষেই সেটি শেষ কথা নয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে ডুবে থাকা বা তার মধ্যে আটকে থাকাই সৃষ্টিশীল লেখকের মানসিকতা হতে পারে না। ঝোপঝাড় গাছপালার আড়াল থেকে একদিন যেমন আচমকা এক পাখি উড়ে আসে—সেই রকম অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে লেখকের স্বাধীনসত্তা, তাঁর সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখানেই লেখক হিসেবে তাঁর মুক্তি।'[১৪]

নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সৃষ্টিশীল সত্তার মাধ্যমে সাহিত্যে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রথম যথার্থ শৈল্পিক অভিজ্ঞান হল 'দেওয়াল' উপন্যাস। ডি.এম. লাইব্রেরির গোপাল দাস মজুমদারের অনুরোধে বিমল কর উপন্যাসটি সৃষ্টি করেন। জার্মান উপন্যাস 'এ রুম ইন বার্লিন' পাঠ তাঁকে প্রাণিত করলেও 'দেওয়াল' উপন্যাস কোনো লেখক বা লেখাকে অনুকরণ করে রচিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে বিমলবাবুর ভাবনা স্পষ্ট —

> '...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা যা ঘটে গেছে কলকাতায়, তার অনেক কিছুর আমি প্রত্যক্ষ দর্শক। কিন্তু দর্শক হওয়াই সব নয়, এই সময়ের মধ্যে থেকে আমি এমন কিছু কি পেয়েছি যা আমার বলার দরকার ছিল—যা বলার জন্য আমি ব্যাকুলতা বোধ করেছি অন্তরে ?...সেই সঙ্গে দেখেছি তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া, সামাজিক ভাঙন, মনুষ্য চরিত্রের

লোভ, লালসা, তার নৈতিক পতন, মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু, আমাদের সরল জীবনে, দুঃখবেদনায় বেঁচে থাকা সংসারে, স্বাভাবিক সংস্কার ও বিশ্বাসের জগতে যুদ্ধের যে ঝাপটা এসে লাগল তাতে কত কিছুর যে ওলটপালট হল, কত রকম বিশ্বাসের যে মৃত্যু ঘটল তার কথা কি বলা যাবে না ? 'দেওয়াল' উপন্যাসে আমি আমার ধারণা মতন তা বলার চেষ্টা করেছি আন্তরিকভাবে।'[১৫]

শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাই নয়; ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতা লাভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে যে আলোড়ন উঠেছিল তার নানা মাত্রা তিন পর্বে বিন্যস্ত 'দেওয়াল' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই উপন্যাস বিমল কর'কে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ১৯৫৬তে 'আঙুরলতা' গল্প লিখে তিনি নিন্দা-খ্যাতি উভয়ই লাভ করেন। এই সময় বাবার মৃত্যু ও পারিবারিক টানাপোড়েন তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। মনোজগতের অতলে চলা অবিরত মন্থনের মধ্যেই বিমল কর সৃষ্টি করলেন কালজয়ী গল্প 'সুধাময়'। এই গল্পের প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি—

'এই সময় আমি নিজেই জানি না কি-এক তাড়নায় তাড়িত হয়ে একটি গল্প লিখেছিলুম যার নাম 'সুধাময়'। 'সুধাময়' আমার সেই সময়কার পুরোপুরি বিভ্রান্ত মনের ছবি। এই লেখাটিই আমায় আবার নতুন করে নতুন ভাবে জীবনরহস্য সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু করে তুলল।'[১৬]

'সুধাময়' গল্পটির মাধ্যমে বিমল কর স্বীয় শিল্পসত্তাকে প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অনুভব করলেন। উন্মোচিত হল একান্ত জীবনদর্শন —

'...ওই গল্পটিই আমার লেখার নিজস্বতা আর মানসিকতাকে সেই প্রথম প্রকাশ করতে পেরেছিল।...ওখানেই আমার শুরু, নিজস্ব মনোভঙ্গি বলে যদি কিছু থাকে—তবে সেই মনোভঙ্গির, সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক—কিছু আসে যায় না।'[১৭]

নানা কারণে মানসিকভাবে বিমল কর নৈরাশ্য-নিঃসঙ্গতায় বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। ফরাসি লেখক মণিকা ল্যাঁশ, আমেরিকান লেখক আরউইন শ', ইতালীয় লেখক প্র্যাটোলিনি প্রমুখের গল্প-উপন্যাস এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থ পড়ে তিনি সমৃদ্ধ হন। 'দেশ' পত্রিকায় 'বিদুর' ছদ্মনামে 'সাহিত্য সংবাদ' নামে ফিচার লিখতে থাকেন।

বাণিজ্যিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবে খ্যাতি-অর্থ লাভ করলেও বিমল কর এসময় চিরাচরিত ধারায় গল্প লিখে তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। পাঠক-পাঠিকার সাধারণ রুচির চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে বিমল কর ও তাঁর অনুজ লেখকরা গল্প লিখতে ক্লান্ত বোধ করেন। ফলে শুরু হল 'ছোটগল্প: নতুন রীতি'। এই ক্ষেত্রে গল্প নিয়ে নব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই গুরুত্ব পেল —

> 'বাংলা ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক, লেখক যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর লেখাটি লিখতে পারেন — এই রকম উদ্দেশ্য নিয়েই 'নতুন রীতি'র কাজ শুরু করা গিয়েছিল।'[১৮]

গল্পের প্রচলিত জনপ্রিয় ধারার সমান্তরালে ভিন্ন মাত্রার গল্প সৃষ্টি করাই ছিল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'র মূল উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট তত্ত্বকে অস্বীকার করে নতুন ধারার গল্প লিখতে চেয়েছিলেন এই গল্পলেখকরা। কিন্তু আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রবল সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়। অর্থাভাবে মাত্র পাঁচটি সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলা গল্পের ধারাকে নতুন মাত্রার দিকে অগ্রসরণে সাহায্য করেছিল। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ লেখকদের নিয়ে বাংলা গল্পের ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন বিমল কর।

'ছোটগল্প : নতুন রীতি' বন্ধ হয়ে গেলেও দেবেশ রায়–দিব্যেন্দু পালিত–শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের ভিন্ন ধারার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল 'এই দশকের গল্প' (১৯৬০) নামে একটি গল্প সংকলন। এই সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক হিসেবে বিমল করে'র মন্তব্য —

> 'নৈরাশ্য বেদনা জটিলতা আত্মবিদ্রুপ এ যুগের লেখকদের হাতে যত অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে সম্ভবত তেমন আর পূর্বে হয় নি। কিন্তু বর্তমান দশকের প্রান্তে এসে দেখা গেল বাংলা ছোটগল্প নতুন করে আবার সজ্জা রচনা করছে।'[১৯]

নতুন স্বতন্ত্র ধারার গল্প রচনায় বিমল করের আন্তরিক চেষ্টাকে ঐতিহাসিকতায় নিরীক্ষণ করেছেন অনুজ গল্পকার সত্যেন্দ্র আচার্য। তাঁর বিশ্লেষণী উপলব্ধি —

> 'সেদিনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল সাক্ষী
> দিয়ে যাবে বিমল করই ছোটগল্প নতুন রীতির প্রথম প্রবক্তা।'[২০]

এরপর বিমল কর আবার 'কথামালা' নামে একটি গল্পের কাগজ প্রকাশ করেন। নতুন লেখকদের লেখা এই কাগজে প্রাধান্য পায় কিন্তু তা বেশিদিন চলে নি। বন্ধু নৃপেন্দ্র সাহার উৎসাহে তিনি 'কর্ণ-কুন্তী সংলাপ' নামে একটি নাটক লেখেন। 'ঘাতক' নামের একটি একাঙ্ক নাটকও রচিত হল। দুটি নাটকই 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিমল কর প্রচলিত তাত্ত্বিক ধারণাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন। 'কেরানীপাড়ার কাব্য', 'জীবনায়ন' উপন্যাস দুটি কাহিনিসর্বস্বতা থেকে মুক্ত ছিল। ১৯৬০ খ্রিঃ প্রকাশিত 'খোয়াই' উপন্যাসটি তাঁর ভিন্ন ধারার উপন্যাস সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে বহন করেছিল। সাতটি পর্বে বিন্যস্ত এই আত্মকথন রীতির উপন্যাস যথেষ্ট আলোড়ন ফেলে সমকালে। এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ—

> '...প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস লেখার বাইরে অন্য কীভাবে একটি
> উপন্যাস লিখতে পারি—তার চেষ্টা চরিত্র করছিলাম। এ
> ব্যাপারে সফল হওয়া যাবে কি যাবে না–তা নিয়ে তেমন
> ভাবতে বসিনি।'[২১]

১৯৬০ খ্রিঃ পরবর্তীকালে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ঘটনা গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সাংস্কৃতিক জগতেও তার আলোড়ন এসে পড়ে। ১৯৬২ খ্রিঃ চিন হঠাৎ ভারতকে আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট চিনের আক্রমণ প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে বিমল কর ও অন্যান্য লেখকরা প্রতিবাদ সভা সংঘটিত করেন। চিনের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় বিমলবাবু 'ঘু ঘু' নাটক লেখেন। সৃষ্টি হল 'স্বাধীন সাহিত্যসমাজ'। কিন্তু এই সংগঠনকে অনেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ পাল্টা প্রতিবাদে মুখর হন।

১৯৬৫ খ্রিঃ ভারত–পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমান্তরালে ১৯৬৫তে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি-মার্চে খাদ্য আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির

ভাঙন, ১৯৬৭ তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ইত্যাদি ঘটনার প্রভাব ছিল বাঙালি জীবনে সুদূর প্রসারী। বিমল করের সৃজনশীল সত্তা এই অনিকেত কালের দহনে বারে বারে ঋদ্ধ হয়েছে। সমকালীন জীবনের অস্থিরতা, দ্বন্দ্বময়তা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সংশয়বোধে আক্রান্ত হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার বিমল করে'র গল্পে কখনো উঠে এসেছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আবার কখনো গভীর মৃত্যুচেতনা। বহির্জগতের তীব্র টানাপোড়েনে ধ্বস্ত হয়েছে আমাদের অন্তর্জগত। তাই তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে আত্ম-অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ১৯৬৩ খ্রিঃ 'দেশ'এর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'অপেক্ষা'। গভীর মরমী মৃত্যুচেতনাসমন্বিত এক গল্প। 'খড়কুটো' উপন্যাসেও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন বিমল কর। 'খড়কুটো' উপন্যাসটি পরে 'ছুটি' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়। তাঁর 'বালিকাবধূ' নিয়েও চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের শেষে শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কমিউনিস্ট দলের পুনরায় ভাঙন, একাধিক রাজনৈতিক সংঘর্ষ, অসংখ্য গুপ্তহত্যায় টালমাটাল হয়ে উঠে সমাজজীবন। সমকালীন তরুণদের হতাশা-অবিশ্বাস-নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে বিমল কর সৃষ্টি করলেন 'যদুবংশ' উপন্যাস। ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস হারানো বাঙালি যুবকদের আত্মধ্বংস, নিঃসঙ্গতা ও দিশাহীন জীবনায়নের বাস্তব প্রতিফলক হল এই উপন্যাস। বাইরের জগতের তীব্র চোরাটানে বিক্ষত-রক্তাক্ত মনোজগত হয়ে পড়ল অস্তিত্ব-সন্ধানী। স্বীয় অস্তিত্বের সারসত্য অনুধাবনে মানুষের ব্যাকুলতাকে 'পূর্ণঅপূর্ণ' উপন্যাসের মাধ্যমে বিম্বিত করলেন বিমল কর। ইতিমধ্যে ১৯৭৫ খ্রিঃ জরুরি অবস্থা জারি হল। নকশাল আন্দোলন তখনও চলছে। এই সময়কালকে কেন্দ্র করে তিনি লিখলেন 'শমীক' উপন্যাস। এছাড়া 'সে', 'ওরা', 'নিগ্রহ' ইত্যাদি গল্পও এই প্রেক্ষাপটে রচিত হল। তবে এই সময় অন্যদিকে বিমল কর একাধিক সরস ও হাস্যরসাত্মক গল্প লিখছেন। 'চারতাস', 'বসন্তবিলাপ', 'র‍্যাটকিলার' প্রভৃতি গল্পে তিনি সদর্থক জীবনবোধকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁর লেখনীতে ছোটোদের জন্য এক নতুন গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব হবে। এক ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা কিঙ্কর কিশোর রায় ওরফে কিকিরা। ঘনাদা-টেনিদা-ফেলুদা'য় আসক্ত বাঙালি পাঠকের কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কিকিরা।

১৯৭৩ খ্রিঃ বিমল কর নিজ উদ্যোগে 'গল্পবিচিত্রা' নামে একটি প্রকাশ করেন।

সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। চার-পাঁচটি সংখ্যার পর এই পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি 'অলস ভ্রমণ' নামে একটি গল্প লেখেন। 'গল্পবিচিত্রা' আর প্রকাশিত না হলেও বিমল কর বিভিন্ন মাত্রার গল্প-উপন্যাস সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষত, গল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহে ঘাটতি পড়ে নি কখনো।

আপন ব্যক্তিত্বে অটল থেকে ১৯৮২ খ্রিঃ মার্চ মাসে 'দেশ' পত্রিকা থেকে ইস্তফা দেন বিমল কর। নিজের আত্মমর্যাদা বোধের সঙ্গে সমঝোতা করে তিনি চাকরি করতে চান নি। তবে কারো সঙ্গেই মনোমালিন্যে জড়িয়ে পড়েন নি। 'দেশ' পত্রিকা ত্যাগ করে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় ১৯৮২ খ্রিঃ মে মাসে তিনি যোগ দেন। এই পত্রিকাতেই 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা' নামে একটি ধারাবাহিক গদ্য লেখেন। দু'বছর পর এই কাজ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন বিমলবাবু। এরপর পর্যায়ক্রমে 'যুগান্তর' ও 'বর্তমান' পত্রিকায় তিনি নানা বিষয়ে লেখেন। 'আজকাল' পত্রিকাতেও ছয়-সাত মাস কাজ করেন।

আটের দশকের শেষ দিকে অর্থাৎ প্রায় সত্তর বছর বয়সে পৌঁছেও সাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্পের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি বিমলবাবু। ১৯৮৮ খ্রিঃ নবীন লেখকদের উৎসাহ ও গল্পকে সম্পদ করে 'গল্পপত্র' পত্রিকার সূচনা করলেন। দ্বিমাসিক এই পত্রিকা চার বছর চলেছিল। এই পত্রিকায় অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নলিনী বেরা প্রমুখের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'গল্পপত্র' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজস্ব প্রাপ্তিতে পূর্ণ ছিলেন তিনি —

> 'আমার নিজের যদি কোনো তৃপ্তি থাকে—তবে ওই—যে চার বছর নিয়মিত পত্রিকা বার করতে পেরেছি। অনেক তরুণ লেখককে পেয়েছিলাম। লেখার মারফতেই। আজ আমি দায়মুক্ত।'[২২]

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিমল কর সর্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম করে গেছেন। শুধুমাত্র নিজের লেখার কথা ভাবেন নি, বরং নবীন লেখক-লেখিকাদের ভিন্ন ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য, বিশেষত ছোটোগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য। অনুজ গল্পকার অমর মিত্রের মুগ্ধ স্বীকারোক্তি—

'বাঙলা ছোটগল্পের প্রতি আরো যত্নশীল হয়ে ওঠার কথা বিমল কর বাঙালি পাঠককে কিছুটা শিখিয়েছেন বার বার ছোটগল্প নিয়ে কিছু না কিছু ভেবে। গল্প বিচিত্রা উঠে গেল, আটের দশকের মধ্যভাগে 'গল্পপত্র' সম্পাদনা আরম্ভ করলেন বিমল কর। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি পার। সাহিত্যের প্রতি, ছোটগল্পের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ যেন তিনি।'[২৩]

১৯৯০ খ্রিঃ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ খ্রিঃ এপ্রিল মধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল বিমল করে'র কালজয়ী সৃষ্টি 'উপাখ্যানমালা'র গল্পগুলি। রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়ের ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এই পাঁচটি রূপক গল্পে তাঁর নিজস্বতাই প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পগুলির মাধ্যমে তিনি খণ্ডকালের মানবজীবনে অস্তিত্বের শাশ্বত সত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। 'উপাখ্যানমালা' লেখার পর বিমল কর অবসর নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা তাঁকে আবারও সৃজনমুখর করে তোলে। পরবর্তী এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি গল্প-উপন্যাস সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত নানা মাত্রার গল্প রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। শেষ পর্যন্ত 'ইমলিগড়ের রূপকথা' উপন্যাস সৃষ্টি করে বিমল করের লেখনী চিরস্তব্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্যিক হিসেবে বিমল কর একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৬৭ খ্রিঃ প্রথমবার 'আনন্দ' পুরস্কার পান। 'অসময়' উপন্যাসের জন্য ১৯৭৫ খ্রিঃ 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া, ১৯৮১ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পুরস্কার এবং ১৯৮২ খ্রিঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় 'নরসিংহ দাস' পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করেন। 'উপাখ্যানমালা' গ্রন্থের জন্য ১৯৯১ খ্রিঃ দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি 'আনন্দ' পুরস্কার লাভ করেন।

২০০৩ খ্রিঃ ২৬ আগস্ট বিমল করে'র খণ্ডকালিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। মহাকালের কাছে রেখে যান তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যসম্পদ। পার্থিব পুরস্কার তাঁর কাছে কখনোই প্রার্থিত ছিল না। বরং, পাঠক-পাঠিকার মুগ্ধ পাঠ-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই বেঁচে থাকবেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের বহমান ধারায় এক স্বতন্ত্র স্রষ্টা হিসেবে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবেন আমাদের বিমল কর।

তথ্যসূত্র :

১. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ১৯৯২; পৃ. ৭৮

২. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ১৩

৩. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৬৫

৪. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৭২

৫. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৯১

৬. 'আমার লেখা' : বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ১৭

৭. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ২১৫

৮. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৫৭

৯. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ১৯

১০. 'আমার লেখা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৮

১১. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ৩০৭

১২. ভূমিকা: সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠ গল্প : বিমল কর; প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

১৩. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; তদেব; পৃ. ৩০৮

১৪. ভূমিকা: বিমল কর; 'সেরা নবীনদের সেরা গল্প'; বৈশাখ, ১৪০৫

১৫. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ২৫

১৬. 'আমার লেখা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৬

১৭. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ; জুলাই, ১৯৯৭; পৃ. ৭৩

১৮. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; তদেব; পৃ. ৯১

১৯. ভূমিকা; 'এই দশকের গল্প'; সম্পাদনা: বিমল কর

২০. 'বিমল কর প্রসঙ্গে': সত্যেন্দ্র আচার্য; 'নহবৎ' সাহিত্য পত্রিকা; ১৪০০; পৃ. ১৪

২১. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; তদেব; পৃ. ৯২

২২. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৫০

২৩. 'সমস্ত জীবনের সহযাত্রী': অমর মিত্র; 'কোরক' পত্রিকা; বইমেলা, ১৯৯৭; দ্বিতীয় পর্ব; পৃ. ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিমল করের সৃষ্টিলোক

নানা সংরূপের বিচিত্র দ্যোতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে একজন সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টিলোক। সৃষ্টির বৈচিত্র্যেই স্রষ্টার শিল্পসত্তার বহুমুখিনতা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত শিল্পী কোনো বিশেষ রূপ-রীতি-আঙ্গিকের মধ্যে নিজের লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখতে অনিচ্ছুক, বরং জীবনের বহুস্বরিকতাকে প্রকাশের তাগিদেই প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন সংরূপের ব্যবহারে প্রয়াসী হন। বিবিধ সংরূপে সাহিত্যিকের সৃজনশীল প্রচেষ্টার পরিচায়ক হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিবিশ্ব।

সাহিত্যিক বিমল করে'র সৃষ্টিলোক যথার্থই বৈচিত্র্যবর্ণিল। ছয় দশক কালব্যাপী সাহিত্যচর্চায় সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে তাঁর সৃজনীপ্রতিভা স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষত গদ্যসাহিত্যের প্রায় সব ধারাতেই তিনি স্বীয় শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শৈশব-কৈশোর-যৌবনে দেশি-বিদেশি নানা সাহিত্যপাঠ তাকে সাহিত্যের নানা রূপ-রীতির প্রতি উৎসাহী করে তোলে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'দৈনিক বসুমতী', 'প্রবর্তক' পত্রিকার পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-মণীন্দ্রলাল বসু-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সাহিত্য তাঁর শিল্পসত্তাকে প্রাণিত করেছিল। একইসঙ্গে ন্যুট হামসুন, লিও টলস্টয়, মার্ক টোয়েন, আনাতোল ফ্রাঁস, ইবসেন, টুর্গেনিভের কালজয়ী সাহিত্যপাঠ তাঁকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করেছিল। ফলে নানা ধারার সাহিত্য বিমল করে'র মন-মননকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন সংরূপে সৃষ্টিতে আকর্ষণ করেছে বারে বারে।

সমকালীন যুগের কাব্য-কবিতা পাঠে রসগ্রহণ করলেও বিমল কর কবিতার ক্ষেত্রে সেভাবে মনোযোগী হননি। বরং গদ্যসাহিত্যের ধারায় নানান সংরূপে সৃজনশীল হয়ে উঠতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। গল্প এবং নাটক লিখে সাহিত্যজীবনের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে উপন্যাস-প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর লেখনী মুখর হয়ে ওঠে। গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ সব ধারাতেই সক্রিয়তা দেখা গেলেও মূলত উপন্যাস ও গল্পের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের শৈল্পিক দক্ষতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছেন। নাটক ও প্রবন্ধসাহিত্য

অপেক্ষা বিমল কর কথাসাহিত্য নিয়ে অনেক বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তবে গল্পের সমান্তরালে উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। গল্প এবং উপন্যাস রচনায় আগ্রহের তুলনামূলক বিচারে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য চমকপ্রদ—

> 'একটি যদি আদর পায়, অন্যটি পায় প্রশ্রয়। গল্প এবং
> উপন্যাস–দুটিকেই আমি ভালবাসি সমান মমতায়।'[১]

বিমল করে'র সৃষ্ট উপন্যাস জগতে বহুল মাত্রার সমন্বয় লক্ষণীয়। কোনো নির্দিষ্ট রূপরীতিকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হতে চান নি। সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছে নতুন ভাবনা ও ভিন্ন প্রকরণের অন্বেষণ। ফলে, তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসসমূহ কখনো 'বড় উপন্যাস', 'ছোট উপন্যাস', কখনো 'নভেলেট' বা 'নভেলা' ইত্যাদি নানাবিধ আঙ্গিকের সাপেক্ষে চিহ্নিত হয়েছে। অনেক বড়গল্পও পরবর্তীকালে 'উপন্যাস' বা 'নভেলেট' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক রচনাকে স্রষ্টা স্বয়ং 'বড়গল্প' বা 'দীর্ঘকাহিনি' রূপে নির্দেশ করলেও সেগুলি 'উপন্যাস' হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। বিমল কর তুলনামূলকভাবে 'বড় উপন্যাস' কম রচনা করেছেন। 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকায় (৩য়বর্ষ/ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) 'উপন্যাসভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি নিজেই 'ছোট উপন্যাস' সৃষ্টিতে নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। স্ব-সৃষ্ট উপন্যাসসমূহে নানান আঙ্গিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন—

> 'সত্যি বলতে আমি তো সেই অর্থে উপন্যাস খুব বেশি
> লিখিনি, অধিকাংশই বড়গল্প বা নভেলেট্ জাতীয়। বলতে
> পার আমার উপন্যাস তিনটে—দেওয়াল, পূর্ণ অপূর্ণ আর
> অসময়। খড়কুটোও নভেলেট্।'[২]

নয়টি খণ্ডে বিন্যস্ত 'উপন্যাস সমগ্র'তে বিমল করে'র একষট্টিখানা উপন্যাস স্থান পেয়েছে। এই নয়টি খণ্ডে 'বড় উপন্যাস', 'ছোট উপন্যাস', 'নভেলেট' ও 'দীর্ঘকাহিনি' ইত্যাদি একত্রীভূত হয়েছে। তবে, 'হ্রদ', 'ত্রিপদী' ইত্যাদি একাধিক উপন্যাস এই 'উপন্যাস সমগ্র'তে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কয়েকটি উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য স্রষ্টা কর্তৃক স্বীকৃত না হলেও অন্য কিছু উপন্যাস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবুও তাদের উপন্যাস সমগ্রে স্থান না পাওয়া খুবই আশ্চর্যজনক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বা সংকলক কোনো যথার্থ যুক্তির অবতারণা করেন নি। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিমল কর

একাধিক উপন্যাস লেখেন। তিন খণ্ডে গ্রন্থিত 'কিকিরা সমগ্র'তে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

বিমলবাবু'র বেশিরভাগ উপন্যাস জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশিত, যা পরে গ্রন্থ হয়ে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'উড়োখই' নামক স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, মোট পাঁচটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিছু উপন্যাস অবশ্য সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনায়নকে কেন্দ্র করেই বিমল কর উপন্যাসগুলি গড়ে তুলেছিলেন। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আলোড়িত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অগ্রসরণ-অবনমন, সংকট-জটিলতা প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে অন্তর্বয়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিক শহুরে পটভূমিই প্রাধান্য পেয়েছে; কেননা অভিজ্ঞতার বাইরে থাকা গ্রামীণ জীবনকে তিনি আরোপিতভাবে ব্যবহার করতে চান নি। ভিন্ন আঙ্গিকে একাধিক উপন্যাস রচনা করলেও সবক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের সামাজিক জীবনই গুরুত্বলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণী ভাবনা—

> 'সেই অর্থে আমার সব উপন্যাসই সামাজিক। তবে কাঠামোটিকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যেমন সময় পর্বের দলিল যদি 'দেওয়াল' হয়ে থাকে, তবে জীবনবোধের গভীর প্রসঙ্গ অবশ্যই 'পূর্ণ অপূর্ণ'। একজনের বিদায়লগ্ন, অন্যজনের সূচনা–এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছে প্রজন্মগত ব্যবধান, যা 'অসময়' উপন্যাসে বিধৃত। প্রতিবাদী মানসিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ 'যদুবংশ'। প্রবাসী বাঙালি জীবনের আলেখ্য 'জীবনায়ন'। হাস্যমধুর রোমান্টিকতার পরিচয় 'বালিকাবধূ'।'[৩]

মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজজীবনের পরিচয় উঠে এলেও বিমল কর সর্বদাই বহির্জীবনের প্রেক্ষিতে মানুষের অন্তর্জগতের গূঢ় ভাষ্যকেই উপন্যাসের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। সামাজিকসত্তাকে গুরুত্ব দিয়েও মানুষের ব্যক্তিসত্তার যথার্থ উন্মোচনই ছিল তাঁর মূল

লক্ষ্য। বিচিত্র মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের অন্তরমহলের অন্বেষণই বিমল করের প্রার্থিত ছিল—

> 'উপন্যাসে বহিরঙ্গে নয়, অন্তর্জগতের দিকেই আমার ঝোঁক।
> আমি inner world নিয়ে লেখাই পছন্দ করে থাকি।'[৪]

বিংশ শতাব্দীতে চারের দশকের শেষের দিকে রচিত 'হ্রদ' উপন্যাসের মাধ্যমে বিমল কর ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বন্ধুদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত 'ভারতী প্রকাশনী' থেকে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়িক তাগিদে লেখা এই মনস্তাত্ত্বিক ও রহস্যপূর্ণ গ্রন্থটির সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে স্রষ্টা যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—

> 'বলতে বাধা নেই, 'হ্রদ' আমার প্রথম ছাপা উপন্যাস হলেও
> তার কোনো সাহিত্যমূল্য নেই। ব্যবসায়িক কারণে ওটা
> লিখেছিলুম, নিছকই পাঠককে হালকা আনন্দ দেবার জন্য।'[৫]

ব্যবসায়িক কারণে রচিত হলেও সমকালীন যুগে এই উপন্যাসটি বহুপঠিত হয়। এমনকি, পাঁচের দশকে 'হ্রদ' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। পরবর্তীকালে গুজরাতি ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়।

এরপর সুনীল ধর সম্পাদিত 'নতুন জীবন' পত্রিকায় বিমল কর 'ঝড় ও শিশির' নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। সাধু ভাষায় রচিত হওয়া এই উপন্যাসটিতে তিনি প্রচলিত আঙ্গিকের ব্যবহার করেন নি। সম্পূর্ণ একক-কাহিনি গড়ে তোলার পরিবর্তে একটি মূল ভাবনাকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যাচাই করা হয়েছে। পুনর্মুদ্রণের সময় নানান সংস্কারের পর 'বনভূমি' নামকরণে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকা-কথনে ঔপন্যাসিক স্বয়ং গ্রন্থটিকে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য-উপন্যাস' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। এই সময়েই 'জনসেবক' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় তিনি 'ত্রিপদী' উপন্যাস লেখেন। কয়লাকুঠির পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও উপন্যাস সমগ্র'তে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

'দেওয়াল' উপন্যাস সাহিত্যিক বিমল কর'কে ঔপন্যাসিক রূপে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। 'ছোট ঘর', 'ছোট মন' এবং 'খোলা জানালা' নামে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটিতে ১৯৪১ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ইত্যাদি প্রেক্ষিতে মানুষের চলমান জীবনের ভাষ্য পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসটিতে বিমল করের সৃজনশীল সত্তার শৈল্পিক দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচকের মননশীল মন্তব্য—

> '...'দেওয়াল' থেকেই যেন ঔপন্যাসিক বিমল করের জন্ম হল। এটা তাঁরই ভাষায় কেবল সময়ের প্রতিচ্ছবি না হয়ে সময়ের চাপে পিষ্ট মানুষের প্রতিচ্ছবিও হয়ে উঠেছে।'[৬]

ডি.এম.লাইব্রেরি'র কর্ণধার গোপাল দাস মজুমদার উৎসাহে ১৯৫৬ খ্রিঃ 'দেওয়াল' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণ করেন বিমল কর। 'এ রুম ইন বার্লিন' উপন্যাসের দ্বারা প্রেরণা পেলেও তিনি অনুকরণজাতীয় কোনো সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন না। এই পাঠজ সংবেদনাকে স্মৃতিতে রেখে বিমল কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রেক্ষিতে কলকাতা শহর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের বিভিন্ন বাঁকবদলকে তুলে ধরেছেন। অন্তঃসারশূন্য জীবনবোধ, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানুষের চরিত্রনিহিত অবিশ্বাস-যন্ত্রণা-নৈরাশ্যবোধ ইত্যাদি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রের নানা প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে ভাষায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসে স্রষ্টা শিল্পিতভাবে ইতিহাসের বৃহৎ-সময়ের সঙ্গে ব্যক্তি-সময়ের সম্পর্কায়নকে উপস্থাপিত করেছেন।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও বিমল করের শৈল্পিক মন সর্বদাই পরীক্ষামূলকতায় ব্যস্ত থেকেছে। এই ক্ষেত্রে অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'খোয়াই' (১৯৬০) উপন্যাস। আত্মকথন রীতির ব্যবহারে এই উপন্যাসে এক ব্যক্তির অন্তর্জীবনের বিপন্নতার অনুভব ফুটে উঠেছে। সাতটি পর্বে বিন্যস্ত 'খোয়াই'কে ঔপন্যাসিক স্বয়ং 'নভেলা' বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পরীক্ষামূলক কৃৎকৌশলের উল্লেখ করেছেন। এরস্কিন কলড্ওয়েল রচিত 'স্যাকরিলেজ অফ অ্যালান কেন্ট' গ্রন্থের আঙ্গিক দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাতটি পর্বের প্রতিটি কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি অনুচ্ছেদ কখনো দশ-বারোটি, কখনো বা একক পংক্তি নিয়ে বিন্যস্ত। বিমল করে'র উপন্যাস জগতে 'খোয়াই' এক ভিন্ন রীতির সৃষ্টি। প্রতীকী এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

'আমার একটা বই আছে 'খোয়াই'। একেবারে নতুন টেকনিকে লেখা। এটা খুব মূল্যবান লেখা। এটা প্রায় কবিতা। এক একটা চ্যাপ্টারে কয়েকটা করে মাত্র লাইন আছে। এর সঙ্গে অন্য কোন লেখার মিল পাবে না।'[৭]

একই সময়ে বিমল কর 'কেরানীপাড়ার কাব্য' এবং 'জীবনায়ন' নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, সেগুলিতেও প্রথাবদ্ধ আঙ্গিককে মান্যতা দেন নি। এই উপন্যাসদ্বয়ে প্রচলিত অর্থে কোনো কাহিনির অস্তিত্ব নেই, বরং জীবনের অন্তর্লগ্ন অনুভূতির প্রকাশই প্রাধান্য লাভ করেছে।

বাণিজ্যিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিমল করে'র প্রথম উপন্যাস হল 'খড়কুটো'। নভেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ থেকে জানুয়ারি, ১৯৬৪ খ্রিঃ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাগরময় ঘোষের একান্ত অনুরোধে বিমলবাবু এই উপন্যাস রচনায় মনোযোগ দেন। 'খড়কুটো' শুধুমাত্র দুই অল্পবয়সী নরনারীর ভালোবাসার ভাষ্য নয়, বরং ভালোবাসাকে পাথেয় করে এক মৃত্যু অতিক্রমী জীবনবোধের কথা দ্যোতিত হয়েছে। এই বহুস্বরিক উপন্যাস সম্পর্কে স্রষ্টার বিশ্লেষণ লক্ষণীয়—

'তবে এইমাত্র বলতে পারি, 'খড়কুটো' শুধু দুটি ছেলেমেয়ের ভালোবাসার কথা নয়, ভ্রমরের অবধারিত নিয়তি–যার সম্পর্কে সে অজ্ঞ, তার সরল ধর্মবোধ, প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করার সরল যুক্তি–আর অমলের অকৃত্রিম প্রেম থাকা সত্ত্বেও তার অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতন অবিশ্বাস সন্দেহ যন্ত্রণা—এই কাহিনীর অঙ্গ।'[৮]

'খড়কুটো' ব্যতীত আরো দুটি উপন্যাস বিমল করে'র শিল্পীসত্তাকে তৃপ্ত করেছে। 'পূর্ণ অপূর্ণ' ও 'অসময়' উপন্যাসদ্বয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

'অন্তত আরও কয়েকটি লেখা যেমন 'খড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'অসময়' এর কথা আমি বলতে পারি যা আমার নিজের স্বার্থেই লেখা উচিত ছিল।'[৯]

'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৯৬৭) উপন্যাসে স্বীয় জীবনে মানুষের অপূর্ণতাজনিত অস্তিত্বগত যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণতার অন্বেষণের ভাষ্যই পরিস্ফুট হয়েছে। সুরেশ্বর-অবনী-হৈমন্তী প্রত্যেকেই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে আলোড়িত। অপূর্ণ জীবনের যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করে পূর্ণতার সন্ধানে মানুষের আন্তরিক প্রয়াসের প্রসঙ্গই এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিকের এই দার্শনিক ভাবনা প্রতিফলিত—

> 'কোন মানুষই পূর্ণ নয়। তার মধ্যে অপূর্ণতা থাকবেই। কিন্তু সে তার চরিত্রের গুণ বা মহত্ত্ব দিয়ে তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারে। একথাই আমি 'পূর্ণ অপূর্ণ'তে বলেছি।'[১০]

'দেশ' পত্রিকায় মে, ১৯৭১ খ্রিঃ থেকে জানুয়ারি, ১৯৭২ খ্রিঃ ধরে প্রকাশিত 'অসময়' উপন্যাসটি বিমল কর রচিত শেষ ধারাবাহিক উপন্যাস। স্মৃতিকথনমূলক গ্রন্থ 'উড়োখই'তে এই উপন্যাসের প্রতি লেখক নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন। আত্মকথন রীতির আশ্রয়ে ছয়টি চরিত্রের প্রেম-জীবন-মৃত্যু সম্পর্কীয় তীব্র উপলব্ধিই পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষত অবিশ্বাসী অবিনের সংকীর্ণতামুক্ত জীবনাচরণ এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষে ব্যক্তিজীবনের আলোড়ন এই উপন্যাসে শিল্পসুষমায় উপস্থাপিত হয়েছে।

'যদুবংশ' ও 'শমীক' উভয় উপন্যাসে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মহাভারতীয় অনুষঙ্গ নতুন তাৎপর্য বহন করেছে। বিশ শতকে ছয়ের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা, খাদ্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তরুণ প্রজন্ম ক্রমশই দিগভ্রান্ত হচ্ছিল। 'যদুবংশ' (১৯৬৮) উপন্যাসে আত্মঘাতী প্রজন্মের অস্তিত্বের সংকটে যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। স্প্যানিশ ঔপন্যাসিক হুয়ান গোয়াটিসোলো'র 'দ্য ইয়ং অ্যাসাসিনস্' উপন্যাস বিমলবাবুকে এই ধরনের লেখায় প্রাণিত করেছিল। বৈশাখ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৭৬ খ্রিঃ দেশজুড়ে জারি হওয়া জরুরি অবস্থার সময় 'শমীক' উপন্যাসটি 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যুবক শমীক সমকালীন যুগের যুবক-

যুবতীদের যন্ত্রণা-সংকটকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে। নিজের পরিবারের কৃত্রিম ঐতিহ্য ও সম্ভ্রান্ততার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার প্রতি জেহাদ। এই উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিকের শিল্পিত প্রতিবাদও যেন রূপায়িত। উপন্যাসটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

> '...'শমীক' বলে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায়। ওটা আমার নিজের মনের কথা।'[১১]

'ভুবনেশ্বরী' উপন্যাস আর একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এই উপন্যাসে মা'কে কেন্দ্র করে সোমকান্তির অসত্যকথনের মাধ্যমে মিথ গড়ে তোলা এবং কয়েক প্রজন্ম ধরে সেই ভ্রান্ত মিথকে সত্য বলে সবার স্বীকৃতি দান প্রকৃতপক্ষে মানবিক সম্পর্কের অন্তর্গত দ্বন্দ্বময়তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। মা'কে নিয়ে সোমকান্তির প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষাজাত কল্পনাই শেষ জীবনে তাকে আত্মিক সংকটে সমর্পণ করেছে। আত্ম-আত্মজের সম্পর্কের এক অসাধারণ ভাষ্য হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস। তাই ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি—

> 'আমার ধারণা ভুবনেশ্বরী আমার নিজের মনোমত লেখাগুলির মধ্যে একটা।'[১২]

একাধিক উপন্যাসে বিমল কর মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময়তাকে উন্মোচিত করেছেন। বিশেষত দাম্পত্য সম্পর্কের নানা মাত্রা এক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছে। 'উভয়পক্ষ' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের শীতলতায় আক্রান্ত দুটি মানুষের নতুন করে বাঁচার চেষ্টা দেখা গেছে। 'সান্নিধ্য' ও 'গ্রহণ' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা-যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। 'সহভূমিকা', 'সহচর' প্রভৃতি উপন্যাসে দাম্পত্যজীবনের ভিন্নমাত্রা লক্ষণীয়। আবার, 'বালিকাবধূ'তে দাম্পত্যের সৌন্দর্য এবং 'এই বেদনায়, বিষাদে'এ এক পরিণত দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া, 'গ্রন্থি' উপন্যাসে মা-ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি ঔপন্যাসিক শৈল্পিকতায় পরিস্ফুট করেছেন।

মানুষের আত্মপরিচয়ের গূঢ় সংকট ভাষায়িত হয়েছে 'অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে। 'দ্বীপ' উপন্যাসে মানুষের নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা, 'হৃদয়তল' উপন্যাসে মানুষের অন্তর্জগতের ক্ষয়জাত বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতার কাহিনির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে 'দ্বন্দ্ব' উপন্যাস। 'কালের নায়ক'এ মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনের ছবি ধরা পড়েছে। 'এক অভিনেতার মৃত্যু' এবং 'এ আবরণ' উপন্যাসদ্বয়ে

মানুষের মৃত্যুবোধ এবং মৃত্যুর সাপেক্ষে জীবনোপলব্ধির কথা উঠে এসেছে।

'প্রথম ও শেষ অঙ্ক' এবং 'আকাশ কুসুম' উপন্যাসদ্বয়ে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত, 'আকাশকুসুম' উপন্যাসে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির প্রসঙ্গ ও পরবর্তীকালের বাংলা থিয়েটারের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্বয়নে উঠে এসেছে। এছাড়া, বিমল কর কয়েকটি রহস্যমূলক উপন্যাস রচনা করেন। 'এই কুয়াশায়' এবং 'রত্ননিবাসে তিন অতিথি' উপন্যাসে রহস্যময়তাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে, এগুলি গোয়েন্দা উপন্যাস নয়; ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'সাইকোলজিকাল ক্রাইম'।

কিশোর-কিশোরীদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে বিমলবাবু সত্যসন্ধানী চরিত্র কিঙ্কর কিশোর রায় বা কিকিরা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। কিকিরা'কে কেন্দ্র করে একাধিক রহস্যময় অপরাধমূলক উপন্যাস রচিত হয়। তিনি কিকিরা'কে গোয়েন্দা চরিত্র বা কিকিরা-কেন্দ্রিক রচনাকে গোয়েন্দা-উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করেন নি। তাই 'কাপালিকরা এখনও আছে', 'সেই অদৃশ্য লোকটি', 'সোনালি সাপের ছোবল', 'নীল বানরের হাড়' ইত্যাদি উপন্যাসকে অপরাধমূলক কাহিনি রূপেই চিহ্নিত করা হয়।

'মালিনীচরিত', 'জলজ', 'অলস ভ্রমণ' ইত্যাদি বড়গল্প পরবর্তীকালে 'নভেলেট' রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া 'মোহ', 'স্বপ্নে', 'অবগুণ্ঠন', 'নীলপদ্ম' ইত্যাদি রচনা উপন্যাস সমগ্রে গৃহীত হয়নি।

নয় খণ্ডের উপন্যাস সমগ্রের বাইরেও আরো অনেক উপন্যাস আছে। বিমল কর রচিত সমস্ত উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা হল—

১। হ্রদ
২। বনভূমি
৩। ত্রিপদী
৪। দেওয়াল
৫। ফানুসের আয়ু
৬। অপরাহ্ণ
৭। খোয়াই
৮। কেরানীপাড়ার কাব্য
৯। স্বর্গখেলনা
১০। খড়কুটো
১১। এই প্রেম আঁধারে
১২। বালিকাবধূ
১৩। গ্রহণ
১৪। পরবাস
১৫। পরিচয়
১৬। পূর্ণ অপূর্ণ
১৭। যদুবংশ
১৮। একদা কুয়াশায়

১৯। ওই ছায়া
২০। ভুবনেশ্বরী
২১। এক অভিনেতার মৃত্যু
২২। একা একা
২৩। অলস ভ্রমণ
২৪। অসময়
২৫। সান্নিধ্য
২৬। জীবনায়ন
২৭। নির্ভর
২৮। দংশন
২৯। সহভূমিকা
৩০। নির্বাসন
৩১। দ্বীপ
৩২। কালের নায়ক
৩৩। অতঃপর
৩৪। এ আবরণ
৩৫। সংশয়
৩৬। প্রচ্ছন্ন
৩৭। নিরস্ত্র
৩৮। উভয়পক্ষ
৩৯। মৃত ও জীবিত
৪০। নিমফুলের গন্ধ
৪১। অপ্রবাস
৪২। বেদনাপর্ব
৪৩। গ্রন্থি
৪৪। নতুন তারা
৪৫। রত্ননিবাসে তিন অতিথি
৪৬। জনৈক শয়তানের পত্রগুচ্ছ
৪৭। দিনান্ত
৪৮। চন্দ্রগিরির রাজকাহিনী
৪৯। অজ্ঞাতবাস
৫০। সরসী
৫১। দ্বন্দ্ব
৫২। চাতক
৫৩। শমীক
৫৪। সহচর
৫৫। গোলাপের দুঃখ
৫৬। তথাপি
৫৭। এই বেদনায়, বিষাদে
৫৮। তারা তিনজন
৫৯। শীত বসন্তের অতিথি
৬০। রাজমোহনের সুখ-দুঃখ
৬১। একটি বনচাঁপার গাছ ও আমার বন্ধু
৬২। ইমলিগড়ের রূপকথা
৬৩। প্রথম ও শেষ অঙ্ক
৬৪। পরস্পর
৬৫। আকাশ কুসুম
৬৬। অবগুন্ঠন
৬৭। মোহ
৬৮। স্বপ্নে
৬৯। নীলপদ্ম
৭০। মালিনীচরিত
৭১। জলজ

গল্পকার বিমল কর বাংলাসাহিত্যে এক কালজয়ী স্রষ্টারূপে সর্বজনবন্দিত। মূলত গল্পরচনার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যধারায় তাঁর আবির্ভাব। ১৯৪২ খ্রিঃ 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় 'গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি' নামে তিনি প্রথম গল্প রচনা করেন। এরপর কিছু গল্প রচনা করলেও ১৯৫২ খ্রিঃ 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইঁদুর' গল্প তাঁর শৈল্পিক কুশলতাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলে। 'দেশ' পত্রিকায় 'বরফসাহেবের মেয়ে', 'মানবপুত্র', 'আত্মজা', 'অশ্বত্থ', 'আঙুরলতা' ইত্যাদি গল্প বিমল করের সৃজনী প্রতিভার চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। ১৯৫৭ খ্রিঃ শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সুধাময়' গল্প থেকে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। পরবর্তীতে ছয় দশক ব্যাপী সৃজনকালে বিমল কর 'নিষাদ', 'জননী', 'অপেক্ষা', 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি', 'হেমন্তের সাপ', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' ইত্যাদি চিরকালীন গল্প রচনা করেছিলেন। শেষপর্বে 'উপাখ্যানমালা' গ্রন্থের গল্পগুলিতে জীবনদর্শনের গভীর উপলব্ধি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

১৯৫৮–১৯৫৯ খ্রিঃ 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' পত্রিকার মাধ্যমে বিমল কর বাংলা গল্পের চিরাচরিত ধারায় বিবর্তন আনতে সচেষ্ট হলেন। জনপ্রিয় বাণিজ্যিক সাহিত্য পত্রিকার লেখক হয়েও তিনি নতুন আঙ্গিকে গল্পসৃজনে মেতে ওঠেন। 'ছোটগল্পকে ছোট এবং গল্প হতে হবে'–এই চিরপ্রচলিত ভাবনাকে বিমল কর অস্বীকার করেন। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তিনি গল্প রচনা করতে চান নি। প্লট-সর্বস্বতাকে থেকে গল্পকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। কাহিনিসর্বস্ব বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব পেল অন্তর্বাস্তবতা। কাহিনির পরিবর্তে মনোগত অনুভবের স্ফুরণই গল্পে উঠে এল। ফলে তাঁর গল্প ক্রমশ কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হল 'মানসাঙ্ক', 'রামচরিত', 'স্বপ্নের নবীন', 'শীতের মাঠ', 'গুণেন একা'র মতো অসাধারণ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ গল্প।

কালগত এবং বিষয়-রীতিগত ইত্যাদি নানা দিক থেকে বিমল করে'র গল্পসমূহকে নানা দিক থেকে বিন্যস্ত করা যায়। জীবনের সারসত্য অন্বেষণ, অন্বেষণের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি এবং দার্শনিকবোধে উত্তরণের প্রেক্ষিত বিমল করের বিভিন্ন গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময় মৃত্যুর সাপেক্ষে জীবনের অন্বেষণে রত হয়েছিল, আর তার তিন দশক পর 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোর জীবন-মৃত্যুর পারস্পরিক সহাবস্থানের নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করেছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে তাঁর গল্পবিশ্বে যেমন 'আত্মজা', 'শূন্য' এর মতো মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের

সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি 'অপেক্ষা', 'নিষাদ' ইত্যাদি মৃত্যুভাবনার গল্পগুলি পাঠক-পাঠিকাদের ঋদ্ধ করে। তিনি যেমন 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন', 'হৃদয় বিনিময়' ইত্যাদি প্রেমমূলক গল্প লিখেছেন, তেমনি 'সুধাময়', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে দার্শনিক উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করেছেন। এছাড়া প্রতীকধর্মী গল্প 'সোপান', রূপকাশ্রিত 'সত্যদাস', 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' গল্পের সমান্তরালে 'বসন্তবিলাপ', 'প্রেমশশী'র মতো সরস গল্পও বিমল করের লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছিল। ছোটোদের জন্য তিনি 'ভূতের খোঁজে', 'সত্যি ভূতের গল্প' ইত্যাদি গল্পও রচনা করেছিলেন।

বাংলা গল্পধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বিমল করে'র বেশ কিছু গল্প আর পাওয়া যায় না। আশ্চর্যজনক ও বেদনাবহ সত্য হল যে, আজ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত গল্প একত্রে গ্রন্থিত হয় নি। বিভিন্ন গল্পগ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও কোনো 'গল্পসমগ্র' এখনও প্রকাশ পায় নি। ফলে, সমস্ত গল্পের অনুসন্ধান করা বেশ দুরূহ।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিমল করে'র গল্পসমূহ নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করায় এইখানে আর বিশদ ব্যাখ্যায় আমরা অগ্রসর হবো না। বরং বিমল করে'র রচিত সমস্ত গল্পকে একত্রে তালিকাভুক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে—

১। গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি
২। অম্বিকানাথের মুক্তি
৩। সৈনিক
৪। অন্তরে
৫। পিয়ারীলাল বার্জ
৬। ভয়
৭। ইঁদুর
৮। বরফসাহেবের মেয়ে
৯। মানবপুত্র
১০। কাচঘর
১১। জোনাকি
১২। বকুলগন্ধ
১৩। দুইবোন
১৪। পার্ক রোডের সেই বাড়ি
১৫। আত্মজা
১৬। উদ্ভিদ
১৭। পিঙ্গলার প্রেম
১৮। খিল
১৯। বুদবুদ
২০। পালকের পা
২১। উত্তমপুরুষ
২২। আয়না
২৩। বৈরী
২৪। অ্যালবাম
২৫। জানোয়ার
২৬। রাত পাখির ডাক

২৭। প্রথম কান্না
২৮। সাদা কালো
২৯। ময়ূরী
৩০। শূন্য
৩১। অশ্বত্থ
৩২। আঙুরলতা
৩৩। যযাতি
৩৪। পলাশ
৩৫। পুতুলের মৃত্যু
৩৬। সুধাময়
৩৭। বিষুবরেখা
৩৮। নিষাদ
৩৯। বিষলতা
৪০। খাটাল
৪১। পাখি
৪২। ধোঁয়া
৪৩। একটি অমর্ত্য কাহিনী
৪৪। তুলোমন
৪৫। খড়ির দাগ
৪৬। অর্ধবৃত্ত
৪৭। আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু
৪৮। ছাদ
৪৯। ঐশ্বর্য
৫০। এই বৃষ্টি
৫১। একটি সাধারণ গল্প
৫২। সেই ঘর এই বাসা
৫৩। দরজা
৫৪। মানসাঙ্ক
৫৫। পিতৃঘ্ন
৫৬। শীতের মাঠ
৫৭। পলাতকা
৫৮। অসুখ
৫৯। বাঘ
৬০। টেলিগ্রাম
৬১। চারতাস
৬২। গোলাপ কাঁটা
৬৩। ফুলের বাগানে রাত
৬৪। ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া
৬৫। উপাখ্যান
৬৬। প্রফেসর যাদব
৬৭। অবিশ্বাস্য
৬৮। রামচরিত
৬৯। গগনের অসুখ
৭০। জননী
৭১। উদ্বেগ
৭২। একটি গল্পের খসড়া
৭৩। নীরজা
৭৪। অপেক্ষা
৭৫। বন্ধুর জন্য ভূমিকা
৭৬। স্বপ্ন
৭৭। বালিকাবধূ
৭৮। সোপান
৭৯। অপহরণ
৮০। আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

৮১। ইন্টারভিউ
৮২। চরিত্র
৮৩। সংশয়
৮৪। মোহনা
৮৫। বসন্তবিলাপ
৮৬। সম্পর্ক
৮৭। সহচরী
৮৮। দাগ
৮৯। দেখা
৯০। মৃত ও জীবিত
৯১। কী আশায়
৯২। স্বপ্নের নবীন
৯৩। অভিনব প্রেম
৯৪। যক্ষ
৯৫। কলঙ্কীচাঁদ
৯৬। তিলতুলসী
৯৭। হাত
৯৮। কাঁটালতা
৯৯। সে
১০০। সকালে বিকালে
১০১। আমি
১০২। মাছি
১০৩। মণিমালা
১০৪। আমার বাড়িঅলারা
১০৫। অলস ভ্রমণ
১০৬। অচল
১০৭। র‍্যাটকিলার
১০৮। ওরা
১০৯। খুব সম্ভব
১১০। আমি, আমার ছেলে
১১১। আমি এবং ও
১১২। সুখ
১১৩। আয়োজন
১১৪। পাশাপাশি
১১৫। বিচিত্র প্রেম
১১৬। শোকসভার পর
১১৭। তারার আলো
১১৮। রাতের গাড়ি
১১৯। তাপ
১২০। বৃদ্ধস্য ভার্যা
১২১। পরস্পর
১২২। গ্লানি
১২৩। বউচোর
১২৪। মৃতের সহিত কথোপকথন
১২৫। হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি
১২৬। আমরা
১২৭। বনবাস
১২৮। সার্টিফিকেট
১২৯। স্বপ্নের মধ্যে হাঁটা
১৩০। অভিনয় নয়
১৩১। গুণেন একা
১৩২। বিজু আর লতু
১৩৩। আত্মাদর্শন
১৩৪। নেশা

১৩৫। কালিদাস ও কেমিস্ট্রি
১৩৬। প্রেমশশী
১৩৭। অভিলাষী
১৩৮। হৃদয় বিনিময়
১৩৯। এরা ওরা
১৪০। অন্যকিছু
১৪১। পারিবারিক
১৪২। নিগ্রহ
১৪৩। তুচ্ছ
১৪৪। একজন আততায়ীর কাহিনী
১৪৫। প্রেমপত্র
১৪৬। বাড়ি
১৪৭। পালটাপালটি
১৪৮। বাড়িবদল
১৪৯। দূরে বৃষ্টি
১৫০। পুনশ্চ
১৫১। ফাঁদ
১৫২। নবলা
১৫৩। স্থানান্তর
১৫৪। প্রেম
১৫৫। মীরা
১৫৬। চাবি
১৫৭। হেমন্তের সাপ
১৫৮। এক ফেরিঅলা
১৫৯। রগড়
১৬০। একপাশে
১৬১। কলহ
১৬২। কৃষ্ণকথা
১৬৩। ফুলবাগানের পরী
১৬৪। এমনও হয়
১৬৫। আলোর ঝলক
১৬৬। নষ্ট স্বপ্ন
১৬৭। বিচিত্র সেই রামধনু
১৬৮। কেদার মুখুজ্যে ও রানীবালা
১৬৯। হৃদয়তল
১৭০। সুনীতিমালার উপাখ্যান
১৭১। ফুলতোলার সকাল
১৭২। একদিন এক গোলাপ বাগানে
১৭৩। চুম্বক চিকিৎসা
১৭৪। সোহাগ
১৭৫। একটি ঘর
১৭৬। ইন্দ্রিয়
১৭৭। চড়াগন্ধ
১৭৮। বেহুলা
১৭৯। নরকে গতি
১৮০। বসনকালী
১৮১। দৈনন্দিন
১৮২। গণ্ডি
১৮৩। অনাবৃত
১৮৪। হয়ত, হয়ত নয়
১৮৫। হরিশের বিষাদ
১৮৬। কস্তুরী
১৮৭। গ্লানি (পৃথকগল্প)
১৮৮। বনবাসী

১৮৯। নিশীথসঙ্গী
১৯০। ম্যাজিসিয়ান
১৯১। সত্যদাস
১৯২। ভূতের খোঁজে
১৯৩। চেনা-অচেনা
১৯৪। একটি ভূতুড়ে ঘড়ি
১৯৫। সেই আশ্চর্য লোকটি
১৯৬। কেউ কি এসেছিলেন
১৯৭। আগন্তুক
১৯৮। কাম ও কামিনী
১৯৯। ফুটেছে কুসুমকলি
২০০। নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা
২০১। নগণ্য
২০২। সুলক্ষণা
২০৩। শিবকালীর খাঁচা
২০৪। ফণিমনসা
২০৫। গোরাচাঁদ
২০৬। একটি ভৌতিক রেলট্রলি
২০৭। গোয়েন্দা লেখক অগ্নিবর্ম
২০৮। সহযাত্রী
২০৯। চমক
২১০। রসাতল
২১১। কুপিতগ্রহ
২১২। বন্ধুবান্ধব
২১৩। অতঃপর
২১৪। রঙ্গলাল
২১৫। সেকালের সেই রহস্যভাণ্ডার
২১৬। সীতাপতির আশ্রমযাত্রা
২১৭। সেই ঘর, এই বাসা
২১৮। জলজ
২১৯। মিলনোৎসব
২২০। মালিনীচরিত
২২১। রত্নলাভ
২২২। ফুলকি
২২৩। স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ
২২৪। মশারি
২২৫। স্বখাত সলিল
২২৬। একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ
২২৭। মধুঋতু
২২৮। বউ নিয়ে খেলা
২২৯। বিউটি এবং জিজি
২৩০। লালজি চকলুস কোম্পানি
২৩১। লেবুমামার স্বর্গদর্শন
২৩২। পিলকিন্স ইলেভেন
২৩৩। গোয়েন্দা লেখক গুপ্তসভা
২৩৪। বেচুর মাথার ঘিলু
২৩৫। সত্যি ভূতের গল্প
২৩৬। যশিডির বড়মামা
২৩৭। সেই রহস্যময় কুয়াশা
২৩৮। দ্বিতীয় জগৎ

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে বিমল কর নাটক রচনায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। গল্প-উপন্যাসের পূর্বেই তিনি প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সেভাবে তাঁকে নাটক সৃষ্টিতে আগ্রহী হতে দেখা যায় নি। কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়সে সুইডিশ নাট্যকার ইবসেন-এর নাটক দ্বারা বিমল কর ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এমনকি ইবসেন'কে অনুসরণ করেই তিনি নাট্যসৃষ্টিতে মগ্ন হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন–

> 'ইবসেনের নাটকের তখন থেকেই আমি এত অনুরাগী হয়ে
> উঠেছিলাম যে, মনে হত–আমি যদি কোনোদিন নাটক লিখি–
> ইবসেন হবেন আমার আদর্শ।'[১৩]

কলকাতায় থাকাকালীন ১৯৪০-৪১ খ্রিঃ নাগাদ বিমলবাবু শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র অনুকরণে একটি নাটক রচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে রচিত এই নাটকটিতে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন, রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এই নাটকের সাহিত্যমূল্য স্রষ্টার কাছেও স্বীকৃতি পায় নি, পরবর্তীকালে এই নাটকটি হারিয়ে যায়। এরপর কারমাইকেল কলেজের বন্ধুদের অনুরোধে তিনি বেনারসে থাকাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিঃ 'সায়ক' নামে একটি নাটক রচনা করেন। পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এই নাটকটি সমকালীন ভয়াবহ মন্বন্তর, মহামারীর পটভূমিকায় রাষ্ট্রীয় শাসকের ষড়যন্ত্রে অসহায় মানুষের মৃত্যুর ভয়াবহতাকে উপস্থাপিত করেছিল। আধুনিক আঙ্গিকের এই নাটকটিও আজ দুষ্প্রাপ্য। এরপর অনেক গল্প-উপন্যাস লিখলেও তিনি আর নাটক লেখায় প্রবৃত্ত হন নি।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের শুরুতেই নৃপেন সাহা সম্পাদিত 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় বিমল করে'র দ্বিতীয় নাটক 'কর্ণ-কুন্তী সংলাপ' প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ খ্রিঃ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় রচিত এই নাটক মাত্র চারটি দৃশ্যসমন্বিত। নামকরণে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ থাকলেও পৌরাণিকতার পরিবর্তে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষেপ লক্ষ করা যায়। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে মা ও ছেলের সম্পর্কের বিচিত্র রসায়ন এক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। এই নাটকে প্রেম-যন্ত্রণা-মনস্তত্ত্ব-অবক্ষয়ী মূল্যবোধের নানা মাত্রা উঠে এসেছে। সংলাপ রচনা ও চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার বিমল করে'র দক্ষতা প্রতিফলিত।

১৯৬২ খ্রিঃ 'গন্ধর্ব' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বিমল বাবুর একমাত্র একাঙ্ক নাটক 'ঘাতক' প্রকাশ পায়। এই নাটকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দোলাচলতা,

অন্তর্জগতের আলোড়ন, মূল্যবোধের সংকট ধরা পড়েছে। একই পত্রিকায় তাঁর পরবর্তী নাটক 'শঙ্খ' প্রকাশিত হয়। নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিঃ-জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিঃ এবং ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিঃ-এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিঃ এর দুটি সংখ্যায় এই নাটকটি তিনি রচনা করেন। চিনের ভারত-আক্রমণের পটভূমিকায় নাটকটি সৃষ্টি করেন বিমল কর। 'শঙ্খ'কে প্রধানত রাজনৈতিক নাটক হিসেবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এরপর তিনি নাটক রচনায় আর উৎসাহিত বোধ করেন নি। অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নাট্যদ্বন্দ্ব এবং নাট্যরস সৃজনে তাঁর নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও নাটক সৃষ্টিতে তাঁকে আর সক্রিয় হতে দেখা যায় নি। অনেক পরে 'ঘু ঘু' নামে একটি হাসির নাটক বিমল কর রচনা করেন, যদিও তা কোনো স্বতন্ত্র মাত্রার স্বাক্ষর বহন করে না।

দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে বিমল কর বেশ কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ এবং নানা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রথমদিকে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকের ডায়েরি' নামে গদ্যগ্রন্থ লিখলেও তা অন্যের নামে প্রকাশিত হয়। জীবনধারণের তাগিদে এসময় তিনি ছোটোদের উপযোগী গ্রন্থ লেখা শুরু করেন। স্বনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ হল 'ছোটদের শরৎচন্দ্র'। এরপর বিদ্যালয়-পাঠ্য 'পুরাণের গল্প' এবং 'নীল আকাশের কোলে' নামে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বিমল কর রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য।

'দেশ'সহ নানা সাহিত্যপত্রিকায় বিমল কর একাধিক মননশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ৪ জুন, ১৯৫৫ খ্রিঃ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'মৃত্যু ইচ্ছা' নামে তাঁর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। ১৯৫৮–১৯৫৯ খ্রিঃ 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বিমল কর নতুন রীতির ছোটগল্পের স্বরূপ ও আঙ্গিক-বিষয়গত নতুনত্ব সম্পর্কীয় এক যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি একদিকে যেমন সমস্ত তীর্যক সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি নতুন রীতির গল্পকারদের ভিন্ন মাত্রার ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৩৮২ বঙ্গাব্দে 'দেশ'এর সাহিত্যসংখ্যায় 'আমার লেখা' নামক স্মৃতিচারণমূলক গদ্যে বিমল কর নিজের সাহিত্যিক সত্তার নানা দিকগুলোকে অকপটে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া, 'গল্পগুচ্ছ ও আমার রবীন্দ্রনাথ' এবং 'তরুণ গল্প লেখকদের মানসিকতা' প্রবন্ধ দুটি তাঁর মননসমৃদ্ধ লেখনীর অন্যতম উদাহরণ।

সাহিত্যসৃষ্টির সমান্তরালে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিমল কর স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিদুর' ছদ্মনামে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় দীর্ঘকাল সাহিত্যের আলোচনা

করেছেন। 'হর্ষদেব' ছদ্মনামেও তাঁর একাধিক সাহিত্যমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি অজস্র গ্রন্থ-সমালোচনা দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'টুকরো কথা' এবং 'বর্তমান' পত্রিকায় 'লঘুগুরু' নামে একাধিক গদ্য লিখেছিলেন।

বিশ শতকের আটের দশকে প্রকাশিত 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা' একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'কল্লোলযুগ'এর অনুসরণে বিমল কর এই গ্রন্থটি রচনা করেন। সমসাময়িক সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ধারা এবং নানান সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণে গ্রন্থটি ভীষণ সমৃদ্ধ ছিল। এই রচনার মাধ্যমে বিমল করে'র সমকালীন বাংলাসাহিত্যের একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

বিমল করে'র সৃষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'উড়োখই' (১৯৯২)। দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটিকে স্রষ্টা স্বয়ং 'আত্মজীবনী' আখ্যায় অভিহিত করতে চান নি। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর বিনয়ী মন্তব্য—

> ' 'উড়োখই' আমার আত্মজীবনী নয়, স্মৃতিকথা।...সাধারণ একটি মানুষের স্মৃতিকথা হিসেবেই এটিকে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোনো ভাবেই নয়।'[১৪]

স্মৃতিকথনমূলক এই গ্রন্থে বিমল করের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধের কাল এবং পরবর্তীকালের বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনায়নের বিচিত্র ইতিহাস ভাস্বর হয়ে উঠেছে। স্মৃতিচারণকালে কখনোই তিনি ব্যক্তিজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় পাঠক-পাঠিকাকে ক্লান্ত করতে চান নি। বরং, একান্ত নির্লিপ্ততায় সমকালের প্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ লক্ষণীয়—

> 'বিমল করের লেখাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর সেই জীবনকথার বা স্মৃতিপ্রবাহের অহংবিমুক্ত স্বচ্ছতা। এ লেখা কখনও সে জাতীয় আত্মজীবনী নয়, যে জাতীয় রচনায় 'আমি' স্ফীত মূর্তি হয়ে ওঠে।'[১৫]

'উড়োখই' এর দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ শতকের তিনের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সৃজনীধারার নানান ইতিহাস উঠে এসেছে। একইসঙ্গে তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ-বিবর্তনের একটি রূপরেখা ধরা পড়েছে। এই গ্রন্থ বিমল করে'র

গদ্যসৃষ্টির এক স্বতন্ত্র নিদর্শন।

উপন্যাস-গল্প-নাটক-প্রবন্ধ প্রভৃতির সমন্বয়ে বিমল করের সৃষ্টিলোক যথেষ্ট সমৃদ্ধ। গল্প ও উপন্যাস রচনার প্রতি তাঁর শৈল্পিক আগ্রহ বেশি থাকলেও গদ্যসাহিত্যের অন্য দুটি সংরূপ অর্থাৎ নাটক, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি নিজস্বতার চিহ্ন রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির সমগ্র পরিচয়ের মাধ্যমে সাহিত্যিক বিমল করে'র শৈল্পিক প্রতিভার বহুমুখিনতা সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হওয়া যায়।

তথ্যসূত্র :

১. 'কিছু খড় আর কুটো: বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'; বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা; সুব্রত ঘোষ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০০৬; পৃ. ২০৩

২. সাক্ষাৎকার : বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯; পৃ. ৩৭৮

৩. 'কিছু খড় আর কুটো: বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'; তদেব; পৃ. ২০২

৪. তদেব; পৃ. ২০৩

৫. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ১৮

৬. 'দুটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস': 'দেওয়াল' ও 'যদুবংশ'; বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; বিমল কর বিশেষ সংখ্যা; ২০০৩; পৃ. ৯৮

৭. সাক্ষাৎকার : বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; তদেব; পৃ. ৩৮৩

৮. 'আমার লেখা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৭

৯. তদেব; পৃ. ২৫

১০. সাক্ষাৎকার : বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; তদেব; পৃ. ৩৮৫

১১. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ১৯৯৭; পৃ. ১৫৫

১২. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; তদেব; পৃ. ৩৭৮

১৩. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; মে, ২০০৮; পৃ. ১৬৫

১৪. ভূমিকা; 'উড়োখই'(১); বিমল কর; তদেব

১৫. 'স্মৃতি : নদী গাছের উপমায়'; সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; 'দেশ'; ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯৩; পৃ. ১১৫

তৃতীয় অধ্যায়

বিমল করের ছোটগল্পের শ্রেণিবিন্যাস

সময়ের বহমানতায় সাহিত্যস্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি নিরন্তর জারিত হয়ে চলে। সময়মথিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি প্রেক্ষিতে জায়মান অজস্র স্বরে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্ট হয় সাহিত্যিকের সৃজনশীল সত্তা। সময়-প্রেক্ষিতের চলিষ্ণুতায় স্রষ্টার মন-মনন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকাশ-বিবর্তনের আভাস পরিলক্ষিত হয়। অনিবার্যভাবেই নানাবিধ নতুন প্রবণতায় বিম্বিত হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিলোক। সাহিত্যিকের সৃষ্ট সাহিত্যভুবনে এই বহুল মাত্রার প্রতিফলন সাহিত্যসমালোচকদের কৌতূহলী করে তোলে। তাই অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্রষ্টার সৃজনশীলতার স্বরূপ সন্ধানের লক্ষ্যে সৃষ্টি জগতকে বিবিধ শ্রেণিকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তাঁরা সচেষ্ট হন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কালজয়ী গল্পকার বিমল করের সৃজনীসত্তা ও সৃষ্টির অন্তর্লীন সম্পর্কায়নের নিরুচ্চার সত্যকে উন্মোচনে আমরা একান্তভাবে আগ্রহী। তাই তাঁর গল্পসমূহকে নানা শ্রেণিতে বিন্যাসের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ শতকে চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যজগতে গল্পকার রূপেই বিমল করের আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা ইত্যাদি আবহের মধ্যেই তিনি গল্পসৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন। বিমল কর ও তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় 'পূর্বমেঘ' নামে এক নতুন সাহিত্যপত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪২ খ্রিঃ এই পত্রিকার সূচনা সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প 'গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি।' নিজস্ব স্মৃতিকথায় তিনি প্রথম গল্পের প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন —

> 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা বেশ ছিমছাম ভাবেই প্রকাশ পেল। যুদ্ধের বাজারে তখন নিউজ প্রিন্ট আর হ্যাণ্ডমেড পেপারের আবির্ভাব ঘটেছে। কে কি লিখেছিল আমার মনে নেই।...আর আমি একটা বিচিত্র গল্প। নাম ছিল : 'গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি'।[১]

১৯৪২ খ্রিঃ প্রথম গল্প থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত প্রায় ছয় দশক

জুড়ে বিমল কর আপন লেখনীতে অজস্র গল্পের সৃষ্টি করেছেন। সুদীর্ঘ এই রচনাকালে তাঁর গল্পসত্তা সময়জাত অজস্র সংবেদনাকে শৈল্পিকভাবে আত্তীকরণে সমর্থ হয়েছে। তাই বিষয়গত বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের অভিনবত্বে বিমল করের গল্পবিশ্ব স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনীয় আর্থ-সামাজিক–রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নানা ইশারায় গল্পের মধ্যে যেমন বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে, তেমনি আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি গল্পকে আরো ব্যঞ্জনাবহুল করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গল্পসৃজনের ক্ষেত্রে বিমল কর কোনো নির্দিষ্ট একমাত্রিক ভাবনাকে প্রাধান্য দেন নি, বরং বিভিন্ন দশকে জীবনায়নের চলমান ভাষ্যে তিনি স্বীয় গল্পভুবনকে বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর সৃষ্ট দুই শতাধিক গল্পকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় শ্রেণিবিন্যস্ত করা যথার্থই দুরূহ। তবুও বিমল করের গল্পধারায় নিহিত বিভিন্ন প্রবণতার স্বরূপ অনুধাবনে গল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে চিহ্নিত করার জরুরি হয়ে পড়ে। তাঁর সৃজনশীল মনোজগতে ক্রিয়াশীল বহুবিধ বিবর্তনী ভাবনার নিরিখে কালগত বিন্যাসে গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গল্পের অন্তর্বস্তুর বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক কৌশলকে গুরুত্ব দিয়েও বিমলবাবুর গল্পজগতকে বহুবিধ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

স্বয়ং বিমল কর পূর্ববর্তী শতকের শেষ দশকে নিজের গল্পজগতকে রচনার ধারাবাহিকতার মাত্রায় শ্রেণিবিভাজনে ব্যাপৃত হন। 'দেশ' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে (৩রা নভেম্বর, ১৯৯০ খ্রিঃ) তিনি নিজের গল্পগুলিকে কালগতভাবে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণিকরণে পরেও এক দশকের অধিক সময় ধরে তাঁর লেখনী সক্রিয় ছিল। ফলে, আরো নানা মাত্রা যোজনের সম্ভাবনা রয়ে যায়। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে স্রষ্টা বিমল করের এই শ্রেণিবিন্যাস সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও অনুসন্ধিৎসার তাগিদে আমরা তাঁর কৃত কালগত শ্রেণিবিন্যাসকে মান্যতা দিয়ে আরো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি।

কালগত দিক থেকে শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে বিমল করের সৃজনশীল সত্তার অনুভবজাত বিবর্তনী সংরাগকে মূল মাত্রা রূপে ধার্য করা হয়েছে। ছয় দশকব্যাপী সৃষ্টিকালে গল্পভাবনার বিভিন্ন প্রবণতার প্রেক্ষিতে তাঁর গল্পজগতকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

ক. সূচনা পর্ব বা উন্মেষ পর্ব :

প্রথম গল্প 'গিনিপিগ, এস্ত্রাজ ও রাত্রি' (১৯৪২) থেকে 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্প (১৯৫২) পর্যন্ত।

খ. অন্বেষণ পর্ব :

'মানবপুত্র' গল্প (১৯৫৩) থেকে 'পলাশ' গল্প (১৯৫৭) পর্যন্ত।

গ. উপলব্ধি পর্ব :

'সুধাময়' গল্প (১৯৫৭) থেকে 'সুখ' গল্পের (১৯৭৫) পূর্ব পর্যন্ত।

ঘ. উত্তরণ পর্ব :

'সুখ' গল্প (১৯৭৫) থেকে 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' (১৯৯১) গল্প পর্যন্ত।

ঙ. অন্তিম পর্ব :

'নগণ্য' গল্প থেকে শেষ গল্প পর্যন্ত।

ক. সূচনা পর্ব বা উন্মেষ পর্ব :

লেখকজীবনের সূচনাপর্বে অর্থাৎ প্রথম গল্প প্রকাশের পরবর্তী দশ বছরে বিমল কর গল্পসৃষ্টির শৈল্পিক কৃৎকৌশল আয়ত্ত করতে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সময়কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নানা ঘটনায় তাঁর অন্তর্জগত ক্রমাগত আলোড়িত হয়ে চলেছিল। অন্তঃসারশূন্য ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধ, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবন-মৃত্যুর প্রবল টানাপোড়েনে আমাদের জীবন ক্রমশ অসহনীয় হয়ে পড়ে। এই সময় 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অম্বিকানাথের মুক্তি' নামক গল্পে বিমল কর জীবন-মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক ভাবনাকে তুলে ধরেন। এছাড়া, ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের পটভূমিকায় 'সৈনিক' নামে একটি গল্প তিনি রচনা করেন। কয়েক বছর পর 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকাতে 'পিয়ারীলাল বার্জ' ও 'ভয়' নামে তাঁর দুটি গল্প প্রকাশিত হয়।

উন্মেষ পর্বে বিমল কর কয়েকটি মাত্র গল্প রচনা করেছিলেন। সমকালীন যুগে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন। গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের যৌথ প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বিশেষত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের প্রভাবে গল্পের মধ্যে প্রতীকের মাধ্যমে রহস্যসৃষ্টি ও চমকের মাধ্যমে সমাপ্তির টান বিমল করের প্রথম

পর্বের গল্পে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বয়ং বিমল কর এই শৈল্পিক প্রভাবকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন —

> 'আমার প্রথম দিককার গল্প পড়ে অনেকে বলতেন, আমি শ্রী সুবোধ ঘোষের প্রভাবের মধ্যে আছি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সুবোধ ঘোষ তখন আমাদের মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছেন। তাঁর প্রতিটি লেখাই আমাদের অভিভূত করে ফেলত।'[২]

তাসত্ত্বেও, গল্পকার হিসেবে নিজস্বতা প্রতিষ্ঠার শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মন-মনন প্রতি মুহূর্তে সজাগ ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হল 'ইঁদুর' গল্প। 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পে প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের অবচেতনের গূঢ় জটিলতার রূপ প্রকাশিত হয়। 'ইঁদুর' গল্পের মাধ্যমে তিনি নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতাকে যথার্থভাবে সার্থক রূপায়ণে সমর্থ হলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—

> 'কলকাতায় আবার স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করি '৪৬ সাল থেকে, 'ইঁদুর' লিখি 'উত্তরসূরী' পত্রিকায়। লেখকের ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে এই গল্পটি আমার সৌভাগ্যের সূচনা করে।'[৩]

'ইঁদুর' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও এই গল্পেই বিমল কর গল্পকার হিসেবে আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। এই গল্পের পাঠে মুগ্ধ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁকে লেখার আহ্বান জানান। ১৯৫২ খ্রিঃ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পটি প্রকাশ পায়। যুদ্ধোত্তর কালে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয় উঠে এসেছে এই গল্পে। এই গল্পের ক্ষেত্রেও সুবোধ ঘোষের প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। গল্পকারের স্পষ্ট ভাষ্য—

> 'দেশ-পত্রিকার জন্য খেটেখুটে যে গল্পটা লিখলাম, নাম তার 'বরফসাহেবের মেয়ে'। কোনো সন্দেহ নেই গল্পটিতে সুবোধ ঘোষের লেখার প্রচণ্ড প্রভাব ছিল।...তা সুবোধদার লেখায় আমি এতই অনুরাগী ও ভক্ত ছিলাম যে আমার পক্ষে ঠিক তখনই সেই প্রভাব এড়ানোর বিশেষ উপায় ছিল না।'[৪]

তবে 'ইঁদুর' ও 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পদ্বয়ের মাধ্যমে বিমল কর ক্রমশ নিজস্ব শিল্পসত্তা আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে চলেন। বিভিন্ন গল্পকার দ্বারা প্রাণিত হলেও স্বতন্ত্র স্রষ্টা হিসেবে তিনি সাহিত্যজগতে ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই পর্বে সৃষ্ট কয়েকটি গল্পের মধ্যে ভিন্নধর্মী বিষয় উঠে এসেছে। ভাবনার গভীরতা যথাযথভাবে হয়তো প্রকাশ পায় নি, তবুও স্বল্প সংখ্যক গল্পের মধ্যেই বিমল কর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন।

খ. অন্বেষণ পর্ব :

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানবপুত্র' গল্প বিমল করের সৃজনশীল সত্তাকে আত্মপ্রত্যয়ে ঋদ্ধ করেছিল। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পের মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্দ্ধে মানবিক সম্পর্কের সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়েছে। এই পর্বের গল্পে মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র মাত্রাকে নানা গল্পে প্রতিফলনের মাধ্যমে বিমল কর জীবনজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়ে উঠেছেন। বহির্জগতের নানা ভাঙন-গড়নে আলোড়িত মানুষের অন্তর্জগতের নীরব ভাষ্য তাঁর গল্পে ক্রমশ রূপায়িত হয়েছে। অস্তিত্বের সংকটে ধ্বস্ত হয়ে মানুষের জীবনসত্যের স্বরূপ অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা এই পর্বের নানা গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মস্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার কাহিনি 'দুইবোন', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'পালকের পা' ইত্যাদি নানা গল্পে রূপায়িত হয়েছে। সম্পর্কের কৃত্রিমতায় দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে 'অ্যালবাম', 'জানোয়ার', 'আঙুরলতা' ইত্যাদি গল্পে। মানুষের স্বার্থপরতা, আত্মমগ্নতা, অনুভূতির কৃত্রিম প্রকাশ 'অ্যালবাম' গল্পে মল্লিকা-পুষ্প'এর দাম্পত্যজীবনকে যেমন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তেমনি 'দুইবোন' গল্পে সহোদর বোন অনুপমা–নিরূপমার মধ্যে সম্পর্কের ভাঙনকে তুলে ধরেছে।

প্রেমের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নিরিখে জীবন অনুভবের প্রসঙ্গ 'কাচঘর', 'জোনাকি', 'পলাশ' ইত্যাদি গল্পে বিমল কর তুলে ধরেছেন। 'কাচঘর' গল্পে হিরণকে ভালোবেসে জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে শোভনা। মাতৃত্বে অক্ষম হওয়ার যন্ত্রণাকে সে ভালোবাসার পরশে অতিক্রম করতে আগ্রহী। হিরণ তাঁর শরীর অপেক্ষা মনকে বেশি গুরুত্ব দেবে, এই ভাবনায় সে তৃপ্ত হয়েছে। ভালোবাসার স্বরূপ সম্পর্কে শোভনার ধারণা গল্পে ফুটে

উঠেছে —

'ভালোবাসা অন্য জিনিস—স্থূল শারীরিক বিকাশ কখনই
তার অন্তরায় হতে পারে না! পারে না!'[৫]

কিন্তু তাঁর এই ভাবনাকে ব্যর্থ করে দেয় হিরণের মধ্যবিত্ত মানসিকতা। এক নিদারুণ ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে শোভনা। 'বকুলগন্ধ' গল্পে অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি অঞ্জনাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। 'পলাশ' গল্পে প্রেম ও মোহের দ্বান্দ্বিকতায় বিভ্রান্ত হয়েছে রতিকান্ত।

অস্তিত্বের অপূর্ণতায় মানবজীবন মাঝে মধ্যেই যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। আত্মসত্তার পূর্ণতা অনুভবে 'অপর' সত্তা হিসেবে প্রকৃতিকে মানুষ বারে বারেই আপন করতে চেয়েছে। 'অশ্বত্থ' গল্পে সন্তানহারা জননী রেণুর কাছে অশ্বত্থ গাছই সন্তানরূপে প্রতিভাত হয়েছে। অশ্বত্থ গাছকে জড়িয়ে ধরে সে এই জীবনে মাতৃত্বের তৃপ্তি অন্বেষণ করেছে। 'উদ্ভিদ' গল্পে জীববিদ্যার অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশের চেতনায় নিসর্গজগত ও মানবজগত যেন আশ্চর্যভাবে সমীভূত হয়ে গেছে।

অস্তিত্বের সংকটে মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। আত্মগত শূন্যতাকে অতিক্রমণে মানুষ নিয়ত চেষ্টা করে। 'আত্মজা' গল্পে স্ত্রী যূথিকার সন্দেহপ্রবণ মন হিমাংশুকে অস্তিত্বগত যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। বাবা-মেয়ের বাৎসল্য সম্পর্কের সৌন্দর্য ধ্বস্ত হয়ে যায়। হিমাংশু'র পিতৃসত্তা চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং নিজের মানসপ্রবণতা সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ হয়ে আত্মগ্লানিতে সে আত্মহত্যা করে। 'আত্মজা'-র হিমাংশু'র মতোই 'শূন্য' গল্পের নিশীথও জীবনের নানা নঞর্থক ঘটনায় অস্তিত্বের সংকটে আক্রান্ত হয়। জীবনে সে তীব্রভাবেই বাঁচতে চেয়েছে কিন্তু অস্তিত্বগত যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকার পাথেয় অন্বেষণ করেছে—

'আমি পাগল হয়ে যাই, কি মরে যাই–এ আমি চাইনি।
বাঁচতেই চেয়েছি আমি। খালি বুঝতে পারছিলাম না, কি
করে বাঁচব—জীবনের কতকগুলো অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক
দিনের কথা ভুলে গিয়ে কি করে আবার বাঁচতে পারি!'[৬]

এই পর্বে বিমল করের বিভিন্ন গল্পে জীবনজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনসত্য অন্বেষণের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

গ. উপলব্ধি পর্ব :

'সুধাময়' গল্প (১৯৫৭) থেকে বিমল করের গল্পবিশ্বে অন্বেষণের পথে অগ্রসর হয়ে মানুষের জীবনসত্যের স্বরূপ উপলব্ধির প্রচেষ্টা নানা ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। এই পর্বে 'গল্প' এর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, পরিবর্তে মানুষের জীবনের অন্তর্বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'বেঁচে থাকা' নয়, 'অস্তিত্বশীল হওয়া'ই মানুষের পরম লক্ষ্য। আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাহচর্যেই উপলব্ধ হয় জীবনের স্বরূপসত্য।

আত্ম অন্বেষণের মধ্য দিয়ে জীবনের স্বরূপসত্যে অনুভবী হয়ে উঠেছে 'সুধাময়' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাময়। অল্প বয়সে বাবার মৃত্যু, মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি তার মনে মৃত্যুভয়ের সৃষ্টি করে কিন্তু একদিন নিজেই সে মৃত্যুকে সহজরূপে গ্রহণ করে। গল্পের বয়ানে সুধাময়ের উপলব্ধি ধরা পড়েছে—

> 'আত্মসুখ আর আনন্দ যে এক নয় এ-কথা বোঝে নি, ধরতে
> পারেনি নিজেকে পশুর মতন রক্ষা করা ভালোবাসা নয়।
> মৃত্যু একটা নিয়ম, আঘাত যে অভিজ্ঞতা এ-সব তার জানা
> ছিল না।'[৭]

শুধু মৃত্যু নয়, প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চেয়েছে সুধাময়। রাজেশ্বরীর মধ্যে প্রেমের দেহজ আকর্ষণ আর হৈমন্তীর সংস্পর্শে প্রেমের মনজ আকর্ষণকে সে আবিষ্কার করেছে। যে দেহজ কামনায় 'কাচঘর' গল্পের হিরণ শোভনার মধ্যে প্রেমকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সংকীর্ণ কামনাকে অতিক্রম করে সুধাময় প্রেমের শাশ্বত রূপকে উপলব্ধি করেছে। এই প্রেমময় আনন্দই সুধাময়কে সত্তার পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ জীবনপ্রবাহের মধ্যে মৃত্যুর নিয়ত স্পন্দনকে অনুভব করেছে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর অমোঘতাকে সে মেনে নিয়েছে। বিমল করের গল্পধারায় 'অন্বেষণ পর্ব'এ 'যযাতি' গল্পে নীলকণ্ঠ মরণকে অগ্রাহ্য-অস্বীকার করে জীবনের তীব্র সংরাগের খোঁজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু 'উপলব্ধি পর্ব'এ 'অপেক্ষা' গল্পের শিবতোষ জীবনে মৃত্যুর অনিবার্যতাকে অনুভব করেছে। 'জননী' গল্পে মৃত্যু যেন এক অন্তহীন যাত্রা রূপে ধরা দিয়েছে। জীবনের নানা অপূর্ণতা নিয়েই এই যাত্রায় সবাইকে সামিল হতে হয়।

আমরা প্রত্যেকেই যেন এক্ষেত্রে পাথেয়হীন এক পথিক।

'নিষাদ' গল্পে মৃত্যুকে নিয়তি রূপে গল্পকার উপস্থাপিত করেছেন। এই নিয়তিরূপী মৃত্যুর কাছে মানুষ অসহায়। তবুও 'অপহরণ' গল্পের উমাপ্রসাদ মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে খণ্ডকালের জীবনেই অস্তিত্বময়তার তৃপ্তি উপলব্ধি করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে উমাপ্রসাদের ভাবনা লক্ষণীয় —

> 'আজকাল আমার মনে হয় মানুষের জীবনে পরাজয়টা সত্য, বেদনা তার সহচর, তবু আমাদের বেঁচে থাকার একটা সঙ্গত কারণ আছে। এই সাময়িক জীবনকে আমরা সম্মানের জীবন করতে পারি, আমাদের পরাজয় সম্মানের ও অহংকারের হতে পারে।'[৮]

অনৈতিকতা-ছলনা-কামনা-বাসনা-ভোগবাদী চিন্তার প্রাবল্যে মানুষ নানাসময়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। কিন্তু জীবনের বিশেষ পর্যায়ে নিজের আত্মপ্রতারণার স্বরূপ উপলব্ধি করে হাহাকার করেছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে শিশির-কমলেন্দু-অনাদি তিনজনেই শিবানীর প্রতি ভালোবাসার ছলনায় অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছে। 'সংশয়' গল্পের সুধাকান্ত কিংবা 'খুব সম্ভব' গল্পের সুধাবিন্দু নিজেদের আত্মপ্রতারক সত্তার অন্তর্দর্শনে বিপন্নতা বোধ করেছে। মানুষ আপন চাতুর্যে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হলেও নিজের কাছে নিজে সর্বদাই ধরা পড়ে যায়। 'ত্রিলোচন নন্দীর নামের ছড়া' গল্পে মুরারিও নিজের আত্মস্বরূপকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে ত্রিলোচনের দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে —

> 'ত্রিলোচন নন্দীর কথা এই মুহূর্তে আমায় স্বীকার করতে হল, আমার হাতে আমি ধরা আছি।'[৯]

গল্পকার বিমল করের এই সময়কালের গল্পে আত্মগত ভাবনায় জীবনকে বিচিত্র মাত্রায় মানুষের উপলব্ধির ভাষ্য পরিস্ফুট হয়েছে।

ঘ. উত্তরণ পর্ব :

বিমল করের গল্পধারায় এই পর্বে জীবনের বহুস্বরিকতার সত্যকে উপলব্ধি করে মানুষের ক্রমশ দার্শনিক জীবনবোধে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষণীয়। 'সুখ' গল্প থেকেই

গল্পকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের নানা সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। 'সুখ' গল্পে মীনা-শুভেনের উজ্জ্বল দাম্পত্যের বিপ্রতীপে বয়স্ক দম্পতি বরদাকান্ত-সুবর্ণের দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেমের নিবিড় প্রকাশ উঠে এসেছে। 'উপাখ্যান', 'নীরজা' ইত্যাদি গল্পে দাম্পত্যের মধ্যে অস্থির টানাপোড়েনের ছবি ফুটে উঠেছিল। 'সুখ' গল্পে অস্থির দাম্পত্যের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ভালোবাসাময় দাম্পত্যের সৌন্দর্য রূপায়িত হয়েছে। 'এরা ওরা' গল্পেও হেমদা-সুশীলার দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের চিরন্তনতা প্রকাশিত। সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-অভিমান অতিক্রম করে দাম্পত্য সম্পর্কের নিবিড়তায় জীবনকে অনুভব করাও এক পরম প্রাপ্তি। 'এরা ওরা' গল্পে স্ত্রীর সাহচর্যে হেমদাকান্ত জীবনের এক প্রাপ্তিবোধে ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন—

> '...স্ত্রীর এই স্পর্শ থেকে তিনি অনুভব করছেন সুশীলা কত গোপনে কত গভীরে তাঁকে ইহজীবনের সমস্ত মমতা, নিবিড়তা, সান্নিধ্য, ভালবাসা নিবেদন করছে এবং বিষণ্ণতাও।'[১০]

'সুখ' গল্প থেকেই বিমল কর দার্শনিকচেতনায় জীবনবোধের উত্তরণের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য —

> 'যখন আমার বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন হয়ে গেছে, তখন বোধ হয় 'সুখ' বা 'তুচ্ছ' ধরনের গল্প থেকে, মোটামুটিভাবে আমার একটা স্থিরতা এসেছে।'[১১]

প্রথম দিকে 'কাচঘর', 'বকুলগন্ধ', 'মোহনা' গল্পে প্রেমের জন্য মানবমনে অস্থিরতা-দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা অনুভূতিগুলি উঠে এসেছে। এই পর্বে 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে সব অতিক্রম করে প্রেম সম্পর্কীয় দার্শনিক বোধের কথা উচ্চারিত হয়েছে। ভালোবাসার জন্য অনেক যন্ত্রণাময় পথ অতিক্রম করতে হয়, তবুও তার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই। ভালোবাসা'র এই সত্য সম্পর্কে কনকসখি'কে সচেতন করে দেয় ইন্দ্র —

> 'কনকসখি, ভালোবাসা জিনিসটি এই রকমই। দেবতারা সমুদ্রমন্থন করে অমৃত তুলেছিলেন। ভালোবাসাটিও যে মন্থন করে তুলতে হয় গো! তার অনেক দুঃখযন্ত্রণা মনোকষ্ট। কত হতাশার পর হয়ত সে তোমার কাছে ধরা দেয়, আবার দেয় না।'[১২]

মৃত্যুবোধের ক্ষেত্রেও এই পর্বের গল্পে এক আশ্চর্য দার্শনিক উত্তরণ লক্ষণীয়। 'উন্মেষ পর্ব'এ 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্পে এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাহ্যিকভাবে জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার বিষয়ে নিস্পৃহতা দেখালেও শেষ সময়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনকেই আপন করতে চেয়েছিলেন। 'যযাতি' গল্পে নীলকন্ঠও মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনের আনন্দময়তায় মগ্ন থাকতে চান। কিন্তু 'উত্তরণ পর্ব'এ 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পের নন্দকিশোর মৃত্যুকে অস্বীকার করেন নি, বরং মৃত্যুবোধে আত্মস্থ হয়ে জীবনের বৈচিত্র্যময়তায় ঋদ্ধ হতে চেয়েছে। এই গল্পের মাধ্যমে গল্পকার জীবনের সমান্তরালে মৃত্যুর অমোঘ উপস্থিতির দার্শনিক ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও রূপকধর্মিতার ব্যবহারে 'সত্যদাস', 'যুধিষ্ঠিরের আয়না', 'কাম ও কামিনী' ইত্যাদি গল্পের মধ্য দিয়ে বিমল কর জীবন সম্পর্কে দার্শনিক বোধের গভীরতায় পাঠক-পাঠিকাদের সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'উত্তরণ পর্বে'র গল্পসমূহে জীবনবোধের বাস্তবতাকে স্বীকার করে দার্শনিকবোধে মানুষের উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ঙ. অন্তিম পর্ব :

'উপাখ্যানমালা'র রূপকধর্মী গল্পগুলি লেখার পর বিমল কর লেখনীকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। তবু সৃজনশীল সত্তার অবিরাম ইশারায় আরো একদশক তিনি গল্পসৃজনে মগ্ন ছিলেন।

এই পর্বে বিমল কর 'জলজ', 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ', 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' ইত্যাদি কয়েকটি মনস্তত্ত্বধর্মী গল্প লিখলেও তেমনভাবে নতুন কোনো মাত্রার সংযোজন দেখা যায় না। তবে, এই সময়কালে বড়গল্প রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ করা গেছে।

অন্তিম পর্বে বিমল করের গল্পবিশ্বে প্রধানত সরস বা হাস্যরসাত্মক গল্পসৃষ্টির প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে। 'রসাতল', 'রঙ্গলাল', 'মিলনোৎসব', 'রত্নলাভ' ইত্যাদি গল্পে নির্মল হাস্যরসই প্রধান্য পেয়েছে। এছাড়া শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি নানারকম রহস্যময় ও মজার গল্পও এই সময়কালে রচনা করেন। এই পর্বে গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে নতুন ধরনের সৃষ্টির প্রয়াস তেমন দেখা যায় নি।

মানবজীবনের বিচিত্র অনুভূতিসমূহকে বিমল কর বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে শৈল্পিক

দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পজগতের বহুমাত্রিকতার বিশ্লেষণ করলে নানা বিষয়ের সহাবস্থান লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই বিষয়গত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে এই গল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে —

ক. মনস্তত্ত্বসম্মত গল্প

খ. প্রেমমূলক গল্প

গ. জীবনবোধের গল্প

ঘ. মৃত্যুচেতনা বিষয়ক গল্প

ঙ. দার্শনিকচেতনা বিষয়ক গল্প

চ. রাজনৈতিক গল্প

ছ. প্রতীকধর্মী গল্প

জ. রূপকাশ্রিত গল্প

ঝ. সরস গল্প

ঞ. গোয়েন্দা বা রহস্য গল্প

ট. মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক বিষয়ক গল্প

ক. মনস্তত্ত্বমূলক গল্প :

গল্পের মধ্যে মানুষের জীবনায়ন ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিমল কর সর্বদাই মানুষের অন্তর্জগতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বহির্বাস্তবের প্রভাবে আমাদের জীবনের অন্তর্বাস্তবতায় যে বহুমুখী আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা 'উদ্বেগ', 'স্বপ্নের নবীন', 'নিষাদ' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে। মানুষের অবচেতন মনের অবদমিত ও নিরুদ্ধ ভাবনা-ইচ্ছা-কামনা-বাসনার নানান প্রকাশ 'ইঁদুর', 'কাঁটালতা', 'গুণেন একা', 'জলজ' ইত্যাদি গল্পে শৈল্পিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'আত্মজা' গল্পে বাবা-মেয়ের সম্পর্কের জটিল রসায়ন যেমন পরিস্ফুট, তেমনি 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পে বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি শিবতোষের অনিবার্য গোপন আকর্ষণের প্রসঙ্গ গল্পকার স্ব-নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন।

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে গল্প সৃজনের ক্ষেত্রে মানব মনস্তত্ত্বের নানান উন্মোচন বিমল করের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মানুষের সামাজিকসত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ় অনুভবকে গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি 'গগনের অসুখ', 'সহচরী', 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' মতো

সার্থক মনস্তত্ত্বসম্মত গল্প রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। মানুষের মনোজগতে অস্তিত্বগত টানাপোড়েনের শিল্পিত ভাষ্য তাঁর সৃষ্ট 'সুধাময়', 'অপেক্ষা' ইত্যাদি গল্পে অসাধারণভাবে রূপলাভ করেছে।

খ. প্রেমমূলক গল্প :

মানবজীবনের অন্যতম স্পর্শময় অনুভূতি হল প্রেম। প্রেমের স্বরূপ, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভূতি প্রকাশে বিমল কর একাধিক গল্প রচনা করেন। 'হৃদয় বিনিময়', 'বসন্তবিলাপ' এর মতো কয়েকটি মিলনান্তিক প্রেমের গল্প লিখলেও তিনি প্রেমের গভীরতর স্বরূপ উন্মোচনে 'সুধাময়' এর মতো নান্দনিক গল্পেই সার্থকতা লাভ করেছিলেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে শরীর ও মনের অন্তর্লীন সম্পর্কের চিরন্তনতা সুধাময় অনুভব করেছিল। তাই সে প্রেমজাত আনন্দের মধ্য দিয়ে সত্তাগত পূর্ণতালাভে তৃপ্ত হতে চেয়েছে।

আবার 'বকুলগন্ধ', 'উদ্ভিদ', 'বন্ধুর জন্য ভূমিকা' বিভিন্ন গল্পে প্রেমের ব্যর্থতায় মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের অনুভব নানা মাত্রায় উঠে এসেছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে ভালোবাসা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় শিবানীর বারে বারে প্রতারিত হওয়ার বেদনা প্রেমিকদের আত্ম-স্বীকারোক্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

'জলজ', 'অনাবৃত' গল্পে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের টানাপোড়েন দেখা গেছে। 'জলজ' গল্পে বৈমাত্রেয় ভাই রন্টুর প্রতি গোপন আকর্ষণকে অস্বীকার করতে না পেরে জলজ সবাইকে ত্যাগ করে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অন্যদিকে 'অনাবৃত' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কে অতৃপ্ত ইন্দুলেখা অসমবয়সী রাজার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজার সাহচর্যের মধ্যে সে ভালোবাসার স্পর্শ খুঁজে পেয়েছে। চল্লিশোর্ধ ইন্দুলেখার ভণিতাহীন স্বীকারোক্তি—

> 'আমি আমার কাছেই বলছি, আমি ওই রাজার যৌবনের ভালমন্দ দুইই ভালোবেসেছি। ও আমার কাছে শুধু রাজা নয়, একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের তাজা ছেলে নয়, ও তারও বেশি হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[১৩]

শেষের দিকে রচিত 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ-রূপ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে বিশ্বাস রাখার দার্শনিক ভাবনা বর্ণিত হয়েছে।

গ. জীবনবোধের গল্প :

বিমল করের জীবনবোধের প্রকাশ সমন্বিত গল্পের মূল সুরই হল মানবিকতা। সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ের বিপরীতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি সবচেয়ে বেশি মান্যতা দিয়েছেন।

মন্বন্তরের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে মানবিক সম্পর্কের চিরন্তন গল্প হয়ে উঠেছে বিমল করের 'মানবপুত্র'। এই গল্পে এক অমানবিক সমাজের ছবি উঠে এসেছে; যেখানে বিত্তবান মানুষরা গঙ্গামণির মতো এক অসহায় মেয়েকে খাদ্যের লোভ দেখিয়ে ভোগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। প্রতারিত-বিধ্বস্ত এই মেয়েটি যখন একটু খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় দিশাহীন, তখন হোটেল কর্মী কেষ্ট জীবিকা হারানোর ঝুঁকি নিয়েও তাকে সাহায্য করে। নিজের প্রাপ্য খাবার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গঙ্গামণির রসনার আবদার মেটাতে চেষ্টা করেছিল। যদিও মালিকের নজরে পড়ে যাওয়ায় শেষ রক্ষা হয় নি। এই গল্পে মানবিকতার সার্থক ছবি গল্পকার তুলে ধরেছেন।

'আঙুরলতা' গল্পের কাহিনি বিন্যাসে এক সদর্থক জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। নন্দের দ্বারা প্রেমে প্রতারিত হয়ে আঙুরলতা দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়। তবু মানবিকতা বোধের টানে সে অসুস্থ নন্দকে চিকিৎসায় সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। এমনকি, নন্দের মৃত্যুর পর নিজের দেহ ব্যবহার করে টাকা রোজগার করে আনে এবং সেই টাকায় দাহকার্য সম্পন্ন করে। নন্দের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকলেও আঙুরলতা নিজের মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিতে পারে নি। মানবিকতার এই ভাষ্য রচনায় বিমল কর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সুখ', 'সম্পর্ক', 'এরা ওরা' ইত্যাদি গল্পেও জীবনবোধের বিভিন্ন সদর্থক মাত্রা ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

ঘ. মৃত্যুচেতনা বিষয়ক গল্প :

বিমল করের গল্পভুবনে মৃত্যুচেতনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানবজীবনে মৃত্যুর অভিঘাত, মৃত্যুভয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুসম্পর্কীয় দার্শনিক উপলব্ধি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গকে তিনি গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। বিশ শতকে চারের দশকে 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্প থেকেই বিমল কর মৃত্যুর বহুল স্বরকে নানা গল্পে

ভাষায়িত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তাঁকে মৃত্যু সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিলে বারে বারে। স্বীয় জীবনে মৃত্যুভাবনার প্রভাব নিয়ে তাঁর বক্তব্য —

'আসলে মৃত্যুচিন্তা আমাকে দীর্ঘকাল অধিকার করেছিল।
আমি নিজে খুব 'সিক' ছিলাম এবং এই চিন্তাটা আমাকে
খুব ভুগিয়েছে। এ নিয়ে আমি অনেক গল্প লিখি...'[১৪]

ব্যাধি-অসুস্থতার অনুষঙ্গে 'গগনের অসুখ', 'শীতের মাঠ', 'উদ্বেগ' ইত্যাদি গল্পে মৃত্যুচেতনার কথা উঠে এসেছে। 'গগনের অসুখ' গল্পে গগন যেমন মৃত্যুর শীতল অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছে, তেমনি 'উদ্বেগ' গল্পে শহর জুড়ে মড়কের প্রকোপে শিশির মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত হয়েছে। 'মাছি' গল্পে দেবকীর স্বামীও মৃত্যুভয়ে বিপর্যস্ত বোধ করেছে।

'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' এবং 'নিষাদ' গল্পে মৃত্যুর নিয়তিকল্প রূপ ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায় সমর্পণে বাধ্য হওয়া এক্ষেত্রে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

'জননী' ও 'রামচরিত' গল্পে গল্পকার মৃত্যুকে এক অনন্ত যাত্রা রূপে বর্ণনা করেছেন। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের বাবা মৃত্যুকে এই বিশ্বচরাচরে মিশে যাওয়ার ছাড়পত্র হিসেবে গণ্য করতেন। মৃত্যু সম্পর্কে এই দার্শনিক উপলব্ধি বিমল করের 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পেও প্রতীয়মান হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি করেই জীবনে বেঁচে থাকার সত্যকে নন্দকিশোর স্বীকার করেছে।

মৃত্যুচেতনা সম্পর্কীয় গল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল 'অপেক্ষা'। এই গল্পে শিবতোষের অনুভবের মধ্য দিয়ে মানবজীবনে মৃত্যুর অনিবার্য আগমন এবং বেঁচে থাকা অর্থে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রতীক্ষার চিরসত্য বিমল কর পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

ঙ. দার্শনিকচেতনা বিষয়ক গল্প :

জীবনে অজস্র অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতার অন্বেষণ এবং পূর্ণতার আনন্দে জীবনের শাশ্বত সত্যের একান্ত অনুভবই বিমল করের জীবনদর্শনের মূলভাষ্য। আনন্দ-যন্ত্রণা-প্রেম-মৃত্যু-ব্যর্থতা সবকিছুর মধ্য দিয়ে জীবনের মূলীভূত সত্যকে তিনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্পে বহুবিধ মাত্রায় জীবনদর্শন বিম্বিত হয়েছে।

'সুধাময়' গল্পে সুধাময় মৃত্যু ও প্রেমের মধ্য দিয়ে সত্তার পূর্ণতাকে অনুভব করতে

চেয়েছে। বাবা-মায়ের মৃত্যু তাকে যেমন মৃত্যুভয় জয় করতে সাহায্য করেছে, তেমনি রাজেশ্বরী-হৈমন্তীর প্রতি ভালোবাসায় সে প্রেমের যথার্থতাকে উপলব্ধি করেছে। আর মৃত্যুকে স্বীকার করে প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনকে জানতে সুধাময় ব্যাকুল হয়েছে।

'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' গল্পে মানুষের আত্মস্বরূপ অনুভবের দার্শনিক ভাবনা ফুটে উঠেছে। বহির্জাগতিক মায়ায় বিভ্রান্ত হলেও অন্তর্জগতে প্রতিটি মানুষই নিজের প্রকৃত স্বরূপকে চিনতে পারে। মুরারির প্রতি ত্রিলোচনের ভাষ্যে জীবনের এক দার্শনিক ভাবনা ফুটে উঠেছে—

> 'তুমি তোমার হাতে ধরা আছ। আমায় বিশ্বাস করো না করো কথাটা সত্যি।'[১৫]

'অপহরণ' গল্পে মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে খণ্ডকালের মধ্যে জীবনকে সর্বতোভাবে অনুভবের কথা উঠে এসেছে। 'সত্যদাস' গল্পে মহাকালের প্রেক্ষিতে ছয়টি ঋতুর আবর্তনে আমাদের খণ্ডকালের জীবন স্পন্দিত হয়ে চলে, সেই দার্শনিক সত্যকে গল্পকার উন্মোচিত করেছেন। জীবন-মৃত্যুর অবিরাম দ্বান্দ্বিকতা 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

চ. রাজনৈতিক গল্প :

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিমল করের চেতনায় প্রভাব ফেললেও তিনি কোনো রাজনৈতিক দর্শনের আধারে গল্প রচনা করেন নি। তবে তাঁর কিছু গল্পে সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবনার পরোক্ষ প্রভাব দেখা গেছে।

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নিগ্রহ' গল্পে এক বন্দী সুবোধের উপর পুলিশি অত্যাচার এবং সুবোধের ভাষ্যে অন্তঃসারশূন্য সমাজের নিদারুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। নকশাল আন্দোলনের আগুনে-আবহকে কেন্দ্র করে 'সে' গল্পটি রচিত হয়েছিল। এই গল্পে আদিত্যের মুখোমুখি হওয়া এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীর বয়ানে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সমাজের অবক্ষয়িত রূপ উন্মোচিত হয়েছে। আদিত্যের আক্রমণের সামনে কথক আত্মবিশ্লেষণী হয়ে নিজের অসততা-ভণ্ডামি-অনৈতিকতাকে স্বীকার করে এবং নিজের বিকৃত স্বরূপ দেখে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়। এছাড়া 'ওরা' গল্পে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই তিনটি গল্প

ব্যতীত বিমল করের অন্য কোনো গল্পে রাজনৈতিক বিষয়ক ভাবনা প্রকাশ পায় নি।

ছ. প্রতীকধর্মী গল্প :

সমাজ ও জীবনের নিগূঢ় সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিমল কর একাধিক প্রতীকধর্মী গল্প রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্পে প্রতীকের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষণীয়। ছয় দশকের গল্পসৃজনে তিনি নানাবিধ প্রতীক ব্যবহার করেছেন।

প্রথম দিকে রচিত 'ইঁদুর' গল্পে সন্দেহপ্রবণ মলিনার অবদমিত বাসনার প্রতীক হয়ে উঠেছে ইঁদুর। ইঁদুর সম্পর্কীয় ভীতির আড়ালে তার মনের জটিল রহস্য সুপ্ত ছিল। তাই নিজের রুদ্ধ বাসনাকে সে বাসুদেবের মধ্যে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

'শীতের মাঠ' গল্পে নির্জন রুক্ষ প্রান্তরটি প্রকৃতপক্ষে নবেন্দু'র নিঃসঙ্গতা-একাকীত্বকেই প্রতীকায়িত করেছে। আবার 'বকুলগন্ধ' গল্পে বকুল ফুল অঞ্জনার জীবনে অচরিতার্থ প্রেমের প্রতীক রূপে উপস্থিত হয়েছে। বকুল ফুলকে স্পর্শ করে তীব্র আশ্লেষে সে শ্যামলকে মনে মনে ছুঁতে চেয়েছে। বকুল ফুল যেন শ্যামলেরই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

'সোপান' গল্প সম্পূর্ণটাই প্রতীকী হয়ে উঠেছে। এই গল্পের প্রতীকী বয়ানে মানবজীবনে সম্পর্কের কৃত্রিমতা, ছদ্ম নৈতিকতা, বিসর্পিল জীবনপথের অনিশ্চয়তাকে গল্পকার সামগ্রিকভাবে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

এছাড়া 'জোনাকি', 'কাঁটালতা', 'পলাশ' ইত্যাদি গল্পেও প্রতীকধর্মিতা নতুন মাত্রায় উঠে এসেছে।

জ. রূপকাশ্রিত গল্প :

রূপকের আড়ালে জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকে বারে বারে শৈল্পিকভাবে প্রকাশে দক্ষতা দেখিয়েছেন বিমল কর। রূপকের মাধ্যমে জীবনের গভীরতর সত্যকে সহজে উপস্থাপন করা যায়; আপাত সরল কাহিনিও ব্যঞ্জনাবহুল হয়ে ওঠে।

বিমল কর 'উপাখ্যানমালা' গল্পসংকলনে সচেতনভাবে রূপক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তবুও আগে থেকেই তাঁর বিভিন্ন গল্পে রূপকধর্মিতার প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন আভাস ফুটে উঠেছে। 'অপেক্ষা' গল্পে চিঠি, চিঠির প্রেরক এবং চিঠির জন্য

প্রতীক্ষা রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে। এই রূপকের আড়ালে মৃত্যুর অনিবার্য অথচ অনিশ্চিত আগমনের স্বরূপ ব্যঞ্জনাবহুলতায় ব্যক্ত হয়েছে। 'রামচরিত' এবং 'হরিশের বিষাদ' গল্পেও পৌরাণিক কাহিনিকে গল্পকার রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'উপাখ্যানমালা'র পাঁচটি গল্পই প্রকৃতপক্ষে বিমল করের রূপক ব্যবহারে শৈল্পিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে রূপকের মাধ্যমে মানুষের মর্মচক্ষুর উন্মীলনের ব্যর্থতা উঠে এসেছে। আবার 'সত্যদাস' গল্পে ছয় ঋতুর চলনে মহাকালের প্রেক্ষিতে মানব জীবনের চলমানতার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' গল্পে রূপকের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্ম-অবলোকনের প্রসঙ্গ গল্পকার তুলে ধরেছেন। আর 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে ধর্মরাজ ও নন্দকিশোরের কথোপকথনের রূপকে জীবন-মৃত্যুর চিরন্তন দ্বান্দ্বিক রূপ উঠে এসেছে।

ঝ. সরস গল্প :

গল্পকার জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একাধিক সরস গল্প সৃষ্টি করেছিলেন বিমল কর। এইসব গল্পে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ততা বা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয় নি, বরং কৌতুকহাস্যের মাধুর্যে গল্পগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'বসন্তবিলাপ', 'কালিদাস ও কেমিস্ট্রি', 'হৃদয় বিনিময়' ইত্যাদি গল্পে নির্মল হাস্যরসের আবহে নরনারীর প্রেমের সম্পর্ককে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঘটনার অসঙ্গতি ও চরিত্রদের অসঙ্গতি, উভয়ক্ষেত্রেই গল্পের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। জীবনের প্রাণোচ্ছল অনুভূতিগুলিকে গল্পকার পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'বৃদ্ধস্য ভার্যা', 'রত্নলাভ', 'বিচিত্র প্রেম' প্রভৃতি গল্পে প্রধানত কৌতুকহাস্যই (Humour) প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনের গুরুগম্ভীর বিষয়গুলিকে গল্পকার হাস্যরসের স্পর্শে সহজ-সরল করে দিতে চেয়েছেন।

ঞ. রহস্য গল্প :

প্রধানত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ দান করার উদ্দেশ্যেই বিমল কর বেশ কিছু রহস্যধর্মী গল্প রচনা করেন। পরিবেশ সৃষ্টি ও ঘটনার চমকে গল্পগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ভৌতিকতা-বিজ্ঞান-কল্পনা প্রভৃতির বিমিশ্রণে গল্পকার জীবনের রহস্যময়তাকে তুলে ধরেছেন।

'ভূতের খোঁজে', 'একটি ভূতুড়ে ঘড়ি' প্রভৃতি গল্পে প্রধানত ভৌতিক রহস্য তৈরি হয়েছে। তবুও শেষ পর্যন্ত গল্পগুলিতে মানবিক সম্পর্কের কথাই উঠে এসেছে। 'সেই আশ্চর্য লোকটি', 'কেউ কি এসেছিলেন' গল্পগুলিতে এক রহস্যময় অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। এছাড়া 'একদিন এক গোলাপ বাগানে', 'হারানো জিপের রহস্য' গল্পে অলৌকিকতার পাশাপাশি যুক্তিসচেতনতাও সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

ট. মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক গল্প :

নিসর্গ ও মানবের চিরন্তন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিন্যাস বিমল করের নানা গল্পে ব্যঞ্জনাময়তায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্তাগত অপূর্ণতায় মানুষ প্রায়শই নিসর্গের সাহচর্যে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই মানবজীবনে প্রকৃতি সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'অশ্বত্থ' গল্পে মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীন সম্পর্কায়ন শিল্পিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পে সন্তান হারানো যন্ত্রণায় কাতর রেণু অশ্বত্থ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে নিজের অতৃপ্ত মাতৃত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্যাকুল হয়েছে। নিসর্গ ও মানবের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত বাৎসল্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

'উদ্ভিদ' গল্পে মানবজীবনে নিসর্গ প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব উপস্থাপিত হয়েছে। জীববিদ্যার অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশ প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার আগ্রহে নিজের মধ্যে নিসর্গের রহস্যময়তাকে আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে সে নিজেই কখন যেন প্রকৃতির মধ্যে সাঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দন অবচেতন মনে নিজেকে বটবৃক্ষ হিসেবে উপলব্ধি করেছে। বটগাছ হয়ে সে দুটি অসহায় মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছে —

> 'বিরাট বিশাল দৈত্যের মতন চেহারা নিয়ে, শাখা-প্রশাখা
> পল্লব ছড়িয়ে চন্দন ছুটতে ছুটতে ভাবল–তার দেহের এই
> শাখা অথবা প্রশাখায়, এই অজস্র পাতার আড়ালে সেই দুটি
> মানুষকে ও লুকিয়ে ফেলবে, আড়াল করে নেবে, তারপর
> মাথায় করে পার করে দেবে পাহাড়।'[১৬]

এছাড়া 'পলাশ', 'বকুলগন্ধ' ইত্যাদি গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিকতা

ফুটে উঠেছে।

গল্পকার বিমল কর ছোটগল্পের পাশাপাশি অনেকগুলি বড়গল্প লিখেছিলেন। ১৯৫৮-৫৯ খ্রিঃ 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় নতুন রীতির গল্পের স্বরূপ আলোচনাকালে তিনি গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ককে নতুনভাবে অবলোকন করেন। তাঁর মতে, আধুনিক গল্প ক্রমশ উপন্যাসের অন্তঃস্থ ধর্ম আয়ত্ত করবে। বিমলবাবুর এই মন্তব্যের মধ্যেই পরবর্তীকালে তাঁর বড়গল্প সৃষ্টির মনোভাব ধরা পড়েছে।

প্রাকরণিক কৌশলের নিরিখে 'ছোটগল্প' এবং 'বড়গল্প' এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যথেষ্ট দুরূহ। আয়তনের দিক বিচার করলে চূড়ান্ত বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় 'বড়গল্প' এর ক্ষেত্রে দেড়শো পৃষ্ঠার পরিধি ধার্য করেছিলেন। যদিও এই ভাবনার সঙ্গে সহমত হওয়া সহজ নয়। 'ছোটগল্প' ও 'বড়গল্প' এর পার্থক্য নির্ণয়ে সাহিত্য-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মননঋদ্ধ মতামত লক্ষণীয় —

> 'ছোটগল্প ও বড়গল্পের প্রভেদ বুঝতে চাই ভিতরের দিক থেকে। ছোটগল্পে আরম্ভবিন্দু থেকে তার চরম ক্ষণটি খুব দূরে থাকে না। সে বিশ্লেষণপরায়ণ নয়, সংশ্লেষণেই তার মুক্তি। সে খুলে বলতে ততটা রাজি নয়। বড়গল্পের ক্লাইম্যাক্স প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। তার চলনে একটু মন্থরতা, বলনে একটু বিলম্বিত লয়। সে ঢেকে রাখার ব্যাপারে কিছুটা পরান্মুখ।'[১৭]

আয়তনের পরিবর্তে স্বরূপধর্মকে মান্যতা দিয়ে বিমল কর বড়গল্প রচনা করেছেন। তাঁর বড়গল্পের 'বড়ত্ব' কখনোই অপ্রাসঙ্গিকতায় আক্রান্ত হয়নি। মাত্রাবোধে বড়গল্পগুলি যথাযথ হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের শেষ দিকে বিমল কর ক্রমশ বড়গল্প সৃষ্টিতে অগ্রসর হন। তবে উক্ত শতকের আট ও নয়ের দশকে তিনি একাধিক বড়গল্প রচনা করেন। 'জলজ', 'মালিনী চরিত', 'একটি স্বপ্নের গল্প ও কুমুদ', 'অনাবৃত', 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বড়গল্প।

তবে, পরবর্তীকালে বিমল কর তাঁর অধিকাংশ বড়গল্পকে কখনো 'নভেলেট', কখনো বা উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ করেছেন। 'বালিকাবধূ', 'জলজ', 'মালিনীচরিত'

যেমন উপন্যাস হিসেবে নতুন করে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, তেমনি 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ', 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' নভেলেট রূপে পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। তবুও, বিমল করের সৃষ্টিলোকে এই গল্পগুলির বড়গল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কালগত-বিষয়গত-রীতিগতভাবে বিমল করের দ্বিশতাধিক গল্পকে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা তৈরি হয়। বিশেষত বিষয়গত শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায়। কেননা, কোনো কোনো গল্পের অন্তর্বয়নে একাধিক বিষয়ের সম্মিলন লক্ষ করা গেছে। ফলে একই গল্পকে একাধিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবুও বিমল করের সৃজনভাবনার বিবর্তনের পাশাপাশি গল্পসৃষ্টির নানা মাত্রা সম্পর্কে যথাযথ ধারণাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই তাঁর গল্পসমুহকে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে গল্পকারের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. 'উড়োখই'(১) : বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ১৯৯২; পৃ. ১৯২

২. প্রস্তাবনা : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১ম সংস্করণ; ১৯৭৩

৩. তদেব

৪. 'উড়োখই'(১) : বিমল কর; তদেব; পৃ. ৩০৮

৫. 'কাচঘর' : বিমল কর; কাচঘর; ক্লাসিক প্রেস; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২; পৃ. ১৬

৬. 'শূন্য' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ; ৪র্থ মুদ্রণ; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ১৬৬

৭. 'সুধাময়' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব, পৃ. ২৫৮

৮. 'অপহরণ' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৪৬৪

৯. 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৮০

১০. 'এরা ওরা' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৬২১

১১. '...আমার পরিশ্রমটা অনেকটা মজুরের মতন': বিমল করে'র সাক্ষাৎকার; প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়; সাপ্তাহিক 'দেশ'; ৩ নভেম্বর, ১৯৯০; পৃ. ৩২

১২. 'ফুটেছে কুসুমকলি' : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ. ১০৮

১৩. 'অনাবৃত' : বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯৮৯; পৃ. ১১৪

১৪. '...আমার পরিশ্রমটা অনেকটা মজুরের মতন' : বিমল করের সাক্ষাৎকার; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়; তদেব

১৫. 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৭৯

১৬. 'মানসাঙ্ক': বিমল কর; সুধাময়; এভারেস্ট বুক হাউস; ১৯৫৯; পৃ. ১২৪

১৭. 'মাঝারি মাপের আয়না' : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; সাপ্তাহিক 'দেশ'; ২১ অক্টোবর, ১৯৮৯; পৃ. ২৫-২৬

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনদর্শন

'জীবনদর্শন' শব্দবন্ধটি সর্বদাই বহুমাত্রিক। কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থময়তায় বা বিশেষ তত্ত্বের নিরিখে কোনো ব্যক্তির 'জীবনদর্শন'কে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আভিধানিক অর্থে, জীবনের মূলীভূত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথার্থ বোধ তথা সামগ্রিক ধারণাকে জীবন দর্শনের সংজ্ঞা হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও, তা কখনোই চূড়ান্ত সংজ্ঞা রূপে নির্ধারিত হতে পারে না। স্থান-কালের প্রেক্ষিতে মানুষ জীবনের স্পন্দনকে বিবিধ মাত্রায় অনুভব করে। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবনদর্শন স্বতন্ত্র। একজন মানুষ কোনো পূর্বনির্দিষ্ট দার্শনিকবোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের নিরন্তর দ্বিরালাপে তার জীবন ক্রমশ এগিয়ে চলে। নির্মাণ আর ভাঙনের অবিরত ইশারায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে জীবন। কেবলমাত্র নিজস্ব যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো মানুষের জীবনদর্শন নির্মিত হয় না, একইসঙ্গে অপরজনদের জীবন প্রবাহের সমান্তরাল পারম্পর্য সক্রিয় থাকে সর্বদাই। কোনো ব্যক্তিরই জীবনদর্শন একদেশদর্শী ও স্থিতিশীল হতে পারে না; বরং জীবনের বহমানতায় পরিবর্তনশীলতাকে অঙ্গীকার করে তা বহুলমাত্রায় উদ্ভাসিত। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয়-রাজনৈতিক আবহ, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি যুক্তি-আবেগ-চিন্তা-উপলব্ধি ইত্যাদির আত্তীকরণে একজন মানুষের জীবনদর্শন গড়ে ওঠে।

একজন সাহিত্যিকের জীবনদর্শন সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল অপরিসীম; কেননা তা শুধু বহুমাত্রিকই নয়, বরং নানান পরিসরে ব্যাপ্ত। কোনো সাহিত্যিকই জীবনদর্শনের অভিধায় নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বকে সামনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। লেখকের জীবনদর্শন সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে প্রথমেই একাধিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। সাহিত্যিকের জীবনদর্শন অর্থে শুধু কি সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ? নাকি, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন সাহিত্য-সংরূপ অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত সামগ্রিক জীবনদর্শন! স্রষ্টার জীবন বা ব্যক্তিগত জীবনদর্শন তার রচিত শিল্প-সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করে! আপন সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা কতখানি সম্পৃক্ত থাকেন বা উভয়ের মধ্যে বিযুক্তিই বা কতটা, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে। এ

প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের শৈল্পিক জিজ্ঞাসা—

> 'কিন্তু কার জীবনদর্শন ? লেখকের কি ? অথবা তা কি উপন্যাসের নরনারীগুলির পৃথক পৃথক জীবনদর্শন, অথবা তাদের জীবনদর্শনের ল.সা.গু. ?'[১]

কোনো সাহিত্যিকের জীবনদর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকগুলি মাত্রার প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে লেখকের জীবনযাপনের বিশ্লেষণে যেমন দিশা পাওয়া যেতে পারে, তেমনি জীবনদর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আবার, সাহিত্যিক সৃষ্ট বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর অনুপুঙ্খ পাঠে বিষয়-চরিত্র-আখ্যানের মধ্য দিয়ে বিম্বিত বহুলমাত্রার জীবনবোধ অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ সাহিত্যিকের জীবনদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা কখনোই একমাত্রিক হতে পারে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও পরিসরে তা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। স্থান-কালের নিরিখে লেখকের জীবন, লিখন, পাঠ্য সন্দর্ভ সবকিছুর একত্রীকরণে তার জীবনদর্শন সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে অন্যতম কালজয়ী বিশিষ্ট লেখক হলেন বিমল কর। সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপ অর্থাৎ উপন্যাস-নাটক-গদ্যে লেখনী সচল থাকলেও তাঁর লেখকসত্তা প্রধানত ছোট-বড় নানা গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পাঁচ দশকের বেশি সময়কাল জুড়ে বিমল কর দুই শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। বিভিন্ন গল্পের বয়ানে তিনি জীবনের বিভিন্ন দিক স্বকীয় দক্ষতায় উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমকালীন পারিপার্শিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গল্পের বিষয়বস্তুতে বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের চলমান জীবনের অজস্র ছবি নিপুণভাবে প্রতিফলিত। বিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন বিমল কর। প্রায় ছয় দশক ব্যাপী সাহিত্যচর্চায় তাঁর মন-মনন-চেতনার ধৃতিকেন্দ্র ছিল মানবজীবন। বিবর্তনী সময়ের অমোঘ টানাপোড়েনে মানবজীবনের অন্তর্জগত ও বহির্জগত প্রতি মুহূর্তে কীভাবে আলোড়িত হয়ে চলে, বিমল করের রচিত গল্পগুলি তারই শৈল্পিক ভাষ্যরূপ।

গল্পকার বিমল করের জীবন দর্শন সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ সৃজনশীল পাঠ একান্ত প্রয়োজন। এই পাঠপ্রতিক্রিয়া থেকে তাঁর

জীবনদর্শন সম্পর্কে আমরা অনেকাংশে ধারণা লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নানা সময়ে বিমল করের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা এবং বক্তব্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনদর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে ছোটগল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে নানা অনুষঙ্গে বিভিন্ন উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতাও অনিবার্য হয়ে উঠবে। বিমল কর স্বয়ং গল্প ও উপন্যাসের এই আন্তঃসম্পর্ককে স্বীকার করেন—

> 'ছোটগল্প লেখাই আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু গল্প লেখার সঙ্গে উপন্যাস লেখার একটা আত্মীয় সম্পর্ক রয়েছে।'[২]

ছোটগল্পকার বিমল করের 'জীবনদর্শন' সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক ও তাঁর লেখা উভয়ই আমাদের আলোচনায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকৃতিকে কেন্দ্র করে লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক সর্বদাই দ্বিবাচনিক। সার্থক পাঠজাত বিশ্লেষণই কোনো সাহিত্যকৃতি বা সাহিত্যিকের মূল ভাবনাকে যথার্থ উন্মোচিত করতে পারে। সমালোচকের দায়িত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে বিমল করের নিজস্ব উপলব্ধি—

> 'রিভিউয়ার যিনি থাকেন তার একটা insight থাকা একান্তই দরকার।'[৩]

বিমল করের সাহিত্যকৃতির স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন সম্পৃক্ত পাঠপ্রস্তুতি একান্ত অপরিহার্য। বিমল কর স্বয়ং সাহিত্যপাঠের প্রসঙ্গে পাঠকের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তবে পাঠক নিজের মর্জিমতো বা পূর্বনির্দিষ্ট কোনো ধারণা অবলম্বন করে পাঠকৃতির পর্যালোচনায় অগ্রসর হলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একান্ত প্রাসঙ্গিক—

> 'লেখক কী লিখেছেন বা কী লিখবার চেষ্টা করেছেন সেটাই বিবেচনার বিষয় হওয়া দরকার। তা ছাড়া তাঁর লেখার মধ্যে কী রয়েছে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। সত্যি কথা বলতে কী, সমালোচনা বলতে আমি বুঝি, একজন লেখক কী বলতে চেয়েছেন সেটাই খুঁজে বের করা।'[৪]

কোনো তাত্ত্বিক জীবনদর্শনকে পুঁজি করে বিমল কর সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন নি। নিজস্ব কোনো জীবনদর্শনকে বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করাও

তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কেবলমাত্র গাল্পিকতার চমকে পাঠককে আপাত মুগ্ধ করার সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্র জগতের লেখক হয়েও তাঁর লেখনী কখনো সাহিত্যবাজারের প্রচলিত ছকের গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাই জীবনের বহুমাত্রিকতা স্থান-কালের পারম্পর্যে তাঁর সাহিত্যে উদ্ভাসিত। কোনো বিশেষ মতাদর্শ বা পন্থার চক্রব্যূহে বিমল করের কথনবিশ্ব রুদ্ধ হয়ে পড়েনি।

মানবজীবন স্বয়ং এক বৈচিত্র্যময় মহাসন্দর্ভ। অন্তহীন রহস্যের অফুরান প্রাচুর্যে জীবন চির রহস্যময়। গল্পকার বিমল কর জীবনের অনেকার্থদ্যোতনাকেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠকৃতিতে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি চলিষ্ণু জীবনের অন্যতম সার্থক ভাষ্যকার। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, মানবিকতাই সব আখ্যানের মূল ভিত্তিভূমি। জীবনের চলমানতায় মানবিকতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মাত্রা তিনি গল্পের বয়ানে তুলে ধরেন। নিজের লেখার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

> 'আমার লেখায় আগাগোড়া একটা মানবিক বক্তব্য ছিল, তা হয়তো উত্তেজক বক্তব্য নয়। তবু আমার সাধ্যমত আমি কখনও মানুষের চিত্তের দীনতা, মনের বিকার, কখনও তার সহানুভূতিশীল হৃদয়কে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।'[৫]

বিংশ শতাব্দীর চার এর দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনশীল ধারায় মানুষের জীবনের কথকতার মধ্যেই এই 'মানবিক বক্তব্য' প্রকাশ পেয়েছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ভালোবাসা-যন্ত্রণা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, নিয়তি, মৃত্যুর অমোঘতা, প্রেম ইত্যাদির অন্তর্লীন পারস্পরিকতায় জীবন প্রবহমান। সেখানে অন্তর্জগত ও বহির্জগতের অবিরত টানাপোড়েন। ধাবমান সময়ের অভিঘাতে ও সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির জটিল বিন্যাসে মানুষের জীবন ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন। তাই মানুষের জীবন হল যেন এক অনন্ত যাত্রা। এই যাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য জরুরি নয়। ঔপনিষদিক ভাষ্যেই জীবনের সারসত্য রয়েছে: 'চরৈবেতি'– চলতে থাকো, যাত্রা করো।

চলমান জীবনের শাশ্বত স্বরূপ অনুধ্যানে মরমী কথাসাহিত্যিক বিমল করের দৃষ্টিভূমিতে বিম্বিত হয়েছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্যা। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

জুড়ে কালের বিবর্তনী ইশারায় ও অজস্র ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের বিচিত্র স্বরন্যাসকে তিনি গল্পের বয়ানে উপস্থাপিত করেছেন। একটি জীবনের মধ্যে যেমন অজস্র গল্প নিহিত থাকে, তেমনি একটি গল্পের প্রতিবেদনে একাধিক জীবনের মিশেল রয়ে যায়। অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও সমাজজিজ্ঞাসার দ্বিবাচনিকতায় জীবন ও গল্প উভয়ই ঋদ্ধ হয়ে চলে। জীবন সর্বদাই সমাজ ও সময় দ্বারা সম্পৃক্ত। তাই নিছক 'গল্প' বলা নয়, জীবন কীভাবে গল্পত্বের উৎস ও ধারক হয়ে ওঠে বিমল করের ছোটগল্প যেন তারই চিহ্নায়ক। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের প্রবহমানতায় বারে বারে এসেছে অজস্র বাঁকবদল, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনবীক্ষা ক্রমশ নতুন নতুন দিশায় পৌঁছাতে চেয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতায় অভ্যস্ত গল্পকার বিমল কর স্বীয় যাপন ও সমাজের বিবর্তমানতার মধ্য দিয়ে জীবনের সারাৎসার উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রায় সমসাময়িককালের সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন—

> 'লেখকরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না। ...মধ্যবিত্ত লেখক লেখে, মধ্যবিত্ত পাঠক পড়ে।'[৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবন প্রায়শই অনিবার্য সাহিত্যিক বয়ান হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

সমগ্র বিশ শতক জুড়ে ঘটনাবহুল সময়ের অভিঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্তজীবন বিচিত্র ভাঙন-গড়নের সম্মুখীন হয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে শুরু করে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনায়-মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, কালোবাজারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও সর্বোপরি খণ্ডিত স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে সমকালীন জীবন তীব্রভাবে আলোড়িত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বে-মননে-সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিকতার প্রক্ষেপ দেখা যায়। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বেকারিত্ব সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, চিনের

ভারত আক্রমণ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদলের ঘাতে-প্রতিঘাতে ঘটনাবহুল। সমাজ-সময়ের এই জটিল ব্যূহে মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি নিজস্ব অস্তিত্ব-সংকটে আক্রান্ত হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধে নিঃশব্দে ঘটে গেছে রূপান্তর। ফলে ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধও ভোগবাদী সমাজে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। চারিত্রিক দ্বি-চারিতা, সুবিধাবাদী মানসিকতার নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি শূন্যতা, একাকিত্বে, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় যন্ত্রণাদগ্ধ। জীবনের শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানে তারা দিগভ্রান্ত। তাই অস্তিত্বের সার সন্ধানে সত্তার পূর্ণতা উপলব্ধিই হয়ে ওঠে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত বাঙালির একমাত্র কাঙ্ক্ষনীয় বিষয়।

বিমল করের বিভিন্ন ছোটগল্পের পাঠকৃতি প্রায় পাঁচ দশক সময়ের ব্যাপ্তিতে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনায়নের ভাষ্যরূপ হয়ে উঠেছে। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি এই সময়প্রবাহে সম্পৃক্ত মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে উপলব্ধি করেছেন। এই সময়জাত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য—

> '...এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের অনেক যন্ত্রণা ও গ্লানির চেহারা দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া, সামাজিক ভাঙন, মনুষ্যচরিত্রের লোভ, লালসা, তার নৈতিক পতন, মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু।'[৭]

তবে, তিনি সমাজের অবক্ষয়ী প্রেক্ষাপটে জীবনের যন্ত্রণাঋদ্ধ রূপকে তুলে ধরলেও চূড়ান্তভাবে আশাহীন মনোভাব কখনোই ব্যক্ত করেন নি। বরং ভাঙনের চোরাস্রোতের মধ্যেও মানুষের প্রত্যয়ী আত্ম-অনুসন্ধানের উপর তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয় —

> '...আমি ঠিক decadence এর negative দিকটায় বিশ্বাস করি না। আমার চারপাশের জীবনের কৌতুকটাকে যেমন নিয়েছি তেমনি শুধুমাত্র মূল্যবোধের ভাঙন নয়– ভেতরে ভেতরে মূল্যবোধের অনিবার্যভাবে থেকে যাওয়াটাই আমি নিয়েছি।'[৮]

জীবনের অনিকেত আবহের মধ্যেও সদর্থক মনোভঙ্গি তথা আশাবাদী দার্শনিক মনোভাবই বিমল কর কথিত 'মানবিক বক্তব্য' এর মূল উৎসমুখ। জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় তিনি মানবিক সম্পর্কের নানা প্রেক্ষিতে মানবিকতার উপরই সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। তাই মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির জীবনায়নের প্রেক্ষিতেই বেঁচে থাকার মূলীভূত দর্শনকে তিনি অন্বেষণ করেছেন।

তাঁর কথাসাহিত্যে যে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনরূপ উঠে আসে, তারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একটু স্বতন্ত্র। কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির পাশাপাশি আসানসোল-বার্নপুরসহ কোলিয়ারি, রেল ইয়ার্ডে বসবাসকারী বাঙালিদের জীবনচিত্র বিমল কর গল্পে তুলে এনেছেন। আবার বাংলার বাইরে ধানবাদ-হাজারিবাগ অঞ্চলের বাঙালিরাও গল্পের চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। গ্রীকভাষায় একটি শব্দ হল Diaspora। দুটি গ্রীক শব্দ 'dia' ও 'speirein' এর সমন্বয়ে গঠিত। 'dia' অর্থে ভেতর থেকে এবং 'speirein' অর্থে ছড়িয়ে পড়া অর্থাৎ Diaspora হল এমন ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠী যাঁরা নিজেদের পূর্বজদের ভিটা থেকে বিচ্যুত বা উৎপাটিত কিংবা তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন। (তথ্যসূত্র : হাওয়া ৪৯; হেমন্ত ১৪১০, ডিসেম্বর, ২০০৩; পৃ. ৪) যে সকল বাঙালি বাংলা ছেড়ে বিহার-অধুনা ঝাড়খণ্ডের নিবাসী হয়েছিলেন তারা 'ইনার ডায়াসপোরিক' বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত; এদের জীবনযাত্রা কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তদের থেকে কিছুটা পৃথক। এই 'ইনার ডায়াসপোরিক' বাঙালিকে বিমল করের 'বরফসাহেবের মেয়ে', 'শূন্য', 'অপহরণ', 'বিচিত্র রামধনু', 'যক্ষ', 'কাঁটালতা' প্রভৃতি গল্পে দেখা যায়। ধানবাদের রেল-কোয়ার্টার্সের পটভূমিকায় 'বরফসাহেবের মেয়ে', ছোটনাগপুরের পারিপার্শ্বিকতায় 'কাঁটালতা', 'যক্ষ' গল্প রচিত হয়েছে। 'শূন্য' গল্পে মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি শহর, 'অতঃপর' গল্পে গিরিডি–ধানবাদ, 'অপহরণ' গল্পে হাজারিবাগ অঞ্চল উঠে এসেছে। তা সত্ত্বেও বিমল করের রচনা বা পাঠবস্তুকে ডায়াসপোরিক বলা যায় না বা তিনি ডায়াসপোরিক লেখক নন। কারণ, ডায়াসপোরিক পাঠবস্তুর গদ্যকাঠামো বা ভাষাশৈলী প্রথানুগত বাংলা ভাষা-গদ্যের থেকে পৃথক। সেক্ষেত্রে, ভাষার মধ্যে বহির্বাংলা অঞ্চলের ভাষার সংকরায়িত রূপ প্রতিফলিত হয়। বিমল করে'র সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

পারিবারিক সূত্রে বাংলার বাইরে হাজারিবাগের মতো মফঃস্বল এলাকায় বেড়ে ওঠায় তাঁর গল্পের অধিকাংশ প্রেক্ষাপটই শহর থেকে দূরে। শহুরে মধ্যবিত্তের কথা উঠে

এলেও কলকাতা শহরকেন্দ্রিক চরিত্র তেমন দেখা যায় না। পরবর্তীকালে কলকাতা শহরের বাসিন্দা হলেও তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলার বাইরের জনপদ ও শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গল্প রচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তব্য—

> 'আমি একটিও বাংলার গ্রাম্যচিত্র রচনা করতে পারিনি।
> আমি হয় শহুরে মানুষের কথা লিখেছি, না হয় বাংলার
> বাইরের কোনো জনপদের।'[৯]

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বান্দ্বিক অবস্থান, স্ববিরোধ, অনিশ্চয়তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈরাশ্য-প্রেম, বেঁচে থাকার সুতীব্র আকর্ষণ ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বর্ণনায় বিমল করের ছোটগল্পগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমকালীন যুগে কথাসাহিত্যিক অসীম রায়ের 'একদা ট্রেনে', 'রক্তের হাওয়া' গল্পে এবং কথাকার সুবোধ ঘোষে'র 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'সুন্দরম' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা, অবক্ষয়ী মূল্যবোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সমাজের জীবনে অনিশ্চয়তাবোধ, চেতনার টানাপোড়েন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ', 'দুঃশাসন' গল্প, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নদী ও নারী' ইত্যাদি গল্পে শৈল্পিকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আর্থ-সামাজিক সংকটে ব্যক্তির অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব রমাপদ চৌধুরী, কমলকুমার মজুমদারের লেখনীতেও রূপায়িত হয়েছে।

বিমল করের সৃষ্ট দুই শতাধিক ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির বহুমাত্রিক জীবনযাত্রা শৈল্পিক কুশলতায় উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠক-পাঠিকা তাঁর ছোটগল্পসমূহের পাঠকৃতিতে আত্মপরিচয়ের প্রতিবিম্বন দেখেছিল। একবিংশ শতকের পাঠক-পাঠিকাও এসকল গল্পপাঠে মুগ্ধতা অনুভব করবে। কেননা, তাঁর গল্পের মধ্যে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বাঙালির জটিল জীবনযন্ত্রণাই বর্ণিত হয়নি; বরং অবক্ষয়ী সময়ের অনিশ্চয়তাকে অতিক্রম করে জীবনে শাশ্বত সত্য উপলব্ধির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানেই গল্পকার বিমল করের সৃষ্ট গল্প সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে চিরন্তনতার দিকে যাত্রা করেছে।

জীবনের স্বরূপসত্য উপলব্ধিই হল গল্পকার বিমল করের জীবনদর্শনের সারভাষ্য। এই উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা মানুষের চেতন-অবচেতনে চিরন্তন। আর এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে অন্বেষণমুখর হতে প্রাণিত করে। এ হল পূর্ণতা লাভের জন্য আত্মঅন্বেষণ।

অন্তরে-বাইরে জুড়ে চলে এই অন্বেষণ। স্বল্পায়ু জীবনের যাপনক্রিয়ার মধ্যেই চলে জীবনকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এ যেন এক ঘটমান অন্বেষণ। রবীন্দ্রগানে শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'

দেবী ডেলফির মন্দিরে দার্শনিক সক্রেটিসের শ্রুতিতে ধ্বনিত হয়েছিল এক অমোঘ দৈববাণী : 'Know Thyself'। উপনিষদে বলা হয়েছে : 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ 'নিজেকে জানো'। নিজের জীবনের মধ্যেই নিজেকে স্পর্শ করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। ঔপনিষদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল এই অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শনে উল্লেখিত চতুর্বর্গ বা চার পুরুষার্থের চতুর্থটি হল 'মোক্ষ'। 'মোক্ষ' হল আত্মজ্ঞান; নিজের স্বরূপকে প্রকৃতভাবে চেনা ও জানা। 'মোক্ষ' হল চরম পুরুষার্থ। এই মোক্ষ লাভ হল প্রথমে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করা; তারপর আত্মস্বরূপের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মস্বরূপের একান্ত অনুভব। মানুষের এই আত্মঅন্বেষণ বিবর্তনী সময় ধারায় আজও সদা জায়মান।

ছোটগল্পকার বিমল করের সৃষ্ট বিভিন্ন আখ্যানে মানবজীবনে অস্তিত্বের অতলান্ত রহস্য উন্মোচনে অন্তহীন অন্বেষণের ভাষ্যই উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানুষ তীব্র নৈরাশ্য-হতাশায়, অবক্ষয়ী মূল্যবোধের ব্যূহে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় এক অনিকেত (rootless) অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। বহির্জগতের তীব্র টানাপোড়েনে ধ্বস্ত হয়ে চলেছিল মানুষের অন্তর্জগত। অস্তিত্বের মর্মমূলে ক্রমশ বেড়ে উঠছিল শূন্যতাবোধ। কেননা, সময়বদ্ধতার সঙ্গে অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদল ইত্যাদি ঘটনায় মধ্যবিত্ত বাঙালি ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে আক্রান্ত হচ্ছিল। প্রচণ্ড সংকটপূর্ণ অবস্থায় মানুষ হয়ে উঠেছিল অন্তর্মুখীন। অন্তর্বাস্তবতাই হয়ে উঠেছিল তার কাছে একমাত্র সত্য। দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দের ভাষায় বলা যায় : Subjectivity is truth. ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধিতেই (self-realisation) প্রতিফলিত হয় অস্তিত্বের যথার্থস্বরূপ। জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই স্বীয় অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষ তার সত্তা (Essence) গড়ে তোলে; কেননা কোনো পূর্বনির্দিষ্ট সত্তা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। তবে, সত্তা কখনোই অস্তিত্বের পূর্বে নয়; অস্তিত্বই মানুষের সত্তা বা অন্তর্নিহিত রূপ নির্ধারণ করে অর্থাৎ 'Existence pre-

cedes essence.' দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের মতে, মানুষ হল 'জগতে-স্থিত-এক-সত্তা' (Being-in-the-world)। জার্মান ভাষায়, একে তিনি 'Dasein' শব্দবন্ধে চিহ্নিত করেছেন। তাই একজন মানুষ নিজে নিজেই অস্তিত্বের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে অক্ষম। অস্তিত্বের পূর্ণতায় অপরকেও (other) প্রয়োজন। 'অপর' ও 'আত্ম'এর মধ্যে চলে নিরন্তর অন্তর্লগ্ন দ্বিরালাপ। অস্তিবাদী দার্শনিকগণ 'অপর'এর মধ্যে 'ব্যক্তি-আত্ম' বা 'অস্তিত্ব'এর বিলীন হয়ে যাওয়াকে বা মিশে যাওয়াকে সমর্থন করেন না। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রের মননঋদ্ধ বক্তব্য : 'অপরত্ব বজায় রেখেই অপর আমাতে রূপায়িত হোক।' ('Let the other become me without ceasing to be the other'—Sartre : 'Being And Nothingness') একজন মানুষ স্বীয় 'অস্তিত্ব' উপলব্ধি করে 'অপর' মানুষের তথা অন্যান্য জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। চিন্তাবিদ মিখাইল বাখতিনের ভাববিশ্বে একক অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের প্রাসঙ্গিকতাও অনিবার্যরূপে স্বীকৃত। তাঁর মতে, 'সত্তা' ও 'অপরতা'র সম্পর্ক পারস্পরিক এবং সমান্তরাল। ফলে এই বিশ্বে মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। এককভাবে কোনো মানুষই 'পূর্ণ' নয়। ব্যক্তিমাত্রই 'পূর্ণতা'র জন্য চির আকাঙ্ক্ষী। তবে পূর্ণতার জন্যই 'অস্তিত্ব'এর প্রয়োজন হয় 'অপর'কে। 'অপর' ও 'অস্তিত্ব' এর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কায়নেই মানুষ 'অপূর্ণ' থেকে 'পূর্ণতা'র দিকে এগিয়ে চলে। প্রত্যেক মানুষই চেতনে-অবচেতনে এই পূর্ণতার অন্বেষণে নিমগ্ন। পূর্ণতা প্রাপ্তিই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য।

জীবন জুড়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির একান্ত অন্বেষণই কথাকার বিমল করের জীবনদর্শনের প্রকৃত অভিজ্ঞান। মানবজীবনই সাহিত্যের মূল আধার। দর্শন পাঠ না করেও সাধারণ মানুষ একটা জীবনদর্শন অনুসরণ করে। বেদান্ত অনুসরণে বলা যায়, আমরা প্রত্যেকেই দর্শনের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই দার্শনিক সত্যের সংস্পর্শে রয়েছি, কিন্তু আমরা সেই সত্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকি না। জীবনযাপনের পথেই এই বেঁচে থাকার দর্শন মানুষ ক্রমশ অনুভব করতে সচেষ্ট হয়। বিমল করের গল্পসমূহের মধ্যে জীবনের সারাৎসার অন্বেষণের কথকতা ফুটে উঠেছে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গে। তাঁর রচিত 'অপহরণ' গল্পের অন্যতম চরিত্র উমাপ্রসাদ দত্ত সাংসারিক জীবনে ব্যর্থ হয়েও জীবনের স্বরূপ অনুভব করতে আগ্রহী। তবে কোনো আধ্যাত্মিক নির্ভরতায় নয়, রং-তুলির সাহচর্যে সীতাহরণ কাহিনির ছবি ক্রমান্বয়ে আঁকার মাধ্যমে তিনি আত্ম-

অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে উমাপ্রসাদ প্রশ্নমুখর হয়ে উঠেছিলেন। গল্পকথকের বয়ান লক্ষণীয়–

> 'উমামামার জীবনে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল।.....ওঁর সমস্ত
> প্রশ্নের মূল হয়ে শেষাবধি একটি প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল–
> মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি কী ?'[১০]

জীবনের এই সারবত্তা উপলব্ধির ব্যাকুলতা 'সুধাময়' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাময়ের চেতনায় তীব্র হয়ে উঠেছিল। চিরাচরিত সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সে আবদ্ধ থাকতে চায় নি। বাবা-মায়ের মৃত্যুতে তাকে গ্রাস করল মৃত্যুভয়। জীবনের প্রতি আসক্তি মৃত্যুবোধকে করে তুলল আরো অনিবার্য। জীবনকে ভালোবাসলেও সুধাময় জীবনের স্বরূপকে স্পর্শ করতে পারছিল না। মায়ের কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি—

> 'আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি, মা। আমার মনে
> শান্তি নেই। কী ভীষণ অতৃপ্তি যে! আমার সুখ কিসে, কেমন
> করে তা পাব, কে জানে।[১১]

সুধাময়ের ব্যক্তিসত্তার এই অতৃপ্তিবোধ বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্লগ্ন শূন্যতাবোধের চিহ্নায়ক। ক্রমশ এক বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল মানুষ। মূল্যবোধের ভাঙনে কৃত্রিমতার রেশ ছড়ায় মানবিক সম্পর্কসমূহে। মানুষের কাছে জীবন হয়ে ওঠে আরো জটিল, রহস্যময়। জীবনের জটিল বিন্যাসে ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ে মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-স্বাধীনতা প্রাপ্তি-দেশভাগের পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে মানবিক সম্পর্কের বহুরৈখিক উপস্থাপনা বিমল করের বিভিন্ন গল্পে লক্ষ করা যায়।

ঔপনিবেশিক চেতনাস্পৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত রূঢ় বাস্তবতার ক্রমান্বয়ী অভিঘাতে আত্মমগ্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। নিজের কাছে নিজেই হয়ে ওঠে অচেনা-অজানা। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময় নিজেকে ও নিজের অস্তিত্বকে জানার চেষ্টা করেছিল। আর 'ইঁদুর' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ মলিনা নিজের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে নিজেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তার মধ্যবিত্ত মানসিকতা স্বামী যতীনের বন্ধু বাসুদেবকে যেমন মেনে নিতে পারে না, তেমনি শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি স্বামীর কর্তব্যপালন দেখে সে ক্ষুণ্ণ হয়। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে তৈরি হয় স্বার্থপরতা। তার মন বাসুদেবকে কেন্দ্র করে হয়ে পড়ে

সন্দেহগ্রস্ত। বাইরের যাবতীয় নোংরা-মালিন্যের প্রতি মলিনার ঘৃণা। ঘরের কুশ্রীতার প্রতীক ইঁদুরকে ফাঁদ পেতে ধরতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর বন্ধু বাসুদেবের শারীরিক যন্ত্রণার দায় নিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মলিনা বুঝতে পারে —

'...বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে।
নোংরা মন। ইঁদুর কি!'[১২]

মানবিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক বিন্যাসের শৈল্পিক বয়ানে বিমল কর জীবনের শাশ্বত স্বরূপের প্রতি অনুসন্ধান করেছেন। অপরতার বলয়ে আত্ম হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। আইরিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট আধুনিক মানুষের আত্মানুসন্ধান সম্পর্কে এক ল্যাটিন প্রবচনের নিরিখে বলেছিলেন : 'I can not live with you or without you.' অর্থাৎ মানুষের 'হয়ে ওঠা' অর্থাৎ 'সত্তা' ও তার 'অপরতা'র সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। এই দ্বান্দ্বিকতাতেই মানবিক সম্পর্কগুলি বৈচিত্র্যবর্ণিল। এই প্রসঙ্গে এক একান্ত আলাপচারিতায় সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে বিমল কর বলেছিলেন : সব লেখকই একটা নিজস্ব theme নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে থাকেন, যতক্ষণ না theme টাকে তিনি ঠিক ধরতে পারছেন। নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, তিনিও (বিমল কর) একটা theme নিয়ে কাজ করেন, তা হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। (তথ্যসূত্র : 'আমার সময়', ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১৬)

মানুষের সব সম্পর্ক সবসময়ই কোনো বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত হয় না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মনোজগত। বিমল কর মানুষের মানসিক সম্পর্কের কাহিনিই বেশি উপস্থাপিত করেন। 'সম্পর্ক' গল্পে শৈলেশ ও অনিলার মধ্যেকার সম্পর্ক কোনো সামাজিকীকরণে বদ্ধ নয়। অবিবাহিত শৈলেশের মাসতুতো ভাই মনোরঞ্জনের বিধবা স্ত্রী হল অনিলা। একসঙ্গে থাকলেও দুজনেই বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে ব্যঙ্গ শ্লেষে জর্জরিত করে। কিন্তু একদিন হঠাৎ অনিলার অনুপস্থিতিতে শৈলেশ মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে অধীর হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত অনিলা ফিরে আসায় সুস্থির হলেও সে অনুভব করে এক অনামা সম্পর্কের রেশ —

'...মানুষের একটা সম্পর্ক বাদ দিলে অন্য যে হৃদয় সম্পর্ক
এবং অবলম্বনের সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে থাকে, অনিলার
সঙ্গে তার সেইরকম কোনো সম্পর্ক ছিল।'[১৩]

'গুণেন একা' গল্পে কেদার-ঈশানী-গুণেন তিনজনেই একে অপরের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ। গুণেন-ঈশানীর মধ্যে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকলেও তারা একসঙ্গে থাকত। কেদারের ঘরে আশ্রিত গুণেন সংসারের দায়িত্ব যেমন নেয়, তেমনি ঈশানীর সঙ্গেও মানসিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। 'হেমন্তের সাপ' গল্পেও এক শীতার্ত রাতে বিবাহিত ডালিমের হাতের ছোঁয়ায় গগন এক অজানা সম্পর্কের উষ্ণতা পেয়েছিল। 'কৃষ্ণকথা' গল্পে শিবানী-কৃষ্ণের পারস্পরিক নির্ভরতা, 'সুলক্ষণা' গল্পে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি গৌতমের প্রতি অলকার ভালোলাগা মানুষের চেতন-অবচেতনে অনালোকিত সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে।

১৯৫৩ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানবপুত্র' গল্পে বিমল কর মানবিকতাবোধের এক শাশ্বত ভাষ্যকে রূপ দিয়েছেন। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে অতিসাধারণ ব্যক্তি কেষ্ট সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কহীন গঙ্গামণির ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে চেষ্টা করে। শহুরে মানুষের নিদারুণ স্বার্থমগ্নতার বিপ্রতীপে রেস্টুরেন্টের কর্মচারী কেষ্ট কেবলমাত্র অন্তরের টানে মনুষ্যত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে সে গঙ্গামণিকে আকালের দিনে খাবারের যোগান দিয়েছে। খাবার পেয়ে গঙ্গামণির তৃপ্তি-আনন্দই তার মনে শান্তি এনে দিয়েছে। গঙ্গামণির সদ্যোজাত সন্তানের জন্য সে বেদনার্ত হয়েছে। দুটি পরস্পর অপরিচিত মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যে শরীরী কামনা, লোভ-লালসার ইঙ্গিত নেই। একমাত্র মনুষ্যত্ববোধই এখানে একমাত্র ভিত্তি। আলোচ্য গল্প প্রসঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য—

> 'এই শাশ্বত মানবিক সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা
> প্রথমাবধিই বিমল করের গল্পে ছিল, উত্তরকালেও থেকেছে।'[১৪]

এই চিরন্তন মানবিক বোধ 'আঙুরলতা' গল্পের পাঠবস্তুতেও লক্ষণীয়। নন্দ সংসারের স্বপ্ন দেখিয়ে আঙুরলতাকে বিয়ে করে, পরে স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে তাকে ছেড়ে চলে যায়। অসহায় আঙুরলতাকে দেহব্যবসার পথ বেছে নিতে হয়। সেই নন্দ যখন মরণাপন্ন হয়ে ফিরে আসে; তখন তীব্র ঘৃণা থাকলেও আঙুরলতা রোগ সারানোর জন্য হাসপাতাল-ডাক্তারের ব্যবস্থা করে, সাধ্যমত সেবাও করে। দাম্পত্য সম্পর্কের দায় না থাকলেও নন্দের মৃত্যুর পর একজন সাধ্বী স্ত্রীর মতো দাহকার্য সুসম্পন্ন করার জন্য সে পাটের বাহারি শাড়িটা বিক্রি করে দেয় এবং অর্থসংগ্রহের জন্য অসুস্থ হয়েও অপছন্দের

প্রভুলালের কাছে নিজের শরীর নিলামে চড়াতে বাধ্য হয়। নন্দের দেহ দাহ করার পর বুকভরা যন্ত্রণায় আঙুরলতা ভেঙে পড়ে। একজন বাজারি বেশ্যা হয়েও তার মধ্যে মানবিক সহানুভূতি ভালোবাসার এক অদ্ভুত রূপ দেখা যায়। বেশ্যাপল্লির বাসিন্দা হয়েও অসাধারণ এক মানুষ রূপে প্রতীয়মান হয় আঙুরলতা। অন্ধকার জগতের মধ্যে বাস করলেও অন্ধকারের মালিন্য তার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং নন্দের চিতার আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণার মধ্যেও সে হয়ে উঠেছে উপলব্ধিমুখর —

> 'আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় কষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালোবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।'[১৫]

দাম্পত্য সম্পর্কের একাধিক বয়ান বিমল করের ছোটগল্পে পাওয়া যায়। যুগজাত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছে বারে বারে। দাম্পত্যজীবনে দুজন মানুষ একে অপরের কাছে সবচেয়ে বেশি উন্মোচিত হয়। 'বাঘ' গল্পে দেখা যায়, বাঘ শিকারের ভাবনায় মত্ত অচিন্ত্য স্ত্রী শচীর মনের অতলকে ছুঁতে ব্যর্থ। এই ব্যর্থ দাম্পত্য শচীর জীবনকে অর্থহীন, শূন্যতাময় করে দেয়। মাতৃত্বে পূর্ণতা লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় মনোবীণার ব্যাকুলতা দাম্পত্যজীবনকে প্রভাবিত করেছে 'আয়োজন' গল্পে। দৈব ওষুধের সহায়তায় সহবাসে লিপ্ত হতে গিয়ে স্বামী পশুপতির কাছে তীব্র ভৎর্সিত হয়েছে মনোবীণা। স্ত্রীর অব্যক্ত আশা বুঝতে পারেনি পশুপতি। পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝিতে মনোবীণা মা হতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে। আর পশুপতি মনে করেছে স্ত্রীর কাছে তাঁর গুরুত্ব নেই। ফলে সে স্ত্রীকে ভুল বুঝে কষ্ট পেয়েছে—

> 'পশুপতির মনে হচ্ছিল, মনোবীণা তাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে না, সে তার স্ত্রীর কাছে যথেষ্ট নয়, পশুপতি তার এই অকৃত্রিম প্রেম, অনুরাগ ও আসক্তি নিয়েও স্ত্রীকে পরিপূর্ণ সুখী করতে পারল না। পারবে না।'[১৬]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাসহীনতার ক্লেদাক্ত রূপ ফুটে উঠেছে 'জানোয়ার' গল্পে। কোম্পানির বড়কর্তা সুধীবন্ধু সোম জীবনে রোজগার, চাকরিতে প্রমোশন ব্যতীত কিছু ভাবতে পারে না। তার কাছে সংসার-স্ত্রী-প্রেম ইত্যাদির বিশেষ মূল্য নেই। ব্যর্থ দাম্পত্যের কষ্টে, নিঃসঙ্গতা-হতাশায় স্ত্রী অতসী স্বামীকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি—

> 'সোম মানুষ নয়–স্বামী তো কিছুতেই নয়–পশু, পশুর চেয়েও অধম একটা জীব।...তার ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত তাকে অত্যন্ত জঘন্য একটা মানুষ বলে ভাবে–ঘৃণা করে–ভীষণ ঘৃণা। কিন্তু মজা এই, সোম এমন মানুষ যে ঘৃণা বোঝে না। বোঝে না তার স্ত্রী তাকে কতটা ইতর, কুৎসিত ভাবে, কী পরিমাণ ঘৃণা করে।'[১৭]

কিন্তু অতসী স্বামীর নির্লিপ্ততার প্রতি তীব্র প্রতিশোধ নেয়। বাংলোর রক্ষী বাহাদুরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। সে সোমকে বিপন্নতার সম্মুখীন করে দেয়। একইরকমভাবে স্বামীর অবহেলা-ঘৃণাকে আঘাত করেছিল সুনীতিমালা বা সুনু। 'সুনীতিমালার উপাখ্যান' গল্পে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া সুনুকে অপমানে-অবজ্ঞায় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল গগন। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক-মানসিক সম্পর্কে তৈরি হয়ে যায় দুস্তর ব্যবধান। দৈহিক প্রতিবন্ধকতাকেই গুরুত্ব দিয়ে গগন স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দেয়। একাকিত্বের গ্রাসে পড়ে যায় সুনু। অনৈতিক জেনেও নিবারণের সঙ্গে ইচ্ছা করেই সম্পর্কে জড়িয়ে সে সন্তানসম্ভাবা হয়ে পড়ে। নিজেকে ক্ষয় করেও স্বামীকে প্রত্যাঘাত করে মনের জ্বালা মেটায় সুনীতিমালা। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সংশয়-কৃত্রিমতা-সন্দেহ প্রভৃতির প্রতিফলন দেখা যায় 'পাশাপাশি', 'অ্যালবাম', 'অভিনয় নয়', 'নীরজা' প্রভৃতি গল্পে। শুধুমাত্র রিরংসার টানে 'হাত' গল্পে প্রতিবন্ধী স্বামী হীরালালকে দূরে সরিয়ে চাঁপা নীতিহীনভাবে বলাইয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও যেন এক অন্বেষণ সুপ্ত থাকে। নারী-পুরুষ উভয়েই সাংসারিক জীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেবে ভ্রান্ত হয়ে যায় অনেকসময়। 'উপাখ্যান' গল্পে ধ্রুব অভাবের থেকে মুক্তি পেতে অসুস্থ স্ত্রী অমিয়াকে ছেড়ে পালিয়েছিল। স্বার্থপরের মতো তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। কিন্তু সম্পর্কের টান এড়ানো যায় নি। হৃদয়ের এই মালিন্যকে সে মুছে দিতে পারেনি। নতুন সংসার শুরু করেও মৃত্যুশয্যায়

শায়িত অমিয়ার কাছে ধ্রুব পৌঁছে যায়। গোপনে গোপনে পাপবোধে ক্ষতবিক্ষত হয় ধ্রুব। আবার, আশ্চর্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হেমাঙ্গের সঙ্গে জীবন কাটাতে ভয় পায় 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পের পায়রা। 'হাত' গল্পের চাঁপার মতোই তার কাছে প্রবৃত্তিই প্রাধান্য পেয়েছিল। নানা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেও কোথাও সে থিতু হতে পারে নি, শেষে স্বামী হেমাঙ্গের কাছেই ফিরে আসতে হয়। সুখের মরীচিকার পিছনে ছুটলেও তার প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্যই রয়ে যায়। কিন্তু হেমাঙ্গ এই প্রত্যাবর্তন মেনে নিতে পারেনি। নতুনভাবে সংসার শুরুর অজুহাতে আবার স্বামী হিসেবে অভিনয় করার গ্লানি সে সহ্য করতে অপারগ। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। বিপদে পড়ে পায়রা ফিরে এলেও সে জানে স্ত্রীর কাছে সে অচেনাই থাকবে। গল্পের প্রতিবেদনে তারই বয়ান—

'সংসারের এইটেই মজার। সব জিনিসই গায়ের চামড়া নয়।
দেখা যায় না, দেখা যায় না। হেমাঙ্গকেই কি দেখা যায় ?'[১৮]

বিমল করের সমকালীন যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের চোরাস্রোত সুবোধ ঘোষ 'জতুগৃহ' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও পরস্পরের প্রতি শতদল ও মাধুরী এক হার্দিক টান অনুভব করে। রমাপদ চৌধুরীর রচিত 'নোনাজল' গল্পে ঋণা সন্দেহ ও অধিকারবোধের অনাবশ্যক প্রয়োগে স্বামী অনীশের সঙ্গে দুরত্ব তৈরি করে ফেলে। ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের জীবন। অবৈধ সম্পর্কের টানাপোড়েনে দাম্পত্যজীবনের সংকটের ছবি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'ধস' গল্পে প্রতিফলিত। এই গল্পে স্ত্রী কিরণলেখার প্রতি পঙ্গু ভবতোষের ভালোবাসা শেষপর্যন্ত তাদের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও ভেতরে ভেতরে কৃত্রিমতার রেশ রয়েই গেছে। তবে দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ থেকে বিমল করের গল্পভাষ্য স্বতন্ত্র। তিনি এই সম্পর্কের উন্মোচনের ক্ষেত্রে চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

শুধুমাত্র ভাঙন বা অপ্রাপ্তি নয়, দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের পরম প্রাপ্তির প্রশান্তিও বিমল করের গল্পে পাঠক-পাঠিকা পেয়ে যান। সাঁওতাল পরগনায় নির্জনতায় বেড়াতে এসে শুভেন-মীনা এক আশ্চর্য মধুর সম্পর্কের মুখোমুখি হয়। বৃদ্ধ বয়সে এসেও বরদাকান্ত প্রায় অন্ধ সুবর্ণের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেন। সুবর্ণ-বরদা দুজনেই একে অপরকে অবলম্বন করে জীবনে সুখ-শান্তি পেয়েছেন। বৃদ্ধ দম্পতির এই

ভালোবাসা শুভেন-মীনাকে দাম্পত্যের নতুন স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। 'এরা ওরা' গল্পে নিঃসঙ্গ দম্পতি হেমদা-সুশীলার মধ্যেও নিবিড় সম্পর্কের বুনন দেখা যায়। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে নিঃসীম টান তাদের মধ্যে এখনও জায়মান। পুত্র-কন্যার অবহেলায় তারা তেমন শূন্যতা বোধ করেন না, কেননা পারস্পরিক সাহচর্যে এই শূন্যতা মুছে গেছে। বৃদ্ধ হেমদা স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই জীবনের চলমানতার সৌন্দর্যকে লাভ করেছেন। এই তৃপ্তির প্রকাশ হেমদার ভাবনায়—

> 'হেমদা কোনো জবাব দিলেন না। স্ত্রীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।...স্ত্রীর এই স্পর্শ থেকে তিনি অনুভব করছেন সুশীলা কত গোপনে কত গভীরে তাঁকে ইহজীবনের সমস্ত মমতা, নিবিড়তা, সান্নিধ্য, ভালবাসা নিবেদন করছে এবং বিষণ্ণতাও। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা স্ত্রীর শুকনো, খসখসে, কোঁচকানো, রক্তস্বল্প হাত ধরে হেমদা দাঁড়িয়ে থাকলেন অশেষ মমতায় ও তৃপ্তির সঙ্গে।'[১৯]

'তুচ্ছ' গল্পেও বরদা জীবনের সম্পূর্ণতা স্ত্রী কাননের সংস্পর্শে অনুভব করেছেন। মায়া-মমতা-সহানুভূতি-ভালোবাসায় দুজন মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অচ্ছেদ্য মানসিক বন্ধনের অনন্য অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বরদা'র একান্ত ভাবনায়—

> 'আপনজনের মধ্যেও একজন কেমন করে যেন আরও আপন হয়ে ওঠে, নিজের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে নেয়, মিশে যায় সর্বাঙ্গে। কখনও কখনও মনে হয়, অন্য মানুষটির নিশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে থেকে উঠে এল।'[২০]

স্বীয় অস্তিত্বের পূর্ণতালাভে মানবজীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষের অস্তিত্বগত শূন্যতা, নিঃসঙ্গতাকে বাড়িয়ে তোলে। বহির্জগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনাক্রম যেমন মূল্যবোধে প্রভাব ফেলে, তেমনি অন্তর্লোকের আলোড়নে নৈতিকতা জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কথাকার বিমল করে'র বিভিন্ন গল্পের বয়ানে বিশ্বযুদ্ধকালীন ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাঙালি জীবনে মূল্যবোধের ভাঙন-গড়ন উন্মোচিত হয়েছে। 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে ঈর্ষা-প্রতিহিংসার এক নগ্ন বাস্তব রূপ গল্পকার পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ছোটোবেলার

বান্ধবী খ্রিস্টান জিনির প্রতি তিন বন্ধু সর্বদা নিরুদ্ধ কামনা পোষণ করেছে। সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা কেউ জিনিকে বিয়ে করতে পারেনি। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভণ্ডামিটুকু সম্বল করে একটা অসহায় মেয়েকে তিনজনেই বারে বারে বিপদে ঠেলে দিয়েছে। নিরুদ্ধ বাসনা তৃপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা তার নামে দেহব্যবসার কুৎসা রটিয়েছে, আপনজনকে চক্রান্ত করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নন্দকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে করে নন্দ-জিনির সম্পর্ক ভাঙতে পাঁচু-তিনু-বীরু সচেষ্ট হয়েছে। তাদের গোপন কামনার নোংরা বহিঃপ্রকাশকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছে জিনি। পাঁচুর বক্তব্য—

> '...জিনির বাঁকা হাসি ধারালো ছুরির মতো আমাদের অতি গোপন মনোবাসনাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য আলোয় উন্মুক্ত করে দিল।'[২১]

মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে স্বার্থমগ্নতা, অবিশ্বাস, আত্মপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'দুই বোন' গল্পে পাত্রী দেখাকে কেন্দ্র করে দুই বোন অনু-নিরু পরস্পরকে অবিশ্বাস করে। দুজনেই হয়ে ওঠে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই মেয়ে একে অপরকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে যোগ্য পাত্রী বলে প্রতিপন্ন করতে ব্যাকুল। শৈল অসহায়ভাবে দেখে তার দুই মেয়ে কীভাবে সংকীর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে একে অপরকে তীব্র আঘাত করে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। লটারি টিকিট বিক্রেতা নবীনের জীবিকা নিয়ে তার আপনজনদের শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি 'স্বপ্নের নবীন' গল্পের কাহিনিতে বিবৃত হয়েছে। মধ্যবিত্তসুলভ কৃত্রিম মর্যাদাবোধকে আঁকড়ে ধরে দাদা শচীন ভাইকে তীব্র বিদ্রুপ করে। ফেরিওয়ালার কাজকে সে মনে করে মর্যাদাহানিকর। প্রেমিকা কাবেরীও নবীনের এই পেশায় গ্লানিবোধ করেছে। বিশ শতকে ছয়-সাতের দশকে বেকারিত্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে নবীন বেঁচে থাকার চেষ্টা করলেও বাড়ির মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু সে কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জীবনকে জানার চেষ্টা করেছে। তার এই উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা অন্যের কাছে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নবীনের অ-মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার আভাস দেখে বাবা-দাদা-প্রেমিকার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু পরিমলও ব্যঙ্গ করেছে—

> 'মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে–শালা একটা প্রেস্টিজ আছে না! ফ্যামিলি প্রেস্টিজ, সোস্যাল প্রেস্টিজ, লেখাপড়া শেখার অহঙ্কার...তুই সত্যিই ডোবালি, নবীন।'[২২]

'সংশয়' গল্পের বয়ানে মধ্যবিত্ত জীবনের স্ববিরোধ-ভণ্ডামি স্ফুরিত হয়েছে। চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর সুধাকান্ত আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বীয় চরিত্রের দ্বিচারিতাকে ধরতে পারে। অফিসের ফেয়ারওয়েলে অন্যান্য মানুষের মুখে নিজের প্রশংসা ও উপহার সামগ্রী তিনি পেয়েছেন। কিন্তু অন্তর্লীনে রয়ে গেছে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, আত্ম-অনুশোচনা। পূর্ণতার ভানের আড়ালে অপূর্ণতার হাহাকারই বেশি প্রকট। আত্ম-প্রবঞ্চক সুধাকান্ত নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেছেন। তাঁর অশ্রুত স্বগতোক্তি—

> 'আমি, যে মানুষটি আপনাদের মালাটালা নিলাম,...আর
> যাকে আপনারা কর্মযোগী, সৎ, উদারটুদার কত কি বললেন—
> সেই মানুষটি আর আমি এক নই।...আমি অন্য মানুষ,
> আমার সম্বন্ধে আপনারা প্রায় কিছুই জানেন না।'[২৩]

মানুষ যেমন অনেক সময় অপর মানুষকে জানতে পারে না, তেমনি নিজেও যে কোনো সময় নিজের কাছে অচেনা হয়ে পড়ে। হঠাৎ নিজের স্বরূপের পরিচয় পেয়ে নিজেই বিপন্নতা অনুভব করে। আত্ম-স্বরূপের এই বিপন্নতা বিমল করের 'আত্মজা' গল্পে প্রতিবিম্বিত। মেয়ে পুতুল হিমাংশুর জীবনকে আশা-ভালোবাসা-আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। বাবা-মেয়ে একে অপরের সবচেয়ে আপনজন। হিমাংশু'র নিজস্ব সত্তার সঙ্গে যেন পুতুল প্রায় অভিন্ন। কিন্তু এই অপত্য স্নেহের সম্পর্ক হিমাংশুর স্ত্রী যূথিকার কাছে সুখকর নয়। যূথিকার সন্দেহপ্রবণ মন পারিপার্শ্বিক ইন্ধনে হিমাংশু-পুতুলের সম্পর্ককে অবৈধ যৌনতার বহিঃপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করে। স্ত্রীর নিষ্ঠুর অভিযোগে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় হিমাংশু। স্ত্রীর সন্দেহ পিতৃত্বের স্নেহকে অজস্র উত্তরহীন প্রশ্নের সম্মুখীন করে। বিপন্নতায় আক্রান্ত হয় সত্তা। নিজের অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কামনার ইশারা যূথিকার তীক্ষ্ণ অভিযোগে হিমাংশুর কাছে হঠাৎ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। অপত্য স্নেহ ও অবদমিত যৌনতার টানাপোড়েনের মুখোমুখি হয়ে সে ক্রমশ আত্ম-বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তার বিভ্রান্ত মন অন্বেষণে আকুল হয়—

> 'পা পা করে এগিয়ে যায় ও; জল নয়, আয়নার দিকে।
> আয়নায় স্পষ্ট, খুব স্পষ্টভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে তার।...তীক্ষ্ণ
> চোখে তাকিয়ে হিমাংশু সেই ছবির মধ্যে কাকে বুঝি খুঁজছে।
> গালে হাত তুলতেই ছবির মধ্যে থেকে সেই ছায়াকৃতি

লোকটাও নড়ে ওঠে—হিমাংশু সে নয়, কারণ হিমাংশু
পিতা, কিন্তু ও অন্য লোক, যে পিতা নয়, পশু। যার দৃষ্টি
সুস্থ মানুষের নয়, জানোয়ারের।'[২৪]

এই আত্মপরিচয়ের সংকট হিমাংশুকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে। নিঃসীম শূন্যতার মুখোমুখি হয় সে। মধ্যবিত্ত হিমাংশু এই অসহনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি, ফলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে সে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্তি খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে।

অস্তিত্বের অন্তর্লগ্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে ওঠে শূন্যতাবোধ। এই শূন্যতা জীবনকে করে তোলে নিঃসঙ্গ। 'পিঙ্গলার প্রেম' গল্পে থিয়েটারের অভিনেত্রী কিরণশশী প্রবৃত্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হয়েছে। প্রবৃত্তির মোহে একদিন স্বামী-ছেলেকে ফেলে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে সংসার ত্যাগ করেছিল। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে যখন কিরণশশী মৃগাঙ্কের প্রেমে বিভোর হতে চলেছে, এখন ভুবন চৌধুরীর নাটকের কাহিনি তার মনে মাতৃত্ব ও প্রেমিকার বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বকে জাগিয়ে দেয়। অসহনীয় শূন্যতাবোধে কিরণশশী মানসিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই অস্তিত্বগ্রাসী নিঃসঙ্গতায় বিদ্ধ হয়েছিল 'শূন্য' গল্পের নিশীথ। প্রেম-স্নেহ-দাম্পত্য-সততার উপর সে বিশ্বাস রেখেছিল। কিন্তু প্রেমিকা জয়ন্তী, স্ত্রী লতিকার সংসার ত্যাগ, ছেলের মৃত্যু তাকে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করে দেয়। মৈত্রসাহেবের কাছে গিয়ে সে ভয়ংকর অতীতের থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু নিশীথ উপলব্ধি করে জীবনে শূন্যতাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। বরং শূন্যতাবোধই মানুষের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রাণিত করে। মৈত্রসাহেবের মননঋদ্ধ ভাবনায় শূন্যতা-পূর্ণতার দ্বান্দ্বিক বিন্যাস প্রতিফলিত—

'আফটার অল শূন্য থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। এখন
এই দুই করে নয় পর্যন্ত এসেছি। আমরা শুধু আশা করব—
পরের শূন্য আসুক,—কিন্তু শুরুর শূন্য নয়, শেষের শূন্য।'[২৫]

'মোহনা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোহনা শরীর-মনের সাহচর্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভেবেছিল। প্রেম প্রবৃত্তির টানে দীপক, প্রমথ নানা মানুষের সঙ্গে সে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যা সহজলভ্য ও প্রাপণীয় ভেবেছিল মোহনা, তা পেল না। জীবনকে পরিপূর্ণ করে পাবে বলে তার আত্মবিশ্বাস ছিল, তবুও জীবন তাকে শূন্য হাতেই ফিরিয়ে

দিয়েছে। ফলে তার স্বীকারোক্তি জুড়ে কেবল আর্তনাদই ধ্বনিত—

> 'অথচ আমি এতদিন আমার সম্পদ খোলামকুচির মতন ছড়িয়েছি। কোনো গা করিনি। এখন মনে হচ্ছে, হায়, হায়, আমার হাতের ধন এ জীবন, কত কমে এল, এখন আমি কি করি!'[২৬]

মানবজীবনের অনির্ণেয় অসংগতি যেমন তাকে অস্তিত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, তেমনি এমন কিছু অসংগতি চলার পথে থাকে যা জীবনের প্রসন্ন-শুভ্র রূপকেও উন্মোচিত করে। গল্পকার বিমল কর শৈল্পিক দক্ষতায় বিভিন্ন সরস গল্পে বা হাস্যরসাত্মক গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির অসামঞ্জস্য জীবনচর্যা ও চারিত্রিক অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। 'প্রেমশশী' গল্পে প্রেমকিশোর অনেক স্বপ্ন নিয়েই সাইকোলজিস্ট শশীকলাকে বিয়ে করে। স্ত্রী শশী জীবিকা ও জীবনকে এক করে দেওয়ায় দাম্পত্য জীবনে আসে অস্বাভাবিকতা। স্বামীর শরীরের খুঁত খুঁজতে ব্যস্ত শশীকলা একদিন প্রেমকিশোরের কাছে নিজের ফলস দাঁত নিয়ে ধরা পড়ে যায়। হাস্যের অন্তরালে দাম্পত্য সম্পর্কের কৃত্রিমতাকে বুঝিয়ে দেন লেখক। 'কালিদাস ও কেমিস্ট্রি' গল্পে কেমিস্ট্রির অধ্যাপিকা ফুলরেণু সোম পেশাগত জগতে একনিষ্ঠ হতে গিয়ে হৃদয়জগতের প্রতি উদাসীন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ককে তার কেবল নিছক আবেগ বলে মনে হয়। সংস্কৃত অধ্যাপক স্বর্ণকমলের 'কুমারসম্ভব' পাঠদানকে সে অবজ্ঞা করে। বিচিত্র সব ঘটনার শেষে ফুলরেণু একদিন উপলব্ধি করে প্রেম বিহনে জীবন অপূর্ণ। শেষে প্রেমের স্পর্শে সে স্বর্ণকমলের আপনজন হয়ে ওঠে। বিমল কর 'ফণীমনসা', 'রসাতল', 'হৃদয়বিনিময়' ইত্যাদি সরস গল্পে কখনোই স্থূল হাস্য পরিবেশন করেননি, বরং humour এর আপাত স্নিগ্ধতায় মানবজীবনে দাম্পত্য-প্রেম-বন্ধুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কের টানাপোড়েনকে বিবৃত করেছেন।

মানবজীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ শৈশব-কৈশোরে জীবন সম্পর্কে কৌতূহল-উৎসাহ-অজানাকে জানার আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতির স্ফুরণ দেখা যায়। শিশুদের বা ছোটোদের জন্য রচিত বিমল করের একাধিক গল্পে তারই বর্ণনা দেখি। প্রকৃতির রহস্যময়তা 'একদিন এক গোলাপ বাগানে' গল্পের মধ্যে দেখানো হয়েছে। ছোটোদের মনে অলৌকিকতা সম্পর্কে যে বিস্ময় রয়েছে, তারই প্রতিফলন 'সেই আশ্চর্য লোকটি' গল্পে। ভৌতিক

অস্তিত্ব বা রহস্য আমাদের জীবন বিশেষত ছোটোদের মনকে আলোড়িত করে। 'ভূতের খোঁজে', 'একটি ভূতুড়ে ঘড়ি' প্রভৃতি গল্পে এই অশরীরীর আলোড়ন ফুটে উঠেছে। অসংজ্ঞেয়, আধিভৌতিক শক্তির প্রতি মানুষের অপার কৌতূহল। গল্পকার একাধিক গল্পে জীবনের অজানা-অচেনাকে অনুভব করার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন, যা শিশু-কিশোরদের সঙ্গে সঙ্গে বড়োদেরও আলোড়িত করে।

সীমিত কালের পরিসরে যাপিত জীবনে মানুষ আপন অস্তিত্বে প্রায়শই অসম্পূর্ণতা অনুভব করে। ক্রমশ বেড়ে যায় আস্তিত্বিক উৎকণ্ঠা। জীবনের অনন্ত প্রবাহের প্রেক্ষিতে নিজেকে অসহায় মনে হয়। চেতনায় অদৃশ্যে জন্ম নেয় এক অজ্ঞেয় শক্তি যা নিয়তি রূপে চিহ্নায়িত। মানবজীবনে নিয়তির এই অমোঘ প্রভাব বিমল করের নানা গল্পে বিন্যস্ত। কাহিনির নিপুণ অন্তর্বয়নে তিনি নিয়তির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে মানুষের অসহায়তাকে দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ দশকে জীবনচর্যায় বাঙালি বারে বারে সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মখণ্ডিত হয়েছে। সত্তাগত শূন্যতাবোধের কার্যকারণ সন্ধানের ব্যর্থতায় জীবন তার কাছে হয়ে উঠেছে নিয়তিতাড়িত। এক অপরিহার্য সত্তারূপে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় নিয়তি; যেন Destiny is character। বিমল করও নিয়তির এই সার্বিক প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। জীবনে নিয়তির উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> 'মোটকথা, মানুষের এটাই হল জীবন। নিয়তি। তার অস্তিত্বের মূল কথা। ...ভাগ্যক্রমে অথবা দুর্ভাগ্যবশত যখন তুমি এসে গিয়েছ পৃথিবীতে, এই নিয়তির হাত থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই। তোমাকে হয় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে, নয়ত মরতে হবে।'[২৭]

গ্রিক নিয়তিবাদে অদৃশ্য এক অলৌকিক প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির হাতে মানুষ অসহায় এক জীব। গ্রীক নিয়তি হল রহস্যাচ্ছন্ন বা inscrutable। এখানে জীবন Nemesis বা ভয়ংকর দৈবশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট। আবার শেক্সপিয়ারের ধারণায় 'Men at sometime are masters of their fates' (Julius Caesar)। মানুষের নিজের কার্যসমূহই তার নিয়তি হয়ে ওঠে। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে জীবন এগিয়ে চলে। শেক্সপিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি বা গ্রিক নিয়তিবাদকে ভাষ্যরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে বিমল কর গল্প রচনা করেন নি। বিভিন্ন গল্পে জীবনের সারসত্তার বহুমাত্রিকতাকে উপস্থাপিত

করতে গিয়ে নিয়তির প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত নিয়তির স্বরূপে যেমন শেক্সপিয়ার ও গ্রিক নিয়তিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি ভারতীয় দর্শন তথা হিন্দু দর্শনের অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয়তার রেশও দেখা যায়। বিমল করের গল্পবিশ্বে নিয়তি ব্যক্তি-অস্তিত্বের 'অপর' রূপে প্রতিভাত, যা সত্তাকে প্রতি পলে স্পন্দিত করে। জীবনের সঙ্গে নিয়তির সম্পর্ক প্রতি মুহূর্তে হয়ে ওঠে দ্বিবাচনিক। 'অপহরণ' গল্পে উমাপ্রসাদ সীতাহরণের বিষয়ে একের পর এক ছবি আঁকার অন্তরালে জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে অনুসন্ধানী। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেছে। বাবা-মা'র মৃত্যুতে তিনি আঘাত পেয়েছেন। লোভ-কাম-প্রেম দিয়ে উমাপ্রসাদ জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু যন্ত্রণা-ব্যর্থতা-দুঃখে জীবন জুড়ে রইল কেবল অপ্রাপ্তি। শেষে মৃত্যুর আঘাতে তার আত্ম-অনুসন্ধানও সম্পূর্ণতা পায়নি। জীবনের এই ব্যর্থ হয়ে যাওয়াকে উমাপ্রসাদ নিয়তিস্পৃষ্ট বলে মনে করেছেন। তার ভাবনায় —

> 'আমি স্বীকার করে নিয়েছি, মানুষের নিয়তিই এই, শেষ
> অবধি কোথাও না কোথাও পরাজয়।'[২৮]

নিয়তির কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিল 'অশ্বত্থ' গল্পের রেণু। সঙ্গহীন রেণুর কাছে বাড়ির অশ্বত্থ গাছ ছিল বড়ই আপন। সন্তান হওয়ার পর এই অশ্বত্থ গাছই হয়ে যায় তার কাছে বড় শত্রু। রেণুর মনে ভয় ছিল যে, তার সন্তানের ঘাতক হবে এই গাছ। সন্তানকে বাঁচাতে বাড়ি বদল করা হয়। কিন্তু সন্তানকে বাঁচানো যায় নি। নিয়তির অদৃশ্য তাড়নে রেণুর সন্তান মারা যায়। মৃত্যুরূপী নিয়তি 'নিষাদ' গল্পে জলকুকেও হাতছানি দেয়। আদরের ছাগলের মৃত্যুতে জলকু রেললাইনকে দায়ী ভেবে নিষ্ফল আক্রোশে সেদিকে পাথর ছুঁড়ে যায় অবিরাম। গল্পের কথক ও পিসি তরুলতার সম্পর্ক কিশোর জলকুর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পোষ্য ছাগলশিশু মানিককে খুঁজতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। ফলে কথকের হাতে মানিকের হত্যা হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘাতক রয়ে যায় অচেনা। মৃত্যু এই ঘাতকের বেশে জলকু'র চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সে রেললাইনের দিকে বারবার ছুটে যায়। মানিকের মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে গিয়ে সে খেয়াল করতে পারে না যে, মৃত্যু সংগোপনে তাকে শিকার করতে চলেছে। গল্পের পরিণতিতে জলকু'র মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু জলকু বুঝতেই পারল না প্রকৃত ঘাতক কে! মানিকের খোঁজে গিয়ে এক গোপনীয় সম্পর্কের হঠাৎ সাক্ষী হওয়াই তার একমাত্র

অপরাধ। নিজের অনিচ্ছাকৃত ভুলই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিয়তিই এখানে ঘাতক, যে জলকু'র সামান্য অসতর্কতায় তাকে নিশানা করেছে। 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' গল্পের কথক জানেন অশোকার অন্তিম পরিণতি তাকে দেখতেই হবে। নিয়তির বিধানে তা নির্দেশিত। যদিও এই নিয়তির স্বরূপ বা পরিচয় তার কাছে অজানা। জীবনে সাফল্য-ব্যর্থতা-সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা কোনো কিছুই মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। নিয়তির এই রহস্যাবৃত উপস্থিতিতেই মানুষ প্রাণচঞ্চল। গল্পের কথকের শাশ্বত অনুভব—

'এক পা আগে পরে নিয়েই তো নিয়তির খেলা।'[২৯]

নিয়তির রূপ নিয়েই মৃত্যু মানবজীবনের প্রতিক্ষণেই আপাত আড়ালে উপস্থিত থাকে। জীবনে মৃত্যু অনিবার্য সত্য। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু আমাদের শিকার করতে পারে। আবার, নিঃসঙ্গতা-যন্ত্রণা-শূন্যতাবোধে পীড়িত মানুষ মৃত্যুকেই মুক্তিলাভের উপায় বলে মনে করে। এই মৃত্যু মানবজীবনের এক চিরন্তন রহস্য। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিপ্রতীপ সম্পর্ক। মৃত্যু আমাদের সত্তার সাররূপের মধ্যেই আত্তীকৃত। আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণ-অপূর্ণতার দ্বান্দ্বিকতায় মৃত্যুবোধ সর্বদাই ক্রিয়াশীল। মৃত্যু যেন আমাদের ব্যক্তিসত্তার চারদিকে ঘিরে থাকা এক অপরসত্তার বলয়।

মৃত্যুচেতনার বহুমাত্রিক রূপের প্রকাশ ছোটগল্পকার বিমল করের সৃষ্ট একাধিক গল্পের ভাষ্যে-কাহিনিতে দেখা যায়। বিশ শতকে চারের দশকে লেখা 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্প থেকেই মৃত্যুভাবনার শৈল্পিক বয়ান তিনি পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। পাঠকৃতির মধ্যে মৃত্যু কখনো বিষয়, কখনো চরিত্র হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধ-অবক্ষয়ী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বিপন্নতা-অনিশ্চয়তা থেকে মানুষের মুক্তির চিহ্নায়ক হয়ে উঠেছিল মৃত্যু। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গের অদ্ভুত অসুখ তার দাম্পত্য জীবনকে ধ্বস্ত করেছিল। একাকিত্বে-বিচ্ছিন্নতায় যখন সে জীবনে নিজের মতো করে বাঁচতে শুরু করে, তখন হঠাৎ স্ত্রী পায়রা সন্তানসহ ফিরে আসে। অন্তঃসারশূন্যতায় পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কে পুনরায় আবদ্ধ হতে চায়নি হেমাঙ্গ। আপনজনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পেতে সে মৃত্যুকেই বেছে নেয়। 'আত্মজা' গল্পের পাঠকৃতিতে মৃত্যুপ্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বাবা-মেয়ের অপত্য স্নেহের সম্পর্ককে অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে যূথিকার কুটিল সন্দেহ। স্ত্রীর নিষ্ঠুর অভিযোগে

বিপন্নতায় আক্রান্ত হয় হিমাংশু। মেয়ে পুতুলের প্রতি তার স্নেহকে অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ বলে যখন একান্ত আপনজনই চিহ্নিত করে, তখন তার পিতৃসত্তা অন্তর্দ্বন্দ্বে যন্ত্রণাকাতর হয়ে ওঠে। মেয়ের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে হিমাংশু। পুতুলও হয়ত ভবিষ্যতে মায়ের মতোই এক সংকীর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, এ সন্দেহ তৈরি হয় তার মনে। সীমাহীন শূন্যতার অনুভবে হিমাংশু আত্মহত্যা করে। হিমাংশু বা হেমাঙ্গ মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে 'উদ্বেগ' গল্পে মৃত্যুভয় শিশিরকে অনুসরণ করেছে। শীতের শেষে শহরে এক অজানা অসুখের প্রাদুর্ভাবে মড়ক দেখা যায়। চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই ভয়ংকর রোগ, একের পর এক মানুষের মৃত্যু শিশিরকে বিচলিত করে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করে সে—

> 'যে কোনো লোক যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। মড়কটা
> সিঁদ কাঠি হাতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসতর্ক হলে
> অবধারিত মৃত্যু।'[৩০]

'অপেক্ষা' গল্পে মৃত্যুর অনিবার্য আগমনকে উপলব্ধি করতে পারে শিবতোষ। তবে মৃত্যুর রূপ বা স্বরূপ তার কাছে অজ্ঞাত। এই অজ্ঞেয় মৃত্যুভয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে সুধাময়। 'সুধাময়' গল্পে বাবার মৃত্যু ও মায়ের অসুখ সুধাময়কে তাড়িত করেছে বারে বারে। ক্রমশ অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে সে বোঝে যে, মৃত্যু জীবনপ্রবাহের মধ্যেই একটি নিয়ম। মৃত্যুর এই নিয়মবদ্ধতাকে তিনি মান্যতা দিলেও তার মধ্যে আবদ্ধ হতে চান নি। মৃত্যু তার কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে জীবনকে আরো নিবিড়ভাবে আপন করতে পেরেছে সুধাময়। মৃত্যু জীবনকে আরো মহতী করে তোলে। এই মৃত্যুও আসলে এক যাত্রা। জীবনের অনন্ত যাত্রার মধ্যেই মৃত্যুর নিজস্ব যাত্রা। এই যাত্রার প্রসঙ্গ এসেছে 'জননী' গল্পে। পাঁচ ভাইবোনের পারস্পরিক কথালাপে বোঝা যায় যে, জীবনের সম্পূর্ণতা তাদের মায়ের আয়ত্তে ছিল না। অপূর্ণতা নিয়েই মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তবে, মৃত্যুর এই যাত্রায় তারা মায়ের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করেছে। ভাইবোনদের কেউ ভালোবাসা, কেউ স্বার্থত্যাগ-সাহস দিয়ে মাকে পূর্ণ রূপে দেখতে চেয়েছে। মৃত্যুর পথেই জীবন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। জীবন ও মৃত্যুর এই অন্তহীন দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ফুটে উঠেছে 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে। এখানে মৃত্যু স্বয়ং একটি চরিত্র। 'মহারাজ' রূপী মৃত্যুর সঙ্গে নন্দকিশোরের একান্ত আলাপে জীবনের বিচিত্রময়তা পরিস্ফুট হয়েছে।

মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বিরালাপ চলেছে। নন্দকিশোর মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে; কিন্তু জানে যে, মৃত্যু তাকে আঘাত করবেই। তবুও মৃত্যুকে স্বল্প সময়ের জন্য ঠেকিয়ে জীবনের সামগ্রিকতাকে পুনরায় তিনি দেখতে চেয়েছেন। মৃত্যুর সঙ্গে অভিসারে গিয়ে নন্দকিশোর জীবনের সারসত্যকে অন্বেষণ করেছে। তাঁর আত্মগত ভাবনা—

> 'আমি তোমার হাত থেকে পিছলে যাবার চেষ্টা করছি, তুমি
> আমায় ধরবার চেষ্টা করছ। জীবন আর মৃত্যুর এই খেলাটা
> আমাকে খেলতেই হবে।'[৩১]

মৃত্যুবোধের ইশারায় মানুষের জীবন যখন আলোড়িত হয়, তখনই সে আশ্রয় নেয় ঈশ্বরভাবনায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় মানব অস্তিত্ব সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু অসম্পূর্ণতার বেদনা অস্তিত্বের অন্তর্লগ্নে ক্রিয়াশীল। পূর্ণতার যাত্রায় মানুষের চেতনায় গড়ে ওঠে আস্তিক্যবোধ, যা ঈশ্বর নামক এক শক্তির সৃষ্টি করে। তাই জীবনের আত্মমুখী অনুসন্ধানে ঈশ্বরভাবনার চির স্পন্দন লক্ষণীয়। উপনিষদের দর্শনে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধির করার কথা বলা হয়েছে। আত্মস্বরূপের উপলব্ধির মাধ্যমে ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে হয়। এই ব্রহ্মস্বরূপই 'ঈশ্বর' রূপে মানুষের কাছে প্রতিভাত। সনাতন ভারতীয় দর্শনে এই ঈশ্বরই হল পরমাত্মা। উপনিষদের ভাবনায় ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট নন, তিনি বিশ্বের ধারক ও নিয়ন্ত্রিক মহাশক্তি।

জার্মান চিন্তাবিদ ফয়্যারবাখ (Feuerback) বলেছেন, নিজের অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করার তাগিদেই মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। অস্তিবাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ-এর মতে, ঈশ্বরই প্রত্যেক মানুষের সারসত্তা (essence) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রত্যেক মানুষের জীবন ধর্মীয়ভাবে পরিকল্পিত।

আমাদের জীবনবোধে ঈশ্বরের উপস্থিতি বিমল করের নানা গল্পে বর্ণিত হয়েছে। তবে, এই ঈশ্বর কোনো বিশেষ সামাজিক ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। জীবনের স্বরূপ অন্বেষণে ঈশ্বরভাবনার গুরুত্ব স্বীকার করলেও তিনি চিরাচরিত ধার্মিকতা সমর্থন করেন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—

> '...একটি লেখা লেখবার কথা ভাবতাম যার সঙ্গে বিশেষ
> কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের যোগ থাকবে না, অথচ জীবনের অর্থ

> অনুসন্ধানের জন্য ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠতে চাইবে নায়ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে—তার ধর্মবোধ–যা নিজস্ব ভাবনাচিন্তা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে—তা ধর্ম-বিরোধিতারই নামান্তর।'[৩২]

তাই খ্রিস্টধর্ম, হিন্দু ধর্মের নানান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। 'মানবপুত্র' গল্পে কেষ্ট ধ্বংসদীর্ণ সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করেও বিশ্বাস করে বেলসেবুরের সাত অনুচর অর্থাৎ সাত অপদেবতার সব চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসে ঋদ্ধ হয়ে সে ভাবে, সমস্ত পাপ-গ্লানি নিশ্চিহ্ন হয়ে এই পৃথিবীতে আবার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। তাই গঙ্গামণির সন্তান তার কাছে ঈশ্বর প্রেরিত মানবপুত্র রূপে পরিগণিত হয়। 'খড়কুটো' উপন্যাসে ভ্রমর মৃত্যু অবধারিত জেনেও ঈশ্বরের উপর সবথেকে বেশি বিশ্বাস রেখেছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিরিখেই অমলের কাছে সে অস্তিত্বময় হয়ে উঠেছে বলে তাঁর ধারণা। যীশুর কাছ থেকেই ভ্রমর ভালোবাসার মন্ত্র শিখেছিল। মৃত্যুর অবিরত ইশারায় বাইবেলে বিশ্বাসই ছিল তার একমাত্র সম্পদ।

'আঙুরলতা' গল্পে দেহব্যবসায়ী আঙুরলতাও ধর্মের পাপ-পুণ্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছে। হিন্দু নারী হয়ে সে স্বামী নন্দের সৎকারের ব্যবস্থা করে। এই নন্দ তাকে জীবনে আঘাত দিয়েছিল, যার জন্য তাকে পাপের পথে নামতে হয়। সেই স্বামীর জন্য দেহে বিক্রি করে সে টাকা রোজগার করেছে এবং সেই টাকায় স্বামীর সৎকার শেষে পুণ্য অর্জনের কথা ভেবেছে। ধর্মের তত্ত্বভাষ্য আঙুরলতার কাছে অজানা। কিন্তু মানবিক ধর্মের পূর্ণ প্রকাশে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসেই ঈশ্বরের মূল স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে সুরেশ্বরের ভাবনায় ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষাণীয় ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত—

> 'আমার ঈশ্বর মানুষের বোধবুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞেয় অনুভবহীন কল্পনা নয়।...মানুষের হৃদয় যা অনুভব করে আমার ঈশ্বরকে আমি তাই দিয়ে কল্পনা করেছি। মানুষ যা হতে চায়, অথচ পারে না, যা হতে পারলে সে ভাবে সে সার্থক হত, পূর্ণ হত, আমার ঈশ্বর তার বেশি নয়।'[৩৩]

বিমল করের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতাবোধের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচেতনার

উদ্ভাসন। একদেশদর্শী ধর্মীয় তাত্ত্বিকতা এই ঈশ্বরভাবনার ভিত্তি নয়। দার্শনিক ফ্রিডরিখ নীট্‌শে ঘোষণা করেছিলেন : God is dead. ঈশ্বরের মৃত্যুঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মের নির্দেশিত নিরঙ্কুশ নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় ছিল এক 'Super-man' ('Ubermensch') এর আদর্শ যা মানব জাতির ভবিষ্যত। ভারতীয় সাংখ্য দর্শনে কপিল মুনিও জগৎ-সংসার নিয়ন্ত্রক কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নি, তবে জড় প্রকৃতির সমান্তরাল চৈতন্যময় এক পুরুষকে স্বীকার করেন। বিমল করের 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোর সমান্তরাল সত্তা রূপেই ঈশ্বরকে মনে করেন—

> 'শোনো মহারাজ, আমি মনে করি, আমার এই জীবনে
> তোমাদের ঈশ্বর আর আমি পরস্পরের অচেনা যাত্রী হয়ে
> এক রেল কামরায় বসে আছি।'[৩৪]

দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ মানব-অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের কথা বলেছিলেন : সাংবেদনিক বা অনুভূতির স্তর (aesthetic stage), নৈতিক স্তর (ethical stage) এবং ধর্মীয় স্তর (religious stage)। তৃতীয় অর্থাৎ ধর্মীয় স্তরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ আত্ম-উন্মোচনের মহত্তর উপলব্ধি লাভ করে। সাংবেদনিক স্তরে মানুষ সুখ-দুঃখের অনুভবে ব্যস্ত থাকে। নৈতিক স্তরে সে আত্মমূল্যায়ন করে জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চায় আর ধর্মীয় স্তরে এসে তার উপলব্ধি হয়। 'গগনের অসুখ' গল্পের বয়ানে তারই ভাষ্য—

> 'গগন বুঝতে পারল না, কেন হৃদয়ে এত কষ্ট থাকে, এত
> অভাব ? বেদনা কেন অধিক, সুখ কম ? পৃথিবীতে জলভাগ
> বেশির মতন পর্যাপ্ত দুঃখ এবং অপর্যাপ্ত সুখ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি
> করেছিলেন!'[৩৫]

বিমল করের সৃষ্ট গল্পের পাঠ্যবস্তুতে ঈশ্বরচেতনার প্রকাশ দেখা যায়। তবে, জীবনে চলার পথে এই ঐশীশক্তিকে মানুষ বিচিত্র রূপে উপলব্ধি করেছে। গল্পকার ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অন্তর্লীন সম্পর্ককে মান্যতা দিলেও মানুষকে ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত সত্তা রূপে উপস্থাপন করেন নি। বিমল করে'র জীবনবোধে মানুষ ও ঈশ্বরের এই সহাবস্থান 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে নির্মলার বক্তব্যে উন্মোচিত—

> 'ভগবানে আমার ভক্তি আছে। মানুষেও আমার বিশ্বাস
> আছে।'[৩৬]

অপূর্ণতার থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের শাশ্বত স্বরূপ অন্বেষণই ছোটগল্পকার বিমল করের একান্ত জীবনদর্শনের সারভাষ্য। আত্ম-অস্তিত্বে জীবনের সম্পূর্ণতা অনুভব করা যায় না। আত্ম-অস্তিত্ব ও অপর-অস্তিত্বের নিরন্তর দ্বিরালাপে মানুষ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে; তবে সব যাত্রাই লক্ষ্যে গিয়ে উত্তরিত হতে পারে না। এক অনিশ্চয়তা ভেতরে ভেতরে রয়ে যায়। তবুও মানুষ এই যাত্রায় ক্লান্তহীন পথিক। বিমল কর আপন সৃষ্ট বিভিন্ন সাহিত্যিক সন্দর্ভে মানুষের আত্ম-অন্বেষণের আখ্যান বিবৃত করেছেন। শুধুমাত্র গাল্পিকতার আকর্ষণে তিনি ছোটগল্প রচনা করেননি। বরং, গল্পের নানা অনুষঙ্গে নিজের জীবনভাবনাকে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য—

> 'শুধু গল্পের জন্য গল্প তো আমি লিখতে চাই না। যদি তেমন কোনও কথা আমার নতুনভাবে না জোটে, অকারণ মামুলী গল্প লিখে কী লাভ ?'[৩৭]

বিমল করের গল্পে জায়মান জীবনদর্শন সম্পর্কে বুঝতে হলে যথার্থ পাঠসচেতন হতে হয়। বিভিন্ন গল্পে জীবনের বহুমাত্রিক রূপের নিপুণ বিন্যাসের মধ্যেই তিনি নিজস্ব জীবনদর্শনের পরাসন্দর্ভ (meta-discourse) পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। সমালোচকের মন্তব্যেও তারই আভাস—

> 'বিমল কর-এর গল্পমালাকে বুঝতে নয়, পাঠ করতে গেলে একটা পূর্ব-প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। নির্মম সত্যকে এত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা হয়েছে যে–গল্প না জীবনদর্শন, জীবনদর্শন না গল্প, তার ভেদরেখা বুঝে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।'[৩৮]

মানুষ জীবন সম্পর্কে কেন অন্বেষণমুখর হয়! এ এক উত্তরহীন প্রশ্ন। অনন্ত জীবনপ্রবাহের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবন খণ্ডকালের সীমায় একটি মুহূর্তমাত্র। বস্তুজগত ও চেতনাজগতের সমন্বয়ে এই বিশ্বজগত আমাদের কাছে আজও অভিজ্ঞতার বাইরে, রহস্যাবৃত। 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পে শিবতোষের কথায় তারই ইঙ্গিত—

> '...এ জগৎ বড় বিচিত্র, কত কী অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। ...আমাদের ধারণায় যা অদ্ভুত তার বাইরেও অনেক অদ্ভুত হল এ জগৎ।'[৩৯]

জীবনপৃক্ত জগতের রহস্য উন্মোচনে সদা আগ্রহী মানুষ। কিন্তু কোনো মানুষই পূর্ণ নয়। তাই পূর্ণতার প্রতি তার জীবনের এক স্বভাবসুলভ প্রবণতা রয়েছে। দেরিদার মতে, ক্রমাগত বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই অস্তিত্ব আপাত-পূর্ণতা থেকে প্রকৃত-পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। সার্ত্র-এর মতে, মানুষ হল 'স্ব-হেতু-সত্তা' (Being-for-itself)। তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা-অভাববোধ বিদ্যমান। মানুষ যখন এই অপূর্ণতা উপলব্ধি করে তখন তার মধ্যে এক 'শূন্যতাবোধ' বা সার্ত্র কথিত 'Nothingness' চেতনা গড়ে ওঠে। স্ব-হেতু-সত্তা হওয়ায় মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার সম্ভাবনা নিহিত থাকে। সার্ত্র বলেছেন : "Nothingness haunts being"। মানুষের পূর্ণতার জন্য চিরন্তন অন্বেষণই বিমল করের গল্পবিশ্বে লক্ষণীয়। 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

> '...জগৎ যতই অসম্পূর্ণ হোক, কোন কোন মানুষ এই অসম্পূর্ণ জগতের মধ্যেই একটা পূর্ণতার ধ্যান করে। সমস্ত ধর্মেই এই পূর্ণতার ধ্যান করা হয়। হিন্দুধর্মেও। এই ধ্যানের রূপ সর্বত্র এক হতে পারে না। অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই নিজ নিজ ধারণা মতন সে ধ্যান করে থাকেন।'[৪০]

জীবনে পূর্ণতালাভের যাত্রায় অন্যতম পাথেয় হল ভালোবাসা। হৃদয়ে স্থিত প্রেমচেতনার উদ্দীপনে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ সর্বদাই উদ্বেল। কেননা, প্রেমই বেঁচে থাকার আনন্দের মূল বিভাব। প্রেমের মূল স্বরূপ আনন্দ। এই আনন্দই মানব অস্তিত্বকে অনুরণিত করে সর্বদাই। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের আত্ম অন্বেষণে প্রেম ও আনন্দের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় অনুভবে তার মন্তব্য :

> 'সত্তার পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমি–আমার এই প্রেম সেই পূর্ণতাকে অনুভব করা-আনন্দ তাকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে।'[৪১]

হৈমন্তীর ভালোবাসা পেয়ে সুধাময় জীবনে বাঁচার আনন্দ খুঁজেছিল। কিন্তু সব প্রেমে মানুষ সার্থকতা লাভ করে না। প্রেমও বিচিত্র মাত্রায় জীবনকে স্পন্দিত করে। প্রেমের উপলব্ধি বা প্রেমের চিরন্তনতা সকল মানুষ অনুভব করতে পারে না। গল্পকার প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোরের বয়ানে

ফুটিয়ে তুলেছেন–

> '...ভালবাসা দু রকমের। একটা দু-চার বছরের। সিজিন্যাল ভালবাসা; সময়ে ফুটলো তারপর শুকিয়ে ঝরে গেল। অন্য ভালবাসা বড় দীর্ঘ। বড় দুঃখের। জগতে কোনো বড় ভালবাসার গল্প সুখ দিয়ে শেষ হয়নি।'[৪২]

প্রেমের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে কামনা-বাসনা-মুগ্ধতা। ভালোবাসার সম্পর্কে শরীর গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কেবলমাত্র দেহচেতনাতেই তা বদ্ধ নয়। 'কাঁটালতা' গল্পে কামনা-বাসনা সন্তপ্ত প্রেমের পরিচয় পাই। মেয়ের প্রেমিকের প্রতি মায়ের মোহগ্রস্ততা সংসারে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। স্বামীর হাতে খুন হয়ে যায় স্ত্রী। প্রেমের আড়ালে প্রবৃত্তির তাড়না সন্তানদের কাছে মা'কে ঘৃণ্য করে তোলে। দেহ যেখানে মনের থেকে অধিক গুরুত্ব পায় প্রেম সেখানে খণ্ডিত। 'কাচঘর' গল্পে হিরণ ও শোভনার প্রেম ভেঙে গিয়েছিল দেহজ আকর্ষণের প্রেক্ষিতে। হাসপাতালের নার্স শোভনার রূপ-গুণ-হৃদয় সবই ছিল। কেবল মা হওয়ার সক্ষমতা ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল—

> 'ভালবাসা অন্য জিনিস–স্থূল শারীরিক বিকাশ কখনই তার অন্তরায় হতে পারে না! পারে না!'[৪৩]

কিন্তু তার এই বিশ্বাস ভেঙে যায়। হিরণ তার এই অক্ষমতা জেনে তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। জীবনের সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাদের প্রেমের সম্পর্ক। 'সুনীতিমালার উপাখ্যান'এ সুনীতির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাদের দাম্পত্যপ্রেমকে বিদ্ধ করে। শরীর, না মন—প্রেমের আধার কোনটা তা বুঝে উঠতে পারে না সে। মায়ের কাছে তার আকুল জিজ্ঞাসা—

> 'মা-ভালবাসা কোথায় থাকে বলতে পার ?'[৪৪]

'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে ইন্দুমাসি নীলমণিকে ভালোবাসার তিনটি ঘরের সন্ধান দিয়েছিল। এই তিনটি ঘরের পরিক্রমণেই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করে মানুষ। এ সম্বন্ধে ইন্দ্রের ব্যাখ্যা—

> 'আমি বলি, দেহ আর রূপ যদি ভালবাসার প্রথম ঘরটি হয় তবে তার অন্য দুটি ঘর হল–মন আর হৃদয়। প্রথমটি দৃশ্য, অন্য দুটি দেখা যায় না। সেখানেই তো তোমার প্রাণটিকে পাবে।'[৪৫]

'পালকের পা' গল্পে মৃণাল, 'পিঙ্গলার প্রেম' গল্পে কিরণশশী প্রেমের এই ঘরগুলি খুঁজে পায় নি। 'নীরজা' গল্পে প্রবৃত্তি-মোহকেই নীরজা ভালোবাসা বলে ভুল করেছিল। ফলে সে সংসার ত্যাগ করে। অনুশোচনায় দগ্ধ হলেও ভালোবাসাকে তার আর ফিরে পাওয়া হয়নি। সে বুঝতে পারেনি, প্রবৃত্তির টান নয়; প্রেমই জীবনের চালিকাশক্তি। এই গল্পের কথকের ভাষ্যে তারই প্রতিফলন দেখি—

> 'জগতে প্রেমহীনতা একভাগ স্থলের ন্যায়, তার অধিকার
> অধিক হলে এই জীবনপ্রবাহ এতদূর বয়ে আসত না।'[৪৬]

'খড়কুটো' উপন্যাসে ভ্রমর নিজের জীবনে ভালোবাসার এই সার্বিকতাকে অনুভব করেছিল। ভ্রমরের ভাবনা—

> 'ভালবাসাই মানুষকে বাঁচায়।...ভালোবাসাই আরোগ্য: বিশ্বাস
> এবং ভালবাসাই সব।'[৪৭]

তবে প্রেম বা ভালোবাসাকে সবাই জীবনে আপন করতে পারে না। অনেকে ভালোবাসাকে চিনতেও পারে না। জীবনে চলার পথেই ভালোবাসাকে অর্জন করতে হয়। প্রকৃত ভালোবাসা মানুষকে পূর্ণ করে তোলে। 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে ভালোবাসার সাররূপ ইন্দ্রের বাচনে ধরা পড়েছে—

> 'ভালবাসাটিও যে মন্থন করে তুলতে হয় গো! তার অনেক
> দুঃখ যন্ত্রণা মনোকষ্ট।...ভগবান যখন আমাদের হৃদয়টি
> দিলেন শেষ পর্যন্ত, তখন বলে দিয়েছিলেন দেহের কোথাও
> তোমার স্থান নেই গো, তুমি শূন্য। তবু তুমিই হলে দেহ আর
> আত্মার মধ্যে একমাত্র পূর্ণ।'[৪৮]

'উদ্ভিদ' গল্পে বটানির লেকচারার উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কলেজের ছাত্রী রাজপরিবারের মেয়ে চন্দ্রাকে পড়াতে পড়াতে সে তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু সে প্রেম ব্যক্ত করতে পারেনি। প্রেমের ব্যর্থতার আরেক চিত্র দেখা যায় 'বকুলগন্ধ' গল্পে। অঞ্জনার প্রেম এখানে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। শ্যামলকে ভালবাসলেও প্রতারণার ফাঁদে প্রেমের মৃত্যু ঘটেছে। স্বামী সুধাংশু ও প্রেমিক শ্যামলের টানাপোড়েনে অঞ্জনার ভালোবাসা অচরিতার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পেও শিবানীর ব্যক্তিসত্তা প্রেমের জন্য ব্যাকুল ছিল। শিশির, অনাদি ও কমলেন্দুর কাছে সে

ভালোবাসা নিয়েই গিয়েছিল। পরিবর্তে তিনজনেই চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের নিরিখে তাকে ত্যাগ করেছে। শিবানীর মৃত্যুর পর তিন বন্ধুই বুঝেছিল যে, প্রেমিকা শিবানীকে আঘাত করলেও তার প্রেমময়তাকে নিঃশেষ করতে তারা অপারগ। শিবানীর প্রেম ভুবনের সঙ্গে দাম্পত্যে তৃপ্ত হয়েছিল। আবার 'সুখ' গল্পে বৃদ্ধ দম্পতি বরদাকান্ত-সুবর্ণ, 'এরা ওরা' গল্পে হেমদা-সুশীলা জীবনের অনেকগুলি বৎসর অতিক্রম করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখেন প্রেমের প্রেরণায়। প্রেম তাদের জীবনে আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে। আনন্দ ও ভালোবাসার সম্পর্ক সুধাময়ের ভাবনায় চিরকালীন—

> 'যা আমার আনন্দ, যাতে আমি আনন্দিত, অন্তত যার
> আবির্ভাবে আমার আনন্দ জেগে ওঠে—আমি তাকেই
> ভালোবাসা বলি।'[৪৯]

ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে আনন্দের উদ্ভাসন, তা মানুষকে পূর্ণতার দিকে যাত্রায় অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রকৃত প্রেম মানুষকে আনন্দের জগতে মুক্তি দেয়। আর আনন্দই মানুষের শূন্যতাবোধ-অপূর্ণতার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে পূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাণিত করে। 'সুধাময়' গল্পে শরীরী প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠে সুধাময় ভালোবাসার স্পর্শে পূর্ণতার সন্ধানী হয়ে উঠেছে।

এই আনন্দের স্ফুরণেই সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ। বিমল করের জীবনদর্শনে প্রেমের সমান্তরালে আনন্দ ও সৌন্দর্যের আবাহন লক্ষণীয়। আত্মকথায় তাঁর এই মনোভঙ্গি ফুটে উঠেছে—

> 'এই জগৎ যে সর্বাংশে মধুর তা নয়। প্রকৃতিও সর্বত্র সদয়
> নয়; মানুষের ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। বর্বরতা, নৃশংসতা,
> রক্তক্ষয়, শঙ্কা, শোকদুঃখ—সবই আছে এখানে। তবু, যে-
> অলস মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ছোট ছোট সুন্দর দৃশ্যগুলি দেখে
> জগতের–আকাশ পাখি ফলমূল শুধু নয়, আমাদের জীবনের
> দৈনন্দিনের সুন্দর ছবিগুলি–সেগুলিই তো আমাদের সম্বল।
> বেঁচে থাকার আনন্দ।'[৫০]

সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, আলো-অন্ধকারের দ্বান্দ্বিকতা অতিক্রমণে বেঁচে থাকার আনন্দই জীবনকে আমাদের কাছে সুন্দর করে। 'উপাখ্যানমালা' গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে

বিমল কর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনে পাপবোধ থাকবেই। জীবনের অন্ধকার দিক থেকেই এই পাপ উৎসারিত। কিন্তু পাপই শেষ কথা নয়। অন্ধকারের গভীর থেকে ফুটে উঠে আলো। মানুষ সর্বদাই আলোকসন্ধানী। পুণ্যের পথেই সে আলোর দিকে এগিয়ে চলে। 'সত্যদাস' গল্পে রঘুনাথ ও তার স্ত্রী যমুনা সত্যদাসের সম্পদ চুরি করেছিল। ধনী হয়ে উঠলেও তারা জীবনের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত। পাপ মনুষ্যত্বকে ক্ষয় করে। জীবন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। 'দিন রাতের অনন্তকাল মিথুন' এর রূপকে সত্যদাস অন্যায়-পাপকে প্রকাশ করে দিয়েছে। পাপ জীবনের এক অনিবার্য ফলশ্রুতি। 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে ইন্দ্র জীবনে পাপের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে—

> 'মানুষের দেহের তলায় পাপ না থাকলে সেটি জীবন হয় না।'[৫১]

পাপ থেকে জন্ম নেয় দুঃখ। মানবজীবনে দুঃখলাভ অবশ্যাম্ভাবী। পঞ্চইন্দ্রিয়ের আধারে মানবজীবনে দুঃখ-পাপের সমান্তরালতায় পুণ্য-সুখের সহাবস্থান দেখা যায়। বিভিন্ন গল্পভাষ্যে বিমল কর জীবনের এই চিরন্তন টানাপোড়েন উপস্থাপিত করেছেন। পাপ-পুণ্যের এই যুগ্ম অবস্থান 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা', 'সত্যদাস' প্রভৃতি গল্পে রূপায়িত। মনের অবচেতনে আলো-অন্ধকারের নিরন্তর খেলা 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' গল্পে রোহিণী-গগনচন্দ্রের মধ্যে দেখা যায়। 'কাম ও কামিনী' গল্পে কুঞ্জবাবু যৌবনকালে কামান্ধ হয়ে বিজলী ও আরো অন্যান্য মেয়েদের সর্বনাশ করে। প্রৌঢ়ত্বে অন্ধ হয়ে সে জীবনের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে। জীবন সমগ্ররূপে তার কাছে প্রতিভাত হয়। কাম-কামিনীর মেলায় গিয়ে সে জীবনের সুখ-দুঃখের পারস্পরিকতাকে অনুভব করে সহচরের বক্তব্যে—

> 'জীবনের ভোগসুখের বেলাটি আপনি আপনার অর্ধেকটি দিলেন। সুখটুকু নিয়ে জীবন তো নয় বাবু, দুঃখটুকুও তার অংশ। দিনে রাতে দিবস পূর্ণ হয়। জীবন পূর্ণ হয় শোকে তাপে ব্যথায়।'[৫২]

সুখ-দুঃখের পরিপূর্ণতায় 'সহচরী' গল্পে সরসী নবীনকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। নবীনের জীবনের আলো-অন্ধকার উভয় দিকই তার কাছে পরিস্ফুট। ফলে

তার মধ্যে সম্পূর্ণ মানুষকে দেখতে পেয়েছে সরসী। তার ভাষ্য :

'নবীন, তোকে তখন দেখেছি—তোর সুখে।...আজ দেখছি
তোর দুঃখে।...তোকে আমি অর্ধেক করে দেখতে চাই নি,
সম্পূর্ণ করে দেখতে চেয়েছিলাম। তুই আজ সম্পূর্ণ।'[৫৩]

মানুষের প্রার্থিত পূর্ণতা লাভ সহজলভ্য নয়। সুখ-দুঃখের টানাপোড়েনে, পাপ-পুণ্যের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন। বেঁচে থেকে অস্তিত্বশীল হওয়া এবং সত্তার পরিপূর্ণতা অনুভবে আনন্দ লাভই প্রত্যেক মানুষের একান্ত আন্তরিক কাম্য। উপনিষদে ঋষিগণ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রূপে 'আনন্দ'কেই চিহ্নিত করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ অনুসরণে দেখি, তপস্যালব্ধ অনুভবের দ্বারা ভৃগু মুনি জেনেছিলেন : আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দের আকর্ষণেই জীবেরা জন্মগ্রহণ করে। আনন্দকে পাথেয় করে জীবনধারণ করে এবং শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আনন্দেই ফিরে যায়। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি।"

ক্ষণিকের জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ বিমল কর 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' গল্পে চুনীলালের জীবনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। চুনীলাল জীবনে অনেক অর্থ-সুখ পায়নি, কিন্তু কুমুদিনীকে পেয়ে জীবনে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। কুমুদকে ভালোবেসে সে স্বল্পতার মধ্যেই পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছিল। 'আত্মজা' গল্পে হিমাংশু অস্তিত্বের সংকটে জীবনের আনন্দ হারিয়ে আত্মহত্যা করে। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে আনন্দহীন জীবন হেমাঙ্গকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বিপ্রতীপে 'যযাতি' গল্পে নীলকন্ঠ আকন্ঠ জীবনতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ। বয়স হলেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে কাম-ক্ষুধা-ভোগের আকাঙ্ক্ষায় অধীর। পুরু-যযাতি পালা রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে নীলকন্ঠ জীবনে বাঁচার রসদ খুঁজে বেড়ায়। ছেলে ললিতই একমাত্র বাবার এই জীবনাকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে। নীলকন্ঠের চেতনায় বাঁচার আনন্দই একমাত্র সত্য—

'মরণ-মরণ; তার জন্যে এত হই হই করার কী আছে!...না,
নীলকন্ঠের এ-সব পছন্দ নয়। এ-পৃথিবীতে যে-কদিন আছ,
আনন্দ করে থাক।'[৫৪]

এই আনন্দই নিজসত্তার সারসত্যকে জানার অন্যতম প্রেরণা। 'সুধাময়' গল্পে

হৈমন্তীর ভালোবাসা সুধাময়ের জীবনে আনন্দ নিয়ে এসেছিল। এই আনন্দ তার অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণায় উপশম এনে দিয়েছিল। বন্ধু পরিমলকে পূর্ণতার ক্ষেত্রে আনন্দের এই প্রকাশ সম্বন্ধে সুধাময় লিখেছিল—

'মানুষকে পূর্ণতার পথে যেতে হয় এক একটা পথ দিয়ে।
এই রকম পথকেই গুণীজনে বলেছেন আনন্দ।'[৫৫]

বিমল করের গল্পবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে মানবজীবন। এই জীবন বিচিত্র প্রেক্ষিতে-অনুষঙ্গে বৈচিত্র্যবর্ণিল। কোনো দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে তিনি গল্প রচনা করেননি, বরং বিভিন্ন মানুষের জীবনায়নের অন্তর্লীন দার্শনিকতাকে বিমল কর লেখনীতে রূপ দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিজীবনের চলমানতায় তিনি জীবনের তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কেবল নিজস্ব দৃষ্টিকোণকেই বিমল কর গল্পে রূপায়িত করেননি, নানা মানুষের জীবনবোধের মাধ্যমে জীবনের মূলসত্যকে জানতে চেয়েছেন। গল্পের চরিত্রের বক্তব্যে তাঁর মনোভঙ্গি বোঝা যায়—

'আমাদের জীবনটা কেমন জানিস ?...আসলে জীবনের
কোনও একটা নির্দিষ্ট পরিচয় নেই, এক একজনের কাছে
এক এক রকম, এক এক অবস্থায় এক ধরনের।'[৫৬]

মানব জীবনের কোনো আধ্যাত্মিক অন্বেষণের প্রতি গল্পকারের আগ্রহ নেই। স্বর্গ-নরকের দার্শনিক প্রেক্ষাপটে নয়, মর্ত্যজগতের প্রেম-যন্ত্রণা-ভালোবাসায়-বেদনায় আলোড়িত মানবজীবনের কথকতাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলভিত্তি। 'নরকে গতি' গল্পের অন্যতম চরিত্র শরদিন্দুর বয়ানের অন্তরালে সক্রিয় হয়ে ওঠে লেখকের পরাবাচন—

'স্বর্গ নরক কোনোটাই আমার জানা নেই। মর্তটা জানা
আছে। যদি আমায় বলো, আমি বলব, ইহকালের পরিচয়ই
মানুষের পরিচয়। স্বর্গে তার পরিচয় থাকে না। আর নরকে
তার কী পরিচয় থাকে আমি জানি না।'[৫৭]

মানবজীবনই বিমল করের গল্পের পাঠ্যবস্তুতে মূল অন্বিষ্ট। পাঁচ দশক ব্যাপী লেখকজীবনে তিনি মানবজীবনে অনন্ত গতিপথের আখ্যান উপস্থাপিত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর স্বীকারোক্তি–

'মানুষ আমার গল্পে hero—মানুষ মৃত্যু অবধারিত জেনেও

তার বিরুদ্ধে যুঝ্ছে—লড়াইটাই হচ্ছে 'পুরুষকার'—

'মানবোচিত'—'নায়কোচিত'।[৫৮]

জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধিতে প্রয়োজন অন্তর্লোকের উন্মোচন। বিমল করের গল্পে অন্তর্জগতের কথালাপ ভাষ্যরূপ লাভ করেছে। প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবন তাঁর গল্পে উঠে এলেও কেবলমাত্র সেই জগতের সংকীর্ণ মানসিকতা-দ্বিধা-সংশয়ই বর্ণিত হয়নি। একইসঙ্গে জীবনের প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ফুটে উঠেছে। জীবনে অপূর্ণতার যন্ত্রণা থাকলেও কোনো নঞর্থক জীবনবোধ তাতে প্রাধান্য পায়নি। মানবিক সম্পর্কের বর্ণনায় তাঁর গল্পজগত মুখর। বিমল করের গল্পের আলোচনাকালে সমালোচকের মন্তব্য গ্রহণীয়—

'বিশুদ্ধ মানবতাবোধ বিমল করের গল্পের মূল সুর।'[৫৯]

লেখকজীবনের সূচনাকাল থেকেই বিমল করের লেখায় মৃত্যুর অনুষঙ্গ এসেছে। শূন্যতা যখন মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে, তখন মৃত্যুকে সে আপন করে নেয়। কিন্তু মৃত্যুকে এড়িয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ মানুষের একমাত্র আধেয়। 'মাছি' গল্পে মানিক জীবনে বেঁচে থাকার তাৎপর্য অনুভব করেছে–

'জীবনটা বড়, বেঁচে থাকাটাই আসল।'[৬০]

গল্পকারের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁর জীবনদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সীমিত কালের আধারেও মানুষ যে জীবন পায়, তাকে আমরা বহুমাত্রিকতায় আয়ত্ত করতে চাই। জীবনের প্রতি মানুষের নিজস্ব এক অন্তর্দর্শন থাকে। বাহ্যজগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণে মানুষের অন্তর্জগতই জীবনের অন্তর্লীন সত্যকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। জীবন সম্পর্কে বিমল করের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ 'সুধাময়' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাময়ের জবানীতে বিধৃত—

'তবে জীবন কি ?

আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, আত্মাকে রক্ষা করার ইচ্ছা,

মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সৎকে রক্ষা করো,

সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।'[৬১]

পাঠকৃতির ভাষ্য আর জীবনের ভাষ্য বিমল করের গল্পভুবনে একাকার হয়ে গেছে। তাই তাঁর রচিত বিভিন্ন আখ্যানের অন্তর্বস্তুতে জীবনদর্শন অন্তর্লীনতায় উদ্ভাসিত

হয়ে যায়। এই জীবনদর্শনের কোনো সোচ্চার ঘোষণা নেই বা বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় অভিহিত করার প্রয়াস নেই। এক্ষেত্রে সমালোচকের বক্তব্য আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক—

> 'প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব একটি জীবনদর্শন থাকে। কারও স্পষ্ট, কারও মিহি, অন্তরালবর্তী। বিমল কর দ্বিতীয় গোত্রের লেখক। লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি যে জীবনদর্শন খোঁজ করছেন, তার মূল, শোক জরা মৃত্যু তাড়িত জীবনের আপাত পরিণামহীনতার মধ্যে প্রোথিত নয়। সম্ভবত জীবনদর্শনের অনুসন্ধান করাই তাঁর জীবন দর্শন। এ অনুসন্ধানের শেষ নেই।'[৬২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতার সময়কাল থেকে শুরু করে পরবর্তী পাঁচ দশক ব্যাপী স্থান-কালের পারম্পর্যে প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন বিমল করের গল্পের কাহিনি হয়ে উঠেছে। অবক্ষয়ী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের ভাঙন, বিচ্ছিন্নতাবোধ, হতাশা-অনিশ্চয়তাকে বিমল কর শৈল্পিক ভাষ্যে উপস্থাপন করেছেন। ফ্রানজ কাফ্‌কা'র 'দ্য ক্যাসল' উপন্যাসে অস্তিত্বহীনতার মুখোমুখি হয়ে মানুষের আত্মানুসন্ধান দেখা যায়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজবাস্তবতায় মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা, অস্তিত্বের সংকটকে বিমল কর অস্বীকার করেননি। তিনি জীবনের এই সংকটগুলো নিপুণ অন্তর্বয়নে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনে অনেক যন্ত্রণা-ব্যর্থতা-শূন্যতা থাকলেও জীবনের প্রতি কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিমল করের ছিল না। বরং ব্যক্তি-অস্তিত্ব যখন নৈরাশ্য-শূন্যতা-যন্ত্রণায় দ্বিধাদীর্ণ, তখন অস্তিত্বের পূর্ণতায় মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জীবনে এই পূর্ণতার অনুধ্যান বিমল করের জীবনদর্শনে প্রতিবিম্বিত।

অপূর্ণতা মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বাস্তবসত্য। বিভিন্ন সম্পর্কের যোজন-বিয়োজনে উদ্ভুত সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। ফলে অপূর্ণতাবোধ ক্রমশ বেড়ে চলে। অপূর্ণতাবোধ থেকে আসে শূন্যতা। শূন্যতা অস্তিত্বের অন্তর্গত অনিশ্চয়তায় মানুষকে উদ্বেল করে তোলে। কিন্তু জীবনের প্রেম-বিশ্বাস-আনন্দ অস্তিত্বগত শূন্যতাকে ক্রমশ ভরিয়ে তোলে। বিমল কর জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ, ভালোবাসাকে আহ্বান করেছেন বারে বারে। একে অপরের সাহচর্যে মানবজীবনে প্রেমের অনুভূতি, বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যবোধ

অনুভূত হয়। গল্পকার বিমল কর বিশ্বাস করেন, শূন্যতাবোধের সংকীর্ণতায় মানুষ থেমে থাকে না। মৃত্যু জীবনে অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু মৃত্যু অতিক্রমণে জীবনের অগ্রসরণেই তিনি বিশ্বাসী। তাঁর ভাবনায়, জীবন হল অনন্ত সম্ভাবনাময়। পূর্ণতার জন্য প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। তাই অপূর্ণতার গণ্ডিতে থেকেই পূর্ণতার অন্বেষণে মানুষ উন্মুখ। বিমল করের জীবনদর্শনে পূর্ণতা উপলব্ধিই হল মানবজীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধি।

অপূর্ণতা থেকে আসে শূন্যতা। শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার অনুরণন ধ্বনিত। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের মূলীভূত সত্যের চিরকালীন অন্বেষণই হল মানবজীবনের শাশ্বত সত্য। গল্পকার বিমল করের জীবনদর্শন এই পূর্ণতার অন্বেষণে মানুষের নিরন্তর যাত্রার বহুস্বরিক আখ্যানেরই সার্থক শিল্পভাষ্যে প্রতিফলিত।

তথ্যসূত্র :

১. 'লিখনে কী ঘটে' : অমিয়ভূষণ মজুমদার; আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ১৯৯৭; পৃ. ৪০

২. 'আমার লেখা' : বিমল কর; 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা; ১৩৮২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২০

৩. বিমল করের একটি সাক্ষাৎকার; 'নহবত' পত্রিকা; ত্রিংশতি বর্ষ; ১৪০০ সাল; পৃ. ১৬b

৪. তদেব; পৃ. ১৫b

৫. প্রস্তাবনা : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প ; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১৯৭৩

৬. 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; 'নূতন সাহিত্য'; ২য় সংকলন; বৈশাখ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

৭. 'আমার লেখা' : বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৫

৮. মুখোমুখি বিমল কর: সৃষ্টির অলৌকিক মুহূর্তগুলি; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; বিমল কর বিশেষ সংখ্যা; বইমেলা, ২০০৩; পৃ. ৩৮

৯. 'আমার লেখা' : বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৪

১০. 'অপহরণ': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ৪৫৯

১১. 'সুধাময়' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৫৫

১২. 'ইঁদুর': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৭

১৩. 'সম্পর্ক': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৪৫২

১৪. 'বিমল করের গল্প : দ্রোহ ও জীবন জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর'; সিদ্ধার্থ সেন; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; বিমল কর বিশেষ সংখ্যা; বইমেলা, ২০০৩; পৃ. ২৫৫

১৫. 'আঙুরলতা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২২৯

১৬. 'আয়োজন': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৫০৮

১৭. 'জানোয়ার' : বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৫৬

১৮. 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' : বিমল কর; তদেব; পৃ. ৬৪৮

১৯. 'এরা ওরা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৬২১

২০. 'তুচ্ছ': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৫৮০

২১. 'বরফসাহেবের মেয়ে': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৪৫

২২. 'স্বপ্নের নবীন': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ; পৃ. ১৮৬

২৩. 'সংশয়' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩৬৮

২৪. 'আত্মজা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ১০৯

২৫. 'শূন্য': বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৭২

২৬. 'মোহনা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৪৮০

২৭. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ১৯৯৭; পৃ. ২৪৩

২৮. 'অপহরণ': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৪৬৩

২৯. 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৪৩৯

৩০. 'উদ্বেগ': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৩১৩

৩১. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৭২১

৩২. 'উড়োখই'(২): বিমল কর; তদেব; পৃ. ১২১

৩৩. 'পূর্ণ অপূর্ণ': বিমল কর; উপন্যাস সমগ্র (২), আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ১৯৯১; পৃ. ৪১৩

৩৪. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ.৭২৫

৩৫. 'গগনের অসুখ': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৯৯

৩৬. 'পূর্ণ অপূর্ণ': বিমল কর; উপন্যাস সমগ্র (২); আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম সং, সেপ্টেম্বর; ১৯৯৯; পৃ. ৪১৩

৩৭. '...আমার পরিশ্রমটা অনেকটা মজুরের মতন': বিমল করের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার; প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়; 'দেশ'; ৩ নভেম্বর, ১৯৯০; পৃ. ৩৩

৩৮. 'বিমল করের ছোটগল্প: একটি সমীক্ষা'; বাসুদেব মোশেল; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; বিমল কর বিশেষ সংখ্যা; বইমেলা, ২০০৩; পৃ. ৫১৩

৩৯. 'বিচিত্র সেই রামধনু': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৬৮০

৪০. 'আমার লেখা' : বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৭-২৮

৪১. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৬৭

৪২. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৭২৫

৪৩. 'কাচঘর' : বিমল কর; কাচঘর; ক্লাসিক প্রেস; কলকাতা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; পৃ.১৬

৪৪. 'সুনীতিমালার উপাখ্যান': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ. ৬৪

৪৫. 'ফুটেছে কুসুমকলি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮

৪৬. 'নীরজা': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; পৃ. ৯২

৪৭. 'খড়কুটো' : বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; পৌষ, ১৪১০; পৃ. ৪৪-৪৫

৪৮. 'ফুটেছে কুসুমকলি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১০৮

৪৯. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৬২

৫০. 'উড়োখই'(২): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; তদেব; পৃ. ২৫১

৫১. 'ফুটেছে কুসুমকলি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ৯৫

৫২. 'কাম ও কামিনী' : বিমল কর; উপাখ্যানমালা; আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫; পৃ. ৭৯

৫৩. 'সহচরী'; বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৪৯০

৫৪. 'যযাতি': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৩৩

৫৫. 'সুধাময়': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৬৭

৫৬. 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ': বিমল কর; 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ; অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স; জানুয়ারি, ১৯৯৮; পৃ.৩৬

৫৭. 'নরকে গতি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ.৭৭

৫৮. 'মুখোমুখি বিমল কর: 'সৃষ্টির অলৌকিক মুহূর্তগুলি'; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; তদেব; পৃ. ৪২

৫৯. ভূমিকা: সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠ গল্প : বিমল কর; অনন্য প্রকাশন; ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

৬০. 'মাছি' : বিমল কর; শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকা; ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ; পৃ. ৫৬

৬১. 'সুধাময়' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৬৬

৬২. 'মন্ত্রোচ্চারণের মতো গল্প': শৈবাল মিত্র; 'নহবত' পত্রিকা; ১৪০০ সাল; পৃ. ৫৫

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যুচেতনা : নিগূঢ় উপলব্ধি

এ বিশ্বলোকে সবচেয়ে রহস্যময় হল মৃত্যু। তার আলোছায়া স্পর্শেই জীবন স্পন্দমান। মরণের আবহেই আমাদের প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকা। মৃত্যুর নিশ্চিত আগমনের প্রেক্ষিতেই জীবন চরম সত্যরূপে প্রতিভাত। তাই মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের অসীম কৌতূহল, রহস্যমোচনে এত আগ্রহ। মৃত্যুর অবিরত ইশারাতেই জীবনের প্রতি তীব্র টান অনুভূত হয়। মৃত্যুসম্পর্কীয় অনুভব ব্যতীত জীবনবোধ সম্পূর্ণ হতে পারে না। বহুমাত্রিক মৃত্যুকে কোনো সংজ্ঞা বা অবয়বে চিহ্নিত করা অসম্ভব। তার বিমূর্ত অমোঘ উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ভয়-উদ্বেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসায় আমাদের সকলের মধ্যে গড়ে ওঠে নিজস্ব মৃত্যুচেতনা। জাতি-সমাজ-ব্যক্তি বিশেষে মানুষের মৃত্যুবোধ কাল-পরিসর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিবর্তিত হয়েছে। আর জীবনের প্রতিফলকে অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানাবিধ ক্ষেত্রে মৃত্যু উন্মোচিত হয়েছে নতুন নতুন বৈচিত্র্যময় বিন্যাস-পরিসরে।

কথাসাহিত্যিক বিমল করের সৃষ্ট গল্পবিশ্বে মৃত্যুচেতনার বহুস্বরিকতা প্রবলভাবে উপস্থিত। মানবজীবনে পূর্ণতার অনুধ্যান তাঁর গল্পসমূহের মূল সুর। আর মৃত্যুচেতনাকে অস্বীকার করে সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। মৃত্যুর অতলান্ত অনুভূতির মধ্য দিয়েই মানুষ নিরন্তর সত্তার পূর্ণতার অন্বেষণে উন্মুখ। তাই বিমল করের বিভিন্ন গল্পের প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গ-পটভূমিকায়, কখনো বা ভরকেন্দ্র হিসেবে মৃত্যুভাবনা বারে বারে উঠে এসেছে। পাঁচ দশকের বেশি সময়কাল জুড়ে রচিত তাঁর গল্পসমূহে মৃত্যু বহুবিধ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। স্থান-কাল-পরিবেশভেদে এক গল্প থেকে অন্য গল্পের পাঠকৃতিতে মৃত্যুচেতনার রূপান্তর ঘটেছে। মৃত্যুবোধকে অস্বীকার করে বিমল করের লেখনী জীবনায়নের ভাষ্য রচনায় বরাবরই অনাগ্রহী। বরং মৃত্যুর অজস্র কথকতার প্রেক্ষিতেই তাঁর জীবনদর্শন বিম্বিত। নিছক বিষয়বস্তু হিসেবে মৃত্যুকে তিনি গল্পে তুলে ধরেন নি; বরং মৃত্যুর আবেশময়তায় জীবনের নান্দনিক পূর্ণতাবোধের পরশে পাঠক-পাঠিকাকে স্বতন্ত্র জীবনবোধের দিশা দেখিয়েছেন। বিমল করের গল্পে মৃত্যুচেতনা বিবিধ রূপে রূপান্তরের শৈল্পিকতায় দার্শনিকবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিমল করের বিভিন্ন গল্পে মৃত্যুবোধের যে অনিবার্য আবহ লক্ষিত হয়, তার উৎস অন্বেষণে একাধিক মাত্রা বিচার্য। ব্যক্তিজীবনে নানান অভিজ্ঞতা অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশের প্রভাবে তাঁর মৃত্যুসম্পর্কীয় নিজস্ব ভাবনা সমৃদ্ধ হয়েছে, যার প্রতিফলন পরবর্তীকালে গল্পে-উপন্যাসে দেখা যায়।

ব্যক্তিজীবনে ঠাকুরমার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু বিমল করকে শোকগ্রস্ত করলেও ছোটোবেলায় হাজারিবাগের রেল কোয়ার্টারে ছোটো বোনের অদ্ভুত মৃত্যু তাঁর চেতনাকে তীব্র আঘাত আঘাত করে। শিশু বয়সের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাকে মৃত্যুর বীভৎস রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা শেষ দিন পর্যন্ত মুছে যায় নি। মৃত্যুর এই অভিঘাতে ক্রমশ তিনি মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। এই মৃত্যুভাবনার প্রকাশ তাঁর বেশিরভাগ সাহিত্যে জায়মান হয়ে থেকেছে। নিজস্ব স্মৃতিকথায় তারই প্রমাণ—

> 'মৃত্যুর এই যে নিষ্ঠুর চেহারা, অর্থহীন আবির্ভাব, স্বেচ্ছাচারিতা
> এবং নির্বিকার আত্মসাৎ-বৃত্তি—এটি আমি কোনোদিনই আর
> ভুলতে পারিনি পরে। আমার লেখায় হয়ত তাই ঘুরে ঘুরে
> দেখা দেয় মৃত্যু-কথা।'[১]

বোনের মৃত্যুর তিন-চার বছর পর এক অঝোর বর্ষার দিনে ভাইয়ের হঠাৎ মৃত্যু তাঁকে আরো একবার বিচলিত করে। বোনের মৃত্যুতে যিনি ভেবেছিলেন 'মৃত্যু কি তবে কানামাছি!' ('উড়োখই', ১ম পর্ব, পৃ. ১৩) পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনার প্রভাবে আরো মৃত্যুচিন্তায় জড়িয়ে পড়েন। ছোটোবেলা থেকে দীর্ঘদিন শারীরিক ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়ায় তাঁর মনে মৃত্যুবোধ বারে বারে উজিয়ে এসেছে। ছাত্রাবস্থায় ও চাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন টানাপোড়েনের সমান্তরালে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিমল করের মৃত্যুভাবনাকে ঋদ্ধ করে চলেছিল।

কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিমল করের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। যুদ্ধের ফলে অজস্র নিরাপরাধ মানুষের অসহায় মৃত্যু, নাৎসি-ফ্যাসিস্ট শক্তির বীভৎস অত্যাচারের কাহিনি, ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির শোষণ, ভারত-ছাড়ো আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার স্রোতে তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে মানুষের অসহায় মৃত্যু, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কলকাতায় তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সমকালে মৃত্যুর এক নিদারুণ

আবহ তৈরি করে দিয়েছিল। মন্বন্তর-যুদ্ধ-দাঙ্গায় জীবনের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই সংশয় তৈরি হয়ে যায়। একই সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার আমাদের বেঁচে থাকাকে কঠিন করে তোলে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনে ঘনিয়ে আসে নিদারুণ সংকট। ইতিমধ্যে কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে এ.আর.পি.-তে চাকরি পেলেও বিমল কর এই যুগযন্ত্রণা থেকে রেহাই পান নি। নিজ চেতনায়-সত্তায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল মৃত্যুভয়। তাঁর নিজস্ব বক্তব্য —

> 'যুদ্ধের কলকাতাকে আমি দেখেছি;....'৪১ সালের শেষ থেকে কয়েকটা বছর বড় দুঃসময় গিয়েছে। ব্ল্যাক আউট, বোমার আতঙ্ক, দলে দলে মানুষ পালানো, অগাস্ট বিদ্রোহ, দামোদরের বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মেদিনীপুরের তাণ্ডব, শহর কলকাতার আবার মানুষে–মিলিটারিতে ফেঁপে ওঠা, সে-সব এখনও স্মৃতিতে থেকে গেছে।...মনে হত, এখন যদি একটা বোমা পড়ে, (যার সম্ভাবনা তখন সবসময়ই ছিল) কাছাকাছি, তবে আমাদের মৃত্যু অবধারিত।...চারপাশের অবস্থা দেখতে দেখতে একটা অনিশ্চয়তা, ভয় ও অসহায়তার বোধ এসে গিয়েছিল।'[২]

এরপর রেলের অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে চাকরি পেয়ে বেনারসে গিয়ে একাকিত্ব-নৈরাশ্যে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। ফলে মৃত্যুচিন্তা ক্রমশ তাঁকে গ্রাস করে। ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা ও সমকালীন যুগের অন্তঃসারশূন্যতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতির যৌথপ্রভাবে তাঁর চেতনায় মৃত্যুচিন্তা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। জীবনের নিত্যতা-অনিত্যতার কূট জিজ্ঞাসায় ভরে ওঠে ব্যক্তিসত্তা। বিমল করের নিজস্ব স্বীকারোক্তিতেই তার প্রকাশ —

> 'শারীরিক রোগ-ভোগ, সাংসারিক দায়-দুশ্চিন্তা, মনের নানা উদ্বেগ, কিছু কিছু জীবন-প্রশ্ন আমায় অসহিষ্ণু, উতলা, বিষণ্ণ করে তুলেছিল। বিশেষ করে মৃত্যুচিন্তা। ...আমি যেন কেমন রুগ্ন, অসহায়, নিঃসঙ্গ এবং সতত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম। আমার বাল্যকালে দেখা কয়েকটি পারিবারিক মৃত্যুর ঘটনা,

যৌবনে আমার নিজের অনিশ্চয় জীবনের অনুভূতি, যুদ্ধের সময়কার সেই আতঙ্ক ভয় অসহায়তার বোধ, আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা–এ সমস্তই যেন কোথাও পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ...মনে হত, বেঁচে থাকার কোনো সান্ত্বনা আমার নেই। তাছাড়া এ জীবনেরই মূল্য কি ? মৃত্যু–তা এমনই অবধারিত, এমনই চতুর, শঠ, এমনই নির্দয় যে মানুষের জীবনরচনার যে কোনো পর্বে যে কোনো মুহূর্তে তা আমাদের সকল শ্রম ও যত্নকে ধুয়ে মুছে দিতে পারে। তাই নয় কি ?' [৩]

মৃত্যু হল ধ্রুব সত্য। মানবজীবনের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হল মৃত্যু। কিন্তু কোনো মানুষই নিজ জীবনে মৃত্যু সম্পর্কীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে অপারগ। অন্যান্যদের মৃত্যু দেখে-শুনে-বুঝে একজন মানুষের মৃত্যুবোধ গড়ে ওঠে। জীবনবোধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে মৃত্যুবোধ। স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে পারিপার্শ্বিক জগত থেকে মানুষ যেমন মৃত্যুবোধে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনি মৃত্যুর পর সেও যেন অন্যান্যদের কাছে আরো নানা মাত্রায় উন্মোচিত হতে চায়। খণ্ডকালের জীবনে মানুষ মৃত্যুকে কখনো সহচর, কখনো বা প্রতিদ্বন্দ্বী অনুভব করে। আবার, এই মৃত্যুবোধই তাকে মৃত্যু-পরবর্তী অভিজ্ঞতার সন্ধানে জিজ্ঞাসু করে তোলে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধির বহুমাত্রিকতাকেই গল্পকার বিমল কর বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মানবজীবনে অমোঘ-অনিবার্য সত্য 'মৃত্যু'কে কখনোই এড়িয়ে যেতে চান নি বিমল কর। বরং জীবনের বিচিত্র মাত্রায় মৃত্যুর শাশ্বত স্বরূপ সন্ধানে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন বারংবার। এ প্রসঙ্গে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি —

'জীবজগতে যেটা অবধারিত সত্য সেই মৃত্যু আমার কাছে নিয়ত এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল এবং জীবনের অস্তিত্ব, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম সৌন্দর্য দেহ ইত্যাদি নিয়ে দেখ ছিল সংশয়।' [৪]

এই প্রশ্নময় মৃত্যুভাবনা বিমল করের সৃজনশীল সত্তাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা মাত্রায় আবিষ্ট করেছে। তাঁর গল্প রচনার সূচনা পর্ব থেকেই মৃত্যুবোধ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্বে রচিত 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্পে (১৯৪৪) এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের

উপলব্ধিতে মানবজীবনে মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় উপস্থিতির কথা প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন গল্পে এই মৃত্যুবোধ জীবনায়নের নানান প্রেক্ষাপটে বিম্বিত হয়ে এক দার্শনিক উপলব্ধিতে উন্নীত হতে চেয়েছে। পাঁচ দশকের বেশি সময়কাল ধরে রচিত বিমল করের একাধিক গল্পে মৃত্যুভাবনার নান্দনিক ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে নানাবিধ প্রেক্ষাপটে। গল্পকারের স্বীয় বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

> '...তবে আমার মাথায় ওই যুবক বয়স থেকেই 'মৃত্যু' একটা ভাবনা হিসেবে এসেছে। পরবর্তীকালে আমার অনেক গল্পেরই বিষয় মৃত্যুচিন্তা বা দুশ্চিন্তা।'[৫]

তীব্র জীবনজিজ্ঞাসায় মৃত্যুর রহস্যাবৃত স্বরূপকে বিমল কর উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাই জীবনবোধের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে মৃত্যুর বহুল ব্যঞ্জনার উন্মোচনই তাঁর গল্পবীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাই প্রতিভাত হয়েছে —

> 'মৃত্যুর মাত্রা গল্পগুলিতে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। মৃত্যুকে বোঝাতে নয় —জীবনকে সঠিক মানে ধরবার জন্য। আপাত এবং প্রকৃতকে উপলব্ধির জন্য।'[৬]

মানবজীবনে আত্মসত্তার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপরসত্তা হিসেবে মৃত্যু সমান্তরালভাবে সদা সক্রিয়। খণ্ডকালের জীবনের পরিধি একটু বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আমরা বারে বারে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চাই। মৃত্যু অনিবার্য হলেও তার আগমন ক্ষণ সর্বদাই অনিশ্চিত। তাই মৃত্যুভয় মানুষ প্রায়শই আক্রান্ত হয়। বিমল করের গল্পে মানুষের এই মৃত্যুভয়ে নানা অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। চারপাশে জগতে নিরন্তর ঘটে চলা মৃত্যু মানুষের মনোজগতে মৃত্যুসম্পর্কীয় ভয় ও উদ্বেগের রেশ ছড়িয়ে দেয়। 'সুধাময়' গল্পে বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে ছেলে সুধাময় এক তীব্র মৃত্যুভয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। বাবার মৃত্যু যেমন তাকে ভীত করে তুলেছিল, তেমনি মায়ের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর আসন্নতা বুঝতে পেরে সে নিজের জীবন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। গল্পের বয়ান অনুযায়ী —

> 'প্রায় সাত আট মাস একটানা সুধাময় মৃত্যু ভয় ভোগ করল।'[৭]

মৃত্যুর থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে না পেরে সুধাময় যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, একইভাবে শহর জুড়ে মড়ক দেখে 'উদ্বেগ' গল্পে শিশিরের বিচলিত ভাব

লক্ষ করা যায়—

'...শিশির কিছু বলতে পারবে না— কেননা প্রতিটি মৃত্যুর
উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ করছে।'[৮]

এমনকি বন্ধু নিশীথের মড়কে অকালমৃত্যু তার চেতনাকে উদ্বেলিত করে তোলে। অন্যের মৃত্যু এখানে অপর (other) সত্তা রূপে শিশিরের অস্তিত্বকে বিব্রত করে চলে —

'শিশির পুনরায় অনুভব করল, নিশীথের মৃত্যুর জন্যে তার
মনে বিস্বাদ এক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।'[৯]

'মাছি' গল্পের কথক অর্থাৎ দেবকীর স্বামীও শহরে রোগের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যুর মিছিল দেখে মৃত্যুভয়ে জর্জরিত হয়েছে। মৃত্যুর অজানা ভয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুভয়ের তীব্র আশঙ্কায় তাঁর অস্তিত্বে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি হয়ে যায়। 'সোপান' গল্পের কথকও প্রাচীন মিনারের অন্ধকারে অবরুদ্ধ হয়ে দেবকীর স্বামীর মতোই মৃত্যুভয়ে শিহরিত হয়েছিলেন।
মৃত্যু নিশ্চিত হলেও মৃত্যুর আগমনের ক্ষণ চূড়ান্ত অনিশ্চিত। তাই স্বল্পকালের জীবনের শুরু থেকেই মৃত্যুভয় মানুষের চেতনায় বারে বারে উজিয়ে আসে। জীবনের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যেন ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের জীবনে মৃত্যুর এই আকস্মিক আঘাতকে 'অশ্বত্থ' গল্পে বিমল কর তুলে ধরেছেন। এই গল্পে নবনী-রেণুর একমাত্র ছেলেকে হঠাৎ মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নেয়। মৃত্যুর আঘাত এই দম্পতিকে বাকরুদ্ধ করে দেয়—

'কোনো সাড়াশব্দ না দিয়ে কোন কারণ না দেখিয়ে ছেলেটা
যে কি করে চলে গেল, হঠাৎ—রেণু তারপর থেকে শুধু তাই
ভেবেছে, ভাবছে।'[১০]

ভয়ংকর মৃত্যুর সামনে মানুষ যেন এক অসহায় শিকার রূপে উপস্থিত। 'মাছি', 'উদ্বেগ' ইত্যাদি গল্পে মৃত্যুর আগ্রাসী রূপের কাছে মানুষের চরম ভীতিময় অবস্থা গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যুর এই স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন 'অতঃপর' গল্পের অন্যতম চরিত্র রেবতী। নিজের স্ত্রী মীরার হঠাৎ মৃত্যু তাকে যেন মৃত্যু সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায় —

'মরার কেমন থাকে না। কোথায় কী হয়ে যায়–কেউ বলতে
পারে না।'[১১]

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবোধ তৈরি হলেও মৃত্যুর আঘাত করার কোনো আগাম পূর্বাভাস থাকে না। বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই মানুষ মৃত্যুবোধ দ্বারা ক্রমশ আলোড়িত হতে থাকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জীবনমশায় জন্ম-মৃত্যুর এই সহাবস্থান সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন—

'জন্মমাত্রই মৃত্যু সঙ্গ নেয়; দিনে দিনে সে বাড়ে, সে বৃদ্ধির
মধ্যেই সে তার ক্ষয়ের ক্রিয়া করে যায়...।'[১২]

মৃত্যুর এই অমোঘ অথচ চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাকে 'অপেক্ষা' গল্পে শিল্পময়তায় উপস্থাপন করেছেন বিমল কর। বন্ধু ভুবনের আকস্মিক মৃত্যু শিবতোষের সত্তায় মৃত্যুবোধকে সঞ্চারিত করে। মৃত্যুকে সে অস্বীকার করেনি, কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণ জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। গল্পকার একটি চিঠির রূপকে শিবতোষের অবচেতন মনের স্তরে লালিত মৃত্যুজনিত ভীতিকে উন্মোচিত করেছেন। এক অনামা-অচেনা ব্যক্তির চিঠিকে খুঁজে পেতে শিবতোষের ব্যাকুলতা যেন প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর অনিশ্চিত আগমন বার্তাকে জানার নিরলস চেষ্টা হিসেবেই প্রতিফলিত হয়েছে। ভুবনের মতো সেও যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ডাক পেতে পারে। গল্পে ভুবন চিঠির প্রেরক বা চিঠির বয়ান প্রবল চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারেনি। কেবলমাত্র চিঠির শেষ দুটি বাক্য তার কাছে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে —

'আমি আসব। আমার অপেক্ষা করো।'[১৩]

শিবতোষ জানে যে, মৃত্যুর হাতে চূড়ান্ত সময়ে ধরা পড়তেই হবে। জীবনের প্রথম দিন থেকেই মৃত্যুর এই সমান্তরাল অবস্থান সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। শিবতোষের এই মৃত্যুবোধের সঙ্গে বিমল করে'র 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে তীর্থপতির ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তীর্থপতি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অন্তর্গূঢ় সম্পর্ককে যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছে—

'জীবনে কী আছে আর মৃত্যুতে কী নেই — তীর্থপতি আজ
আর তা বুঝতে পারছে না। ...কোনও অর্থ সে উদ্ধার
করতে পারেনি এই জীবন-রহস্যের।'[১৪]

শাশ্বত মৃত্যুর কাছ থেকে জীবনকে ঋণ হিসেবে পেতে কুণ্ঠিত নয় শিবতোষ। কিন্তু জীবনের পরিধিকাল সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করতে না পেরে, তার অস্তিত্ব উদ্বেগে-

ভয়ে মাঝে মধ্যেই দিশাহারা হয়ে পড়েছে —

> 'শিবতোষ অনুভব করতে পারল, কোনোদিন সে আসবে,
> অতি অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু সে কেমন, কত দিন অপেক্ষা
> করতে হবে, শিবতোষ বুঝতে পারল না।'[১৫]

মৃত্যু চূড়ান্ত স্বীকার করে নিয়েও মৃত্যুর ক্ষণ বা আগমন অনিশ্চিত হওয়ায় মানুষের চেতনায় বিভ্রান্তি জেগে ওঠে। মৃত্যুশাসিত জীবনে মানুষের এই চূড়ান্ত অসহায়তাকে বিমল কর একাধিক গল্পে শৈল্পিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। শেষ বয়সে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন —

> 'আমার মনে হয় মৃত্যুই তো চূড়ান্ত। এর সামনে কোনো
> যুক্তিই খাটে না। মানুষের জীবনে কখন কী ভাবে ঘটবে
> কেউ জানে না। কেন ঘটল তারও কোন কারণ নেই। খুব
> আন্‌রিজনিবল্‌। মৃত্যুর সামনে আমরা একেবারে অসহায়।
> এই অসহায়তাটাই আমার লেখায় বারবার কাজ করেছে।'[১৬]

বিমল করের মৃত্যুভাবনা সমন্বিত বিভিন্ন গল্পে ব্যাধি-অসুস্থতার প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠে এসেছে। রোগ-ব্যাধির রূপ ধারণ করে মৃত্যু বারে বারে মানবজীবনকে আঘাত করে। ব্যাধি-অসুস্থতা কখনো যেমন মানুষকে মৃত্যুভয়ে আন্দোলিত করেছে, আবার মানবজীবনে মৃত্যুর আঘাত এনে দিয়েছে। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিশ শতকীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিচ্ছিন্নতাবোধ-নৈরাশ্যময় সামাজিক ভাঙা-গড়ার প্রভাব তাঁর গল্পে অসুস্থতা-ব্যাধি রূপে দেখা দিয়েছে। 'একটি গল্পের খসড়া' গল্পের কথকের গল্প রচনার মনোভঙ্গিতে বিমল করের মনোভাব যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর মতোই আলোচ্য গল্পে কথকের সৃষ্ট গল্পতে অসুস্থতা সংক্রান্ত বিষয় উঠে আসার কথা অন্যতম চরিত্র গিরিনের বয়ানে ধরা পড়ে —

> '...বাবা, তোর তো পেটেন্ট গল্প আছে–অসুখ রোগ গলায়
> দড়ি টি-বি—অসুখ বিসুখ মরা টরা না হলে কি তুই লিখতে
> পারিস ! ...মাইরি, একটা গল্প লিখলি না তুই যাতে অসুখ-
> বিসুখ নেই।'[১৭]

বিমল করের সৃষ্টিজগত সম্পর্কে এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য না হলেও তাঁর

অনেক গল্পে মহামারী বা মড়কের অনুষঙ্গে মৃত্যুর কথা এসেছে। অনেক সময় চরিত্রের ব্যক্তিগত অসুস্থতাও তাদের মৃত্যু নামক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে। বিমল করের প্রিয় উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন'এ মৃত্যুর ধারক হিসেবে অসুস্থতা-রোগের উল্লেখ জগবন্ধু মশায়ের ভাবনায় দেখা গেছে—

> ' মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো নিয়ত
> তার হাত ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ
> করছে নিয়ম-কাল।'[১৮]

আলবেয়ার কামুর 'The Plague' উপন্যাসে যেমন মহামারীর বীভৎসতা লক্ষ করা গেছে, তেমনি 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া', 'উদ্বেগ', 'মাছি' ইত্যাদি গল্পে মড়ক–মহামারীর প্রসঙ্গ বিমল কর উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পগুলিতে মহামারীরূপ মৃত্যুর ব্যাপকতায় মানুষের অসহায় অবস্থা ফুটে উঠেছে। অনেক গল্পের চরিত্রের ব্যক্তিগত অসুস্থতা তাদের জীবনে সংকট সৃষ্টি করেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে নবেন্দুর অসুস্থতা, 'গগনের অসুখ' গল্পে গগনের রোগে আক্রান্ত হওয়া তাদের জীবনকে বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে। 'উপাখ্যান' গল্পে শারীরিক অসুস্থতার কারণে অমিয়া ধ্রুবকে জীবনে সঙ্গী হিসেবে পায় নি। এই ব্যাধিই শেষপর্যন্ত অমিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ব্যক্তিগত শারীরিক অসুস্থতা যে ক্রমশ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, তারই নিদর্শন 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্প। হেমাঙ্গের শরীরের আশ্চর্য ব্যাধি পায়রার সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ককে ধ্বস্ত করেছে। একইসঙ্গে চাকরি হারিয়ে সে সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে, স্ত্রী পায়রা অনুতপ্ত হয়ে তার জীবনে ফিরে এলেও রোগগ্রস্ত শরীর নিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করতে হেমাঙ্গের মন সাড়া পায় নি। ফলে, নিজের আশ্চর্য ব্যাধিই শত্রুরূপে দেখা দেওয়ায় হেমাঙ্গ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

জীবনের প্রতি তীব্র অভিমানেও অনেকসময় মানুষ যে মৃত্যুকে আহ্বান করে, সে প্রসঙ্গও গল্পকার বিমল কর গল্পের কাহিনিতে তুলে এনেছেন। জীবনে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিপুল ব্যবধানে মানুষ অনেকসময় মৃত্যুর সংলগ্ন হতে আগ্রহী হয়। 'বকুলগন্ধ' গল্পে অঞ্জনা-সুধাংশুর দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে ওঠে নি। ব্যক্তিগত জীবনে অঞ্জনা শ্যামলকে সঙ্গী হিসেবে পায় নি। কিন্তু শ্যামলকে ভুলতে না পেরে সে পুরোনো সুখস্মৃতিকে রোমন্থন করতে করতে যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। এই অপ্রাপ্তির বেদনায় অঞ্জনা মৃত্যুকে

আপন করতে চেয়েছে। 'জোনাকি' গল্পে স্যামুয়েল জীবনযন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রেমিক নিশীথের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং জীবনের বেঁচে থাকার রসদ না পেয়ে 'দরজা' গল্পে পারুলও বেঁচে থাকতে চায় নি। সেও গায়ে আগুন দিয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেছে।

শূন্যতাবোধ নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার ভীষণ যন্ত্রণা ব্যক্তিজীবনে বিমল কর নানা সময়ে অনুভব করেছিলেন। তাঁর গল্পে বিভিন্ন মানুষ সত্তার অন্তর্গত শূন্যতার যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়েছে। এই নিঃসীম শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে তারা মৃত্যুর আশ্রয় নিতে দ্বিধাহীন। জীবনে টিকে থাকার যন্ত্রণা ভোগ করার অনীহায় সে নিজেকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। কোনো মানুষ মানসিক শূন্যতাবোধে (Ennui) আক্রান্ত হলে সে জীবন-মৃত্যুর তফাত করতে ব্যর্থ হয়। জীবনের মধ্যে মরণের তীব্র ছায়া ঘনিয়ে আসে। বিমল করের 'সহচরী' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র নবীনের অস্তিত্ব শূন্যতায় ভরে ওঠে। বিদেশি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেও তার অন্তর্জগত অন্তঃসারহীন হয়ে পড়েছে। প্রেমিকা সরসী মৃত্যুরূপে ঘনিয়ে এসে নবীনের সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করতে উদ্যত। আত্মপরিচয়ের স্বরূপ নির্ধারণে সে নিজেই সংশয়ী —

> 'নিশ্চয় আজ আমি আমাতে নেই, সরসী আমাকে নবীনের
> পোশাক পরিয়ে রেখেছে; আসল নবীন কোথায় ?'[১৯]

অবচেতন মনে স্বপ্নের মধ্যে নবীন শারীরিক শূন্যতা ও মৃত্যুচেতনার যৌথতা অনুভব করে—

> 'আমার হাত পা নেই, নিম্নাঙ্গ কোথাও খুলে পড়ে আছে,
> গলার কণ্ঠনালী কাটা, বুকের কাছটা গর্ত মতন, হৃদপিণ্ড
> খোওয়া গেছে, মুখের দুপাটি মাড়ি খোলা, চোখ নেই...।'[২০]

আপন অস্তিত্বগত অস্থিরতা আমাদের মৃত্যুবোধে উদ্দীপ্ত করে। নিজের জীবন তখন মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে পড়ে। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দের মতে, হতাশার গভীরতা মানুষের মনোজগতে আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে আসে। বিমল করের 'আত্মজা' গল্পে বাবা হিমাংশু এক ভয়ংকর শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সন্তান পুতুলের সঙ্গে তার বাৎসল্য সম্পর্কের প্রতি স্ত্রী যূথিকার সন্দেহপ্রবণতা ও নিষ্ঠুর অভিযোগ হিমাংশুর ব্যক্তিসত্তাকে অন্তঃসারহীন করে দিয়েছে। মেয়ের প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসা স্ত্রীর

দৃষ্টিভঙ্গিতে এক অবৈধ সম্পর্ক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই মারাত্মক অভিযোগের প্রভাবে পুতুলের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে হিমাংশু নিজেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। শরীর ও মন দুই যেন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অস্তিত্বের অনিশ্চয়তায় সে নিজের কাছে নিজেকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থহীন হয়ে পড়ে বেঁচে থাকা —

> '...অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ,
> সংসার স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে
> গিয়ে পড়েছে। সেখানে কিছু কি আছে ? বাতাস, আলো ?
> কিচ্ছু না। শুধু সাপের কুণ্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর
> প্রতি পলকে শত সহস্র বিষাক্ত দংশন।'[২১]

ব্যক্তিসত্তার ভাবনার সঙ্গে সামাজিক সত্তার নিদারুণ দ্বন্দ্ব মানুষকে বিচলিত করে। নিঃসীম শূন্যতা অস্তিত্বকে গ্রাস করে। বিমল করে'র 'এ আবরণ' উপন্যাসে সব সম্পর্কের টান হারিয়ে বাঁশরীও শূন্যতা নিয়ে বাঁচতে চায় নি। দিদি সুধাকে সে অকপটে বলে—

> 'আমি নিজেকে জেনেছি। আমার মতো শূন্যতা নিয়ে বাঁচা
> যায় না।'[২২]

হিমাংশুর কাছেও জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আবিষ্কৃত হওয়া অবচেতনের পাপবোধকে অনুভব করে তার কাছে জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। অস্তিত্বের উথালপাতাল মৃত্যুবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। আত্মহত্যার মধ্যেই সে অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত হতে ব্যাকুল হয়েছে —

> 'মণিবন্ধের একটি শিরায় খুরটা জোর করে চেপে ধরল হিমাংশু।
> তারপর ছোট একটু টান। ছত্রিশ বছরের অমিত-তাপে তপ্ত
> একটি যৌবনের উষ্ণ শোণিত ফিনকি দিয়ে ছুটে এল। আঃ,
> কী টনটনে আরাম! কী শান্তি! যেন হু হু করে জ্বর ছেড়ে
> যাচ্ছে। আরো একটু দ্রুত মুক্তি চাই, দ্রুত। এবার ডান
> হাতের মণিবন্ধে গভীরভাবে খুরটা টেনে দেয় হিমাংশু।'[২৩]

'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গও আস্তিত্বিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে। মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব তার ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই নিজের শরীর সাদা হয়ে যাওয়ার

ব্যাধিকে হেমাঙ্গও নানাপ্রকার চিকিৎসার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এই অদ্ভুত রোগ দিনের পর দিন তাকে একাকীত্বে ঠেলে দিয়েছে। স্ত্রী পায়রা যেমন তাকে সহ্য করতে না পেরে ত্যাগ করেছে, তেমনি অফিস থেকে সে বিতাড়িত হয়েছে। সমাজও ক্রমশ তাকে একঘরে করেছে, পরিচিত মানুষের ঘৃণা-অবজ্ঞা-অবহেলার শিকার হয়েছে। এক সামগ্রিক ব্যর্থতার অবসাদে হেমাঙ্গ একাকী জীবনযাপনে নিজের মতো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল —

> 'মানুষ একে একে সবই সয়ে নেয়। হেমাঙ্গও নিয়েছিল।
> শান্তভাবে।'[২৪]

কিন্তু অনুতপ্ত পায়রার হঠাৎ আবির্ভাব তার অস্তিত্বকে অজস্র প্রশ্নে আলোড়িত করে দেয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রের মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে 'হতে চাওয়া'র চেতনা বর্তমান। হেমাঙ্গও স্ত্রী-সন্তান-চাকরি-ভালোবাসা সবকিছু নিয়ে সফল মানুষ হতে চেয়েছিল। কিন্তু শরীর তার মনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই পায়রার নতুন করে আগমন তার চেতনায় কোনো বিশ্বাসের জন্ম দেয় না। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সে সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। হেমাঙ্গের জীবনবোধে এই দ্বিচারিতা প্রশ্রয় পায় নি। তার সত্তা নিজেকে আশ্রয়হীন ভেবেছে। 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে তীর্থপতি জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। তেমনি জীবনের অপূর্ণতার সত্যকে হেমাঙ্গও মেনে নিয়েছে। জোর করে তার পূর্ণতার স্বাদ পেতে ইচ্ছা হয় নি। কেননা সুতীব্র হতাশাবোধে জীবন হয়ে গেছে অর্থহীন। অস্তিত্বগ্রাসী উৎকণ্ঠায় (Angst) হেমাঙ্গ আত্মহত্যার মধ্য দিয়েই মুক্তি খুঁজেছে —

> 'বোতলের ভাঙা কাচে গলার নালী কেটে হেমাঙ্গ মরেছে।
> তার সাদা শরীরে রক্তগুলো জমাট বেঁধে কেমন যেন
> দেখাচ্ছিল।'[২৫]

আত্মহত্যার অনুষঙ্গ বিমল করের গল্পে প্রায়শই উঠে এসেছে। 'শূন্য' গল্পে নিশীথের বোন আভা দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়ে আফিং খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। 'নরকের গতি' গল্পেও স্বামী মনোময়ের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে লক্ষ্মী কিংবা 'নীরজা' গল্পে পরমেশের স্ত্রীও আত্মহত্যা করেছে। 'হরিশের বিষাদ' গল্পে হরিশের মা, 'নেশা' গল্পে বিশ্বের বোন, 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে ইন্দুমাসি প্রত্যেকেই দুর্বিসহ জীবন

যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। বাঁচার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে 'দরজা' গল্পের পারুলের মতোই 'নেশা' গল্পে বিশ্ব আত্মহত্যার মরিয়া চেষ্টা করে। বিশ্বের অকপট বয়ান —

> 'বিষণগড়ে এসে আমার মনে হল আর আমি বাঁচবো না।
> একদিন যেন আর সহ্য করতে না পেরে মরতে গেলাম। মরা
> হল না।'[২৬]

বিমল করের কয়েকটি গল্পে মৃত্যু প্রসঙ্গে মানুষকে হত্যা করারও উল্লেখ রয়েছে। 'কাঁটালতা' গল্পে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকার বিষয়টি সহ্য করতে না পেরে রতীনকে হত্যা করে প্রশান্তের বাবা। 'অপহরণ' গল্পে আততায়ীদের দ্বারা উমাপ্রসাদের মৃত্যুও কাহিনিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। তবে, এই হত্যার প্রসঙ্গগুলি কাহিনিবিন্যাসকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

মানবজীবনে মৃত্যুকে বিমল কর নিয়তি রূপেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। খণ্ডকালের মানবজীবনে মৃত্যু এক অনিবার্য নিয়তি রূপে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। জীবনে চলার পথে এই মৃত্যুকে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষণ করতে মানুষ বাধ্য হয়। মৃত্যু স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধিতে মানুষকে বাধ্য করে। 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' গল্পে কথককে প্রিয়জন অশোকার মৃত্যু দেখাতে যেন জীবন বদ্ধপরিকর। কথকের ভাবনায় তারই প্রতিধ্বনি –

> 'আমি জানি ওর মৃত্যু আমি দেখব। এ আমার নিয়তি।'[২৭]

নিয়তির মতো মৃত্যুর অমোঘতা বিমল কর 'নিষাদ' গল্পে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। পোষ্য ছাগল মানিকের রেললাইনের ধারে হঠাৎ মৃত্যু জলকু মেনে নিতে পারে না। আততায়ীকে চিনতে না পেরে তীব্র আক্রোশে সে মৃত্যুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং রেল লাইনের দিকে উন্মত্তের মতো পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার নিজস্ব জেহাদ ঘোষণা করে। কিন্তু মৃত্যু যে তাকে নিঃশব্দে গ্রাস করতে চলেছে তার সম্পর্কে ধারণাই করতে পারে না। এই গল্পের সূচনা অংশ থেকেই এক নৈর্ব্যক্তিক হুঁশিয়ারি ধ্বনিত হয়েছে—

> 'ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত
> আজ ...কিংবা কাল...।'[২৮]

মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের এই লড়াই অন্তহীন। গ্রিক ভাবনার Nemesis এর মতো

আমরা সবাই মৃত্যুর কাছে অসহায়। মৃত্যু যেন ফাঁদ পেতে অব্যর্থ লক্ষ্যে মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। 'অসময়' উপন্যাসে বিমল কর মৃত্যুর এই শিকারীসত্তাকে শচিপতির ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। শচিপতির তাৎপর্যময় উক্তি —

> 'ভাবি, আমার আশেপাশে কোথায় যেন একজন ছিপ হাতে
> দাঁড়িয়ে আছে, তার বঁড়শি আমি গিলে ফেলেছি।'[২৯]

কিন্তু জলকুর শিশুমন মৃত্যুর চক্রব্যূহকে বুঝতে পারে না। মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে জারি আছে তার প্রতিবাদ। কথকের ভাষ্যে —

> 'মনে হল, জলকু পাথর ছুঁড়ছে। পরিচ্ছন্ন অথচ হৃদয়হীন
> এক ষড়যন্ত্র এবং অনেক সবল কঠিন নির্মমতার বিরুদ্ধে সে
> বোকার মতন তার ছোট পলকা হাতে শুধু পাথরই ছুঁড়ছে
> ব্যর্থ আক্রোশে।'[৩০]

এ গল্পের প্রসঙ্গে গল্পকারের মন্তব্য লক্ষণীয় —

> ' 'নিষাদ' গল্পের জলকুও যেন ছাগলছানার মৃত্যুর প্রতিশোধ
> নিতে মারমুখী হয়ে রেললাইনের দিকে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে
> এগিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুর খুব কাছে।'[৩১]

মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিপ্রতীপে অপরসত্তা হিসেবে মৃত্যু চরিত্র হয়ে বিমল করের লেখনীতে প্রতিভাত হয়েছে। 'উদ্বেগ' গল্পে মড়ক হিসেবে মৃত্যু যেন জিঘাংসায় ঘুরে বেড়িয়েছে। একটু অসতর্ক হলেই তার হাতে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। শিশিরের ভাবনায় মৃত্যুর এই স্বরূপ ধরা পড়েছে —

> 'মড়কটা সিঁদ কাঠি হাতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসতর্ক
> হলে অবধারিত মৃত্যু।'[৩২]

'অপেক্ষা' গল্পেও শিবতোষের জীবনে মৃত্যু এক ব্যক্তি চরিত্র হয়ে বারে বারে তাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে। চিঠির মাধ্যমে মৃত্যুই যেন অজানা অথচ অবধারিত বার্তা রেখে গেছে। শিবতোষ ও অনামা-অজানা ব্যক্তির আড়ালে গল্পকার জীবন-মৃত্যুর লুকোচুরি খেলাকে পাঠকের কাছে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর নিঃশব্দ উপস্থিতি সে বুঝতে পারে কিন্তু তাকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় শিবতোষ। মৃত্যুর চিঠি খুঁজে না পেয়ে ও মৃত্যুকে ধরতে না পেরে সে আত্মভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ে—

'অলৌকিক কাহিনী অশরীরী মানুষের মতন ওই মানুষটি
আসে যায়। ওর আসা অনুভব করা যায়, দেখা যায় না, বলা
যায় না। মনের ভুল দিয়ে সে আসে কি ? হয়ত আসে না।
শিবতোষ বুঝতে পারল না, আবার কবে সে আসবে ?
সে কে ? সে কেমন ?'[৩৩]

'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোরের ব্যক্তিসত্তা অবচেতন মনে অপর সত্তারূপে মৃত্যুর দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে। 'মহারাজ' নামে মৃত্যু এমন এক চরিত্র হয়ে উঠেছে, যা গল্পের নন্দকিশোরের পাশাপাশি পাঠক-পাঠিকাদের চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। গল্পকার বিমল করের শৈল্পিক দক্ষতায় জীবন-মৃত্যুর এক অনন্যসাধারণ দ্বিরালাপ অনুভব করা গেছে। জীবনসংলগ্ন মৃত্যুর পরিচয় সম্পর্কে নন্দকিশোর কৌতূহলী হলেও মৃত্যুরূপী মহারাজ তার অস্তিত্বের অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করেছে—

'নাম একটা আছে। তা নাম জেনে কী করবে ? বললাম
তো, আমি তোমাদের পাশাপাশি আছে। আমাকে তুমি
দেখেছ। অনেকবার।'[৩৪]

মৃত্যুকে এড়ানো অসম্ভব জেনে সে শর্তসাপেক্ষে জলের মধ্যে থেকে বাঁচতে চেয়েছে। একইসঙ্গে পারস্পরিক কথনে মহারাজ সম্ভাষণে চিহ্নিত মৃত্যুর স্বরূপ অন্বেষণে উদ্যোগী হয়েছে—

'ফেউয়ের মতন যে-লোকটা, সে মৃত্যুই হোক, অথবা মহারাজ,
কিংবা ধর্মরাজ—সে কোথায় ?'[৩৫]

গীতার ভাষ্য অনুযায়ী, মানুষের পঞ্চভূতাত্মক দেহমাত্রই মরণস্বভাব সম্পন্ন। 'অস্তিত্বশীল' হওয়ায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে মৃত্যুবোধ সক্রিয়। অস্তিত্ববাদী ভাবনায়, মানবজীবনের চরম সম্ভাবনা হল মৃত্যু। মৃত্যুতেই অস্তিত্বের পূর্ণ ও সার্থক পরিণতি সম্ভব। তবুও মানুষ সবসময় এই মৃত্যুর চূড়ান্ত ক্ষণকে বারে বারে অস্বীকার করতে চেয়েছে। নন্দকিশোর মৃত্যুর কাছে সহজে ধরা দেয়নি, সুধাময় মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছে। আবার 'যযাতি' গল্পে অফুরন্ত জীবনতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ নীলকণ্ঠ মরণকে তীব্রভাবে অবজ্ঞা করেছে–

'মরণ-মরণ, তার জন্যে এত হই হই করার কী আছে! ধুলোয়
গড়াগড়ি দেবার লুটোপুটি খাওয়ার কী মানে!'[৩৬]

শাশ্বত জীবনপ্রবাহে চরম সত্য হল মৃত্যু। মৃত্যুবোধ আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-অবিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এই মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চাইলেও এড়ানো যায় না। বরং মৃত্যুর আবহে থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে মানুষ এগিয়ে চলে। জীবনের এই সত্য বিমল করে'র 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে তীর্থপতির ভাবনায় প্রতিফলিত —

'তীর্থপতির আজ আর সন্দেহ নেই, জীবনের প্রথম কোষ
গঠন থেকে মৃত্যু সবসময় জীবনকে দাবি করেছে। আমরা
প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতে পায়ে ধরে আয়ু ধার করে চলেছি।'[৩৭]

'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দকিশোরও জানে যে মৃত্যুর ফাঁদে তাকে অসহায়ভাবে বাঁধা পড়তেই হবে —

'নন্দকিশোর বোকা নয়; সে জানে শেষ পর্যন্ত, কোনো জীবই
মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না।'[৩৮]

মৃত্যুর এই ধ্রুবসত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করাই মানবজীবনের ধর্ম। নিজের অজান্তেই অন্তিম পরিণতির দিকে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনমশায়ের ভাবনায় এই সত্য বিধৃত করেছেন—

'মানুষের জীবনে মৃত্যু ধ্রুব, জন্মের মুহূর্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণেই
সে তার দিকে চলে; মৃত্যু থাকে স্থির, হঠাৎ একদিন রিপুর
হাত দিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; তখন মৃত্যুও তার দিকে
এগিয়ে আসে।'[৩৯]

এই মৃত্যুই অনেক সময় মানুষের কাছে তাদের যাপিত জীবনকে নতুন করে উন্মোচিত করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে বা অন্যকেও যথাযথভাবে জানতে-বুঝতে পারে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে শিবানীর জ্বলন্ত চিতার সামনে তিন প্রেমিক শিশির-অনাদি-কমলেন্দু নিজেদের স্বার্থপরতা-ভণ্ডামিকে অনুভব করতে পেরেছে। তারা তিন জনেই জীবনের বিভিন্ন পর্বে শিবানীকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আজ শিবানীর মৃত্যু বিগত যৌবন তিন পুরুষকে আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত করেছে। আবার 'জননী' গল্পে মায়ের মৃত্যুবেদীর উপর বসে পাঁচ সন্তান অকপটে

মায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আলোছায়া দিকগুলি ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মৃত্যু এখানে পাঁচ সন্তানকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে সম্পর্কের সত্যতাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। পাঁচ জনেই দোষ-গুণে মিলে মা'কে নতুন করে অনুভব করেছে। মায়ের জীবনের ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতা-সীমাবদ্ধতার অজানা কথা উঠে এসেছে। 'নরকে গতি' গল্পে শিক্ষিত-হৃদয়বান-স্পষ্টবক্তা হিসেবে সমাজে পরিচিত মনোময়ের প্রকৃত স্বরূপ মৃত্যুর পরেই শরদিন্দুর মাধ্যমে ধরা পড়েছে। স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, নিজের পুত্রবধূর প্রতি অশালীন ব্যবহার, পেশাগত জীবনে স্বার্থপরতায় মনোময়ের প্রতি ধারণা বদলে যায়। মনোময় সম্পর্কে শরদিন্দুর ভাবনা যথার্থ —

> 'মানুষ হল অদ্ভুত জিনিস। তার বাইরের দিকে যে ছালটা চাপানো থাকে—তা দিয়ে আমরা বিচার করি। তার মুখের ওপর এমন এক মুখোশ আঁটা থাকে—যা আমরা চোখে ধরতে পারি না। তুমি আমি যা দেখছি আসলে হয়ত সে তা নয়।'[৪০]

মৃত্যু অনেক সময় আমাদের জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুঘটক হয়ে ওঠে। 'আমরা' গল্পে স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের প্রতি রথীনের নীরব ভালোবাসা অনুভব করতে পারে বিধুভূষণের স্ত্রী; কিংবা 'অনাবৃত'তে স্বামী ধরিত্রীকুমারের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ইন্দু নিজের জীবনে আশা-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা বয়সে ছোটো রাজাকে ভালোবেসে-সাহচর্যে পেয়ে যায়। আবার 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে বরফসাহেবের হঠাৎ মৃত্যু মেয়ে জিনির জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে। 'জলজ' গল্পে মা-বাবার মৃত্যুর পর রন্টুর প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছে জলজ। 'দূরে বৃষ্টি' গল্পের কথকের বয়ানে তারই অনুরণন—

> '...আমি বলছি, জীবনের তলায়, অনেক তলায়, মানুষের হয়ত এমন কোনো কথা থাকে যা মৃত্যুর পরই বলা যায়।'[৪১]

আবার, মানুষ মনে করে পাপের পথ ধরেই মৃত্যু আসে। পাপ প্রসঙ্গে একাধিক মৃত্যু বিমল করের গল্পে দেখা গেছে। 'রামচরিত' গল্পে ভুল কৃতকর্মের জন্য যেমন পরিতোষের বাবা পাপগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তেমনি 'হরিশের বিষাদ' গল্পে হরিশের মায়ের পাপ তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর

মানুষের জীবনে আর পাপের প্রভাব থাকে না। তাই 'আঙুরলতা' গল্পে স্বামী নন্দ অন্যায়-প্রবঞ্চনা করলেও আঙুরলতা তার পাপকর্মকে উপেক্ষা করে। বরং শুচিশুদ্ধ হয়ে সে স্বামীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়। 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে ইন্দ্র মৃত্যুর পরে মানবশরীরে পাপের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেনি—

'শিশু বয়সের দেহে আর মৃত মানুষের দেহটিতেই শুধু
পাপ থাকে না, কেননা তাতে তার নিজের জীবনটি নেই।'[৪২]

বিমল করের ভাবনায়, মানবজীবনে মৃত্যু একটি যাত্রার মতো। প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর পর কোনো অজানা এক গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় রণিত হয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষা —

'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি।'[৪৩]

ব্যক্তিগতভাবে গল্পকার নিজেও মৃত্যুর পরই সব ফুরিয়ে যাওয়াকে বিশ্বাস করেন নি। বরং মৃত্যুর পরের এক অনির্দেশ্য যাত্রাপথকে কল্পনা করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

'মৃত্যুর পরের সেই যাত্রা এ লঙ্ জার্নি।'[৪৪]

এই কল্পিত শেষ যাত্রার দার্শনিক ছবি 'জননী' গল্পে উঠে এসেছে। 'জননী' গল্পের কাহিনি অনুসারে রাঁচি সংলগ্ন অঞ্চলে মুণ্ডা বা মুঙরীদের অখ্যাত গ্রামে মাটির ঘরের বাইরের দেওয়ালে আঁকা একটি ছবিতে এই যাত্রার প্রসঙ্গ উন্মোচিত হয়েছে। পরিবারের মৃত ছেলেকে পিপাসার জল, খাবার ইত্যাদি সহ ঘোড়ার পিঠে সওয়ারী হিসেবে চিত্রিত করেছে বাড়ির আত্মীয়স্বজন। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের নিজস্ব বিশ্বাস গল্পের চরিত্র মেজভাই দীনেন্দ্রের বয়ানে পরিস্ফুট—

'...ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে
একা একা অনেক দূর যেতে হবে। তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে
ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটুলিতে বোধ হয় চিঁড়েগুড়,
আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।'[৪৫]

কেবলমাত্র এই প্রাচীন অধিবাসী সম্প্রদায়ই নয়, সনাতন হিন্দু ধর্মেও বৈতরণী নদী পার হয়ে স্বর্গে যাওয়ার উল্লেখ আছে। গ্রিক পুরাণের ভাবনা অনুযায়ী মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা স্টিক্স নদী পার হয়ে যাত্রা করে। 'জননী' গল্পে পাঁচ সন্তানও মনে

করেছিল যে, তাদের জননী মৃত্যুর পর এক অজানা যাত্রায় অগ্রসর হয়েছে। এই যাত্রা হল মর্ত্যের থেকে স্বর্গে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী পথ। জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণতা নিয়েই সে এগিয়ে চলে। মেজভাই দীনেন্দ্র এই পথকে নির্দিষ্ট করে বুঝিয়েছে—

> 'স্বর্গ তো শেষ কল্পনা। আমি এই মর্ত্যের পর স্বর্গের আগে যে পথ তার কথা বলছি।'[৪৬]

মায়ের এই পথ চলাকে সুন্দর পরিপূর্ণ করে তুলতে পাঁচ ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই সচেষ্ট হয়েছে। আপন আপন বোধ অনুযায়ী তারা প্রত্যেকে মায়ের ব্যক্তিগত জীবনে অপ্রাপ্ত সাহস-ভরসা-স্বার্থত্যাগ-হৃদয়বোধ দিতে চেয়েছে। মায়ের চলার পথ মসৃণ করে তুলতে এগুলি পাথেয় হিসেবে তুলে দিতে চেয়েছে সন্তানরা। তাদের একান্ত ইচ্ছা —

> 'সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।'[৪৭]

'নরকে গতি' গল্পে এক অনামা পাগল মনোময়ের মৃত্যুর পর তার গতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছে। ভদ্র-হৃদয়বান-রুচিবান রূপের আড়ালে স্বার্থপর–নীতিহীন মনোময়ের মৃত্যুর পর যাত্রার পরিণতি কী হবে, তা তার বন্ধুদের কাছে অবোধ্য হয়ে থাকে। স্বর্গ-নরকের স্বরূপ না জেনেও মানুষ প্রতি মুহূর্তে স্বর্গ-নরক সম্পর্কে নিজের মনোমত ধারণা তৈরি করে নেয়। স্বর্গ-নরকের মধ্যবর্তী পথও যেমন আমরা জানি না, তেমনি স্বর্গ বা নরক সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ। শরদিন্দু'র বক্তব্য লক্ষণীয়—

> 'যদি আমায় বলো, আমি বলব, ইহকালের পরিচয়ই মানুষের পরিচয়, স্বর্গে তার পরিচয় থাকে না। আর নরকে তার কী পরিচয় থাকে আমি জানি না।'[৪৮]

স্বর্গ-মর্ত্য-নরকের মরীচিকাময় ভাবনা থাকলেও মানবজীবন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাত্রা করে চলেছে। এই পৃথিবীতে মৃত্যুই হল পরম সত্য। বিমল করের 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে সুরেশ্বর যথার্থই অনুধাবন করেছে যে, মৃত্যুর দিকে যাত্রাপথে সব মানুষকেই পথিক হতে হয়। তার গভীরতর ভাবনা—

> 'আকাশ ও পৃথিবী মানুষের শবাধার।...সমস্ত জীব আমার শবযাত্রার সঙ্গী। মৃত্যুর কাছে সকলেই আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।'[৪৯]

এই অনিবার্য মৃত্যুর স্বরূপ সকলের কাছে অজ্ঞেয়। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু রহস্যময়। ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত আছে: "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ...." অর্থাৎ জন্ম নিলে মৃত্যু নিশ্চিত। গল্পকারও এই সত্যকে অস্বীকার করেন নি। 'বন্ধুর জন্য ভূমিকা' গল্পে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি বসুধার মায়ের ভাবনাতেও দেখা যায়—

> 'বসুধা বলত: মা পরকালও বিশ্বাস করে না। একমাত্র মৃত্যুকেই বিশ্বাস করে।'[৫০]

কিন্তু বেশিরভাগ সময় মানুষ মৃত্যুকে ভয়ংকর রূপে কল্পনা করেছে। 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে মৃত্যুর রূপকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে তীর্থপতি —

> 'মৃত্যুর রূপ নেই। তীর্থপতি দেখতে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, সে-রূপ বোধহয় এই অন্ধকারের মতন, গাঢ় ঘন নিকষ কালো—শূন্য থেকে শূন্যে বাতাসের পর অন্য বাতাসে বিস্তৃত, পারাপার-হীন।'[৫১]

মৃত্যুর এই কল্পিত রূপকে মানুষের কাছে বরাবরই ভয়ংকর মনে হয়েছে। 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোর মৃত্যুর আগ্রাসনকে কখনোই মেনে নিতে পারে নি। 'মহারাজ'রূপী মৃত্যুর প্রতি সে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনেছে—

> 'সংসারে তুমি হলে সবচেয়ে নিষ্ঠুর। তুমি সময়, অসময়, বয়েস, অবস্থা, সুখ-দুঃখ কিছুই গ্রাহ্য করো না। ভালোবাসার কথা তোমার মুখে মানায় না মহারাজ।'[৫২]

তাই এই মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে নন্দকিশোর বারে বারে পালাতে চেয়েছে। মৃত্যুর সংহারী রূপ মানুষকে তাড়া করছে আর প্রাণভয়ে মানুষ আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলেছে—

> 'মৃত্যু যেন দু-হাত বাড়িয়ে উন্মাদিনীর মতো ভয়ঙ্করী মূর্তিতে তাড়া করে ছুটেছে; মানুষ পালাচ্ছে; আগুন লাগা বনের পশুর মতো দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে।'[৫৩]

মৃত্যুতে বিলীন হতে হবে জেনেও মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে কুণ্ঠাহীন। মৃত্যুশাসিত জীবনে মানুষের এই সংগ্রামকে বিমল কর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর মননঋদ্ধ মন্তব্য —

> 'মানুষ আমার গল্পে hero—মানুষ মৃত্যু অবধারিত জেনেও

তার বিরুদ্ধে যুঝছে—লড়াইটাই হচ্ছে 'পুরুষকার'—
'মানবোচিত'–'নায়কোচিত'।[৫৪]

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিমল করের গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দেখা গেছে। জীবনের যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতাগুলি 'শূন্য' গল্পে নিশীথকে বিব্রত করেছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথগুলি সে খুঁজে পেতে চেয়েছে। কিন্তু কখনোই মৃত্যুবোধ তাকে গ্রাস করতে পারেনি। নিশীথের বক্তব্য লক্ষণীয়—

'আমি পাগল হয়ে যাই, কি মরে যাই–এ আমি চাইনি।
বাঁচতেই চেয়েছি আমি।'[৫৫]

'আঙুরলতা' গল্পে নন্দের মৃত্যুতে আঙুরলতাও বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এক অসহনীয় পাপবোধে সেও নন্দের চিতার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্লানিমুক্ত হতে চায়। শেষ মুহূর্তে সে মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনকে আঁকড়ে ধরে—

'না, আঙুর মরবে না।....যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি,
মানুষ, জন–সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না,
কাঁদবে না ।'[৫৬]

বিমল করের সৃজনশীল সত্তা সর্বদাই মৃত্যুবোধ থেকে জীবনবোধে উত্তরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের মধ্যে মৃত্যুমুখী অনুভবকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মৃত্যুবোধকে সঙ্গে নিয়েই তিনি জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব ভাষ্য—

'আসলে মৃত্যুচিন্তা আমাকে দীর্ঘকাল অধিকার করেছিল।....এ
নিয়ে আমি অনেক গল্প লিখি....আসলে কী হয় জানো,
মৃত্যু নিয়ে–শুধু মৃত্যু কেন, যে-কোনও বিষয় যখন তোমাকে
হন্ট করে তখন সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় তুমি
সেটাকে পেরিয়ে যেতে চাও, যাকে আমরা উত্তরণ বলি।
আমিও একসময় মৃত্যুকে পেরোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।'[৫৭]

মহাভারতের বনপর্বে এক ধর্মবক যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আশ্চর্য কী ?' উত্তরে যুধিষ্ঠিরের দার্শনিক উত্তর ছিল—

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছতি যমমন্দিরম্।
শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।।'[৫৮]

অর্থাৎ প্রাণীগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্যের কী আছে!

ক্ষণস্থায়ী জীবনে প্রতিটি মানুষ মৃত্যুকে নিয়তি রূপে মেনেও জীবনের পরিসরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মৃত্যুকে উত্তরণের জন্য মৃত্যুকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কঠোপনিষদে দেখা গেছে মৃত্যুরহস্য উন্মোচন করতে নচিকেতা যমলোকে যাত্রা করেছে। যমরাজের সঙ্গে দার্শনিক তর্ক করে নচিকেতা তৃতীয় বর অর্জন করে তার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জানতে উৎসুক হয়েছিলেন। বিমল করের 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোর ও 'মহারাজ' নামী মৃত্যু একে অপরের সঙ্গে জীবনজিজ্ঞাসার তর্কে মেতে উঠেছে। মহারাজের সঙ্গে কথোপকথনে নন্দকিশোর মৃত্যুকে বিভিন্ন প্রসঙ্গের মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর সঙ্গে নন্দকিশোরের দ্বিমুখী ভাষ্যের ভাবনা গল্পকার উপনিষদ ও মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য —

> 'মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের যে তর্ক–এই ভাবনাটা আমি নিয়েছি উপনিষদ থেকে। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে সাবিত্রী এখানে যমরাজের সঙ্গে রীতিমত তর্ক করছে! ওটা আমাকে ভীষণভাবে impress করেছে।'[৫৯]

মানবজীবনে মৃত্যুকে গ্রহণ করার দার্শনিকবোধ মানুষের একান্ত জরুরি বলে বিমল কর মনে করেছিলেন। প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিবোধে মৃত্যুকে উপলব্ধি করে। মৃত্যু থাকবেই, কিন্তু সেই মৃত্যুর উপস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করে জীবনে বেঁচে থাকাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। গল্পকারের মৌলিক ভাবনা পাঠক-পাঠিকাদের ঋদ্ধ করে–

> 'মৃত্যুকে কিভাবে মানুষ গ্রহণ করছে। সে জানে আমি চলে যাব, থাকব না, আসলে মৃত্যুটা জেনে যখন মানুষ সবকিছু করে...শেষ পর্যন্ত তুমি কিন্তু হেরেই যাচ্ছ মৃত্যুর কাছে। কিন্তু আমার মনে হয় ultimate তুমি জিতেই যাচ্ছ। অল্প বয়সে যখন মৃত্যু ঘটে ভাবি এ অদ্ভুত ধরনের নিষ্ঠুরতা। আবার মৃত্যু আছে জেনেও তো মানুষ সবকিছু করছে।'[৬০]

মৃত্যুশোকে মানুষ জীবনকে খণ্ডিতভাবে উপলব্ধি করে। সমস্ত জীবন ধরেই যেন মরণের প্রস্তুতি চলে। ব্যক্তিদেহ ধ্বংস হয়, কিন্তু প্রাণধারা অব্যাহত থাকে। প্রাণের নিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্নরূপে মৃত্যুকে দেখলে মানুষ তাকে ভয়ংকর বলে মনে করবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাবনা অনুযায়ী, অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত হয়ে জীবনের অমৃত স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মৃত্যুচেতনার এই সামগ্রিকতাবোধকে বিমল কর 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের পিতার মৃত্যুসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত করেছেন। মা পুণ্যময়ীর বয়ানে সুধাময়ের বাবার ভাবনা উঠে এসেছে —

> 'স্বামী তাঁর মৃত্যুবিলাসী ছিলেন না, পুণ্যময়ী জানতেন, কিন্তু যে বিশ্বচরাচরকে তিনি ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন–হয়ত সেই অখণ্ড জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াকে তিনি মৃত্যু বলে ভাবেন নি।'[৬১]

রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের 'The Death of Ivan Ilych' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইভান ইলিচ জীবনে ব্যাধি-যন্ত্রণা ও মৃত্যুভয় ভোগ করে শেষ লগ্নে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করে অপরিসীম শান্তি লাভ করেছে। তাঁর অন্তর্লোক মৃত্যুকে এক আলো হিসেবে দেখেছে —

> 'He sought his former accustomed fear of death and did not find it. "Where is it? What death?" There was no fear because there was no death.
> In place of death there was light.'[৬২]

বিমল করের মৃত্যুচেতনায় সর্বদাই জীবন-মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি জানেন, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। বরং মৃত্যুকে সহজভাবে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে জীবনে বেঁচে থাকতে হবে। জীবন-মৃত্যুর এই খেলা চলবে অবিরাম। 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোরের ভাষ্যে তারই সংরেশ—

> 'আমি তোমার হাত থেকে পিছলে যাবার চেষ্টা করছি, তুমি আমায় ধরবার চেষ্টা করছ। জীবন আর মৃত্যুর এই খেলাটা আমাকে খেলতেই হবে।'[৬৩]

তাঁর মৃত্যুভাবনা সমান্তরালভাবে জীবনবোধের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুর

প্রতিফলকেই তিনি জীবনকে পূর্ণভাবে পেতে চেয়েছেন। বিমল করের গল্পে মৃত্যুসম্পর্কীয় আলোচনা সম্পর্কে সমালোচকের যথার্থ বিশ্লেষণ—

> 'বিমল করের গল্প পাঠককে বারে বারে সচেতন করে দেয়
> জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাকে দেখতে হবে
> মৃত্যুর পটভূমিতে।'[৬৪]

বিমল করের বিভিন্ন গল্পের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এক গভীর দার্শনিকতাবোধে তাঁর মৃত্যুচেতনা ঋদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন ও সামাজিক জীবনের আবশ্যিক প্রভাবে গড়ে ওঠা তাঁর মৃত্যুবোধ প্রাণপ্রবাহের বিচিত্র উপলব্ধিতে নির্মিত। বিভিন্ন গল্পে যে মৃত্যুবোধ বা মৃত্যুদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা একইসঙ্গে বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক। বিমল করে'র গল্পে প্রতিফলিত মৃত্যুচেতনা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন দর্শনকে পুনর্নির্মাণে প্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র :

১. 'উড়োখই'(১) : বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৮; পৃ. ১৩

২. 'প্রস্তাবনা' : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১৯৭৩,

৩. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২; পৃ. ২৬

৪. 'প্রস্তাবনা' : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; তদেব

৫. তদেব

৬. 'বিমল করের দুপুর বিকেল': সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; 'দেশ'; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫; পৃ. ১১৯

৭. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ২৫৬

৮. 'উদ্বেগ'; তদেব; পৃ. ৩২০

৯. তদেব; পৃ. ৩১২

১০. 'অশ্বত্থ'; তদেব; পৃ. ২১০

১১. 'অতঃপর': বিমল কর; 'দেশ' শারদীয়; ১৪০০; পৃ. ৫২৪

১২. 'আরোগ্য নিকেতন': তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশ ভবন; শ্রাবণ, ১৪১৫; পৃ. ৩১২

১৩. 'অপেক্ষা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই, ২০০৫; পৃ. ৩৩৭

১৪. 'ফানুসের আয়ু': বিমল কর; উপন্যাস সমগ্র (৪); আনন্দ; ১ম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ২০০১; পৃ. ৯৯

১৫. 'অপেক্ষা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; ৪র্থ মুদ্রণ; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ৩৩৭

১৬. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য: সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯; পৃ. ৩৮৫

১৭. 'একটি গল্পের খসড়া': বিমল কর; 'উল্টোরথ', নববর্ষ সংখ্যা; ১৯৬৩

১৮. 'আরোগ্য নিকেতন': তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশ ভবন; শ্রাবণ, ১৪১৫; পৃ. ৬২

১৯. 'সহচরী': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; ৪র্থ মুদ্রণ; জুলাই ২০০৫; পৃ. ৪৮৫

২০. তদেব; পৃ. ৪৮৯

২১. 'আত্মজা'; তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮

২২. 'এ আবরণ': বিমল কর; উপন্যাস সমগ্র (৩); আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ২০০০; পৃ. ৫৪৯

২৩. 'আত্মজা'; তদেব; পৃ. ১০৯

২৪. 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি'; তদেব; পৃ. ৬৪০

২৫. তদেব; পৃ. ৬৪৯

২৬. 'নেশা': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ: ২৮

২৭. 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই ২০০৫; পৃ. ৪২৮

২৮. 'নিষাদ'; তদেব; পৃ. ২৮৩

২৯. 'অসময়': বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; ফাল্গুন, ১৪১৫; পৃ. ৫৬

৩০. 'নিষাদ'; তদেব; পৃ. ২৯০

৩১. মুখোমুখি বিমল কর: সৃষ্টির অলৌকিক মুহূর্তগুলি; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা; বইমেলা ২০০৩; পৃ. ৪৪

৩২. 'উদ্বেগ'; তদেব; পৃ. ৩১৩

৩৩. 'অপেক্ষা'; তদেব; পৃ. ৩৩৬

৩৪. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'; তদেব; পৃ. ৭১২

৩৫. তদেব; পৃ. ৭১৬

৩৬. 'যযাতি'; তদেব; পৃ. ২৩৩

৩৭. 'ফানুসের আয়ু'; তদেব; পৃ. ৯৯

৩৮. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'; তদেব; পৃ. ৭১৬

৩৯. 'আরোগ্য নিকেতন'; তদেব; পৃ. ১৭৩

৪০. 'নরকে গতি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ৭৪

৪১. 'দূরে বৃষ্টি'; তদেব; পৃ. ৬০০

৪২. 'ফুটেছে কুসুমকলি': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ৯৫

৪৩. 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি' : শক্তি চট্টোপাধ্যায়; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ২০০৪; পৃ. ১১২

৪৪. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; তদেব; পৃ. ৩৭৯

৪৫. 'জননী'; তদেব; পৃ. ৩০৪

৪৬. 'জননী'; তদেব; পৃ. ৩০৩

৪৭. 'জননী'; তদেব, পৃ. ৩১০

৪৮. 'নরকে গতি'; তদেব; পৃ. ৭৭

৪৯. 'পূর্ণ-অপূর্ণ': বিমল কর; উপন্যাস সমগ্র (২) আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯; পৃ. ২১৯

৫০. 'বন্ধুর জন্য ভূমিকা' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩৭৩

৫১. 'ফানুসের আয়ু'; তদেব; পৃ. ৯৯

৫২. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৭২৫

৫৩. 'আরোগ্য নিকেতন'; তদেব; পৃ. ২৯৪

৫৪. মুখোমুখি বিমল কর : সৃষ্টির অলৌকিক মুহূর্তগুলি; তদেব; পৃ. ৪২

৫৫. 'শূন্য' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৬৬

৫৬. 'আঙুরলতা'; তদেব; পৃ. ২২৯

৫৭. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত বিমল করের সাক্ষাৎকার; 'দেশ', ৩রা নভেম্বর, ১৯৯০

৫৮. ব্যাসদেব রচিত মহাভারত; বনপর্ব

৫৯. মুখোমুখি বিমল কর: সৃষ্টির অলৌকিক মুহূর্তগুলি; তদেব; পৃ. ৪২

৬০. বিমল করের সাক্ষাৎকার; 'নহবৎ' পত্রিকা; ত্রিংশতি বর্ষ; ১৪০০; পৃ. ৩c

৬১. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৫৬

৬২. 'The Death of Ivan Ilych' : Leo Talstoy; Selected Stories. PROJAPATI; 2010; p.133

৬৩. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'; তদেব; পৃ. ৭২১

৬৪. 'বিমল করের গল্পে জীবন ও মৃত্যু': অসিত ভট্টাচার্য; 'তীব্র কুঠার' পত্রিকা : বইমেলা, ২০০৩; পৃ. ৩৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপচিত্রণ

মানবজীবনে সবচেয়ে রহস্যময় হল মনোজগত। চেনা হয়েও মানুষের কাছে নিজের মন যেন অচেনা, জানা হয়েও আপনজনের মন রয়ে যায় অজানা। মনের গূঢ় রহস্যের গহনতা-পরিধির সন্ধানে বারে বারে কৌতূহলী হয়েছে মানুষ। দর্শন-শিল্প-বিজ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে অজস্র তথ্য, নানা তত্ত্বের মাধ্যমে মনের স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত সকলে। সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব ব্যতিরেকে সে প্রচেষ্টা আজও ক্লান্তিহীন। তবে মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসমূহ সবথেকে বেশি শিল্পিতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সাহিত্যের আঙিনায়। সূক্ষ্ম অনুভবে, নান্দনিক বয়ানে সাহিত্যের মাধ্যমেই যুগে যুগে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের অন্তর্জগতের বিচিত্র উদ্ভাসন।

গল্পকার বিমল কর মানুষের ভেতরের জগতের আলো-ছায়ার রহস্যময়তাকে বিবিধ মাত্রায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন বারে বারে। মানবজীবনের নানামুখী চলমানতায় মনোজগতের অদৃশ্য টানাপোড়েনের প্রভাব ভাষায়িত হয়েছে তাঁর গল্পসমূহে। কেবলমাত্র বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবতায় মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করা নয়, বরং অন্তর্জগতের নিগূঢ় সত্যতায় মানুষের বেঁচে থাকার স্পন্দমানতাকে অনুভব করতে চেয়েছেন বিমল কর। স্বীয় সাহিত্যিক-সত্তার বিশ্লেষণে তাঁর মন্তব্য—

'আমি মূলত ইন্ট্রোভার্ট লেখক.....।'[১]

অন্তর্মুখী স্বভাবের এই লেখক বহির্জগত বা সামাজিক বাস্তবতাকে কখনোই অগ্রাহ্য করেন নি; প্রকৃতপক্ষে মানুষের বহির্জাগতিক সত্তার প্রতিফলনের ক্ষেত্রে অদৃশ্য অন্তর্জগতের তীব্র সক্রিয়তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তাই বাইরের জগতের অপেক্ষা ভেতরের জগতকে অনুভব করার প্রচেষ্টা দেখা যায় তাঁর একাধিক গল্পে। মানুষের জীবনের ভেতরের অদৃশ্যতা বাইরের দৃশ্যমান জগতের সমান্তরালে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। অন্তর জগতের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তীব্র কৌতূহল। গতানুগতিক চেনা ছকের হিসেবের বাইরে মনের এই জগতের বিচরণ। স্মৃতিকথায় গল্পকারের সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ—

'জীবনের একটি বাইরের চেহারা আছে। অন্যটি হল তার ভেতরের চেহারা....জীবনের ভেতরের চেহারাটি কিন্তু অন্যরকম। অন্তর-জীবনের স্বভাব হল বয়ে চলা।'[২]

লেখক-কথিত 'অন্যরকম' ভেতরের চেহারাই একের পর এক গল্পে উঠে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তর্ভুবনের বিচিত্র রূপ-রূপান্তরের কাহিনি নির্মাণে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে—

'আমি inner world নিয়ে লেখাই পছন্দ করে থাকি।'[৩]

মানবজীবনের শাশ্বত সত্যের অন্বেষণে চির আগ্রহী বিমল করে'র ছোটগল্পে অন্তর্জগৎ সর্বদাই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কোনো আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থিত হয়ে তিনি মানবমনকে নিরীক্ষণ করেন নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতের পরিবর্তনশীল ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মানুষের অন্তর্জগতের অজ্ঞেয় চলমানতাকে অনুভব করাই ছিল মূল লক্ষ্য। মানবজীবনের ওঠা-নামা, ব্যর্থতা-সাফল্য, আলো-অন্ধকারের সহাবস্থানের মধ্যেই মনোজগতকে উপলব্ধি করতে হবে। নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিমল কর এই নৈব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুত হতে চান নি। তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি—

'এ-জীবনের বহু রহস্য, অজস্র তার ব্যর্থতা ও সম্ভাবনা, অসংখ্য তার পাপ, বিচিত্র তার স্খলনের যন্ত্রণা। আমি কি সে কথা লিখব না ? এমন কোনো শপথ তো আমার নেই যে, এইসব বিষয় আমার সাহিত্য থেকে আমি বর্জনীয় মনে করব।'[৪]

প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের নানাকথায় গড়ে উঠেছে বিমল করের গল্পভুবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আবহে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিতকালে ঔপনিবেশিক চেতনায় আচ্ছন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল বিন্যাস তাঁর একাধিক গল্পে স্থান পেয়েছে। পাঁচ-ছয়ের দশক থেকে বিশ শতকের শেষ দশক জুড়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ঘটনার পারম্পর্যে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্যার মধ্যেই তাদের গূঢ় মনস্তত্ত্বকে তিনি উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। এক কথোপকথনে গল্পকারের বক্তব্য—

'একজন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে বলেই এই জীবনের দায়কে স্বীকার করেছি। এর সঙ্কটকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমার মনে হয় এই মধ্যবিত্ত জীবন সব থেকে জটিল।'[৫]

এই জটিল জীবনায়নের অন্তরালে সক্রিয় মনোজগতের নীরব ভাষ্যের সঙ্গে বিমল কর পাঠককে একাত্ম করতে চেয়েছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবিধ সম্পর্কের কাহিনি এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বিশ্লেষণাত্মক অবলোকনে উঠে এসেছে অন্তর্জগতের অপার রহস্য। বিভিন্ন পর্বের গল্পে তিনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাগুলিকে রূপায়িত করেছেন। প্রবৃত্তি-দ্বন্দ্ব-নৈতিকতা-কদর্যতা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা ইত্যাদির সমগ্রতায় মানুষের মনোজগতের অতলান্তকে বিমল কর আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতার বিষয় রূপে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর নিজস্ব বয়ান—

> '...আমার সাধ্যমত আমি কখনও মানুষের চিত্তের দীনতা,
> মনের বিকার, কখনও তার সহানুভূতিশীল হৃদয়কে প্রকাশ
> করার চেষ্টা করেছি।'[৬]

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা ভাবনার তাত্ত্বিকতা প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষ্য দ্বারা বিমল কর প্রভাবিত হন নি। অদম্য কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি মানব মনস্তত্ত্বকে বুঝতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে বহু প্রচারিত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বসহ অন্যান্য মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভাবনার সম্পর্কে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ পড়ার অভিজ্ঞতা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন —

> 'মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ দু-একটি বই অনেকের মতন
> আমিও পড়েছি আগে, বুঝি বা না বুঝি।'[৭]

মানুষের মনের অজানা জগতের রহস্য অনুধাবনে বিমল কর বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদদের তত্ত্বের পাঠ নিলেও কখনোই তত্ত্ব-নির্ধারিত দর্শনে গল্প রচনা করেন নি। কেননা, তত্ত্বের নির্দিষ্ট নিয়মে মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং জীবনকে অনুসরণ করেই ক্রমে গড়ে ওঠে তত্ত্বকথা। কথাকার বিমল কর তাত্ত্বিকতার সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে মানুষের অন্তর্জগতের বহুমাত্রিকতাকে গল্পের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। বৈধ-অবৈধ, অনৈতিকতা-নীতিকথা, অসামাজিক-সামাজিকতা, ন্যায়-অন্যায়ের ইত্যাদির ভঙ্গুর বিভাজন রেখাকে অগ্রাহ্য করে তিনি মানব মনের বিচিত্র চলমানতাকে বিভিন্ন গল্পে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে মন-সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্বের যথার্থতা যেমন সিদ্ধ করা যায়, অন্যদিকে অন্তরমহলের নানা রহস্য তত্ত্বের ব্যাখ্যাতীত হয়ে নতুন ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, বিমল করের বিভিন্ন

গল্পে মানুষের রহস্যাবৃত মনোজগতের নানা চেনা-অচেনা মাত্রা বর্ণময়ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পকার মানুষের অন্তর্জগতকে রূপায়িত করেছেন। ভেতরের জগতের অজানা সত্যকে ছুঁয়ে তিনি মানুষকে বহির্জগতের সামগ্রিকতায় দেখেছেন। শুধুমাত্র মনের চেতনস্তরের (Conscious) প্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করলে তা অসম্পূর্ণ। বরং, অবচেতন (Sub-conscious) এবং অচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণী দৃষ্টিক্ষেপেই মানবমনের রহস্যকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। অচেতন ও অবচেতন স্তরের গভীরে নিহিত রয়েছে মনোজগতের অনেক অজ্ঞেয় অনুভূতি, যা ক্ষণে ক্ষণে সচেতন স্তরে প্রতিফলিত হয়। চেতন স্তরে মনোজগতের আংশিক স্বরূপ বিম্বিত হয়। তাই অবচেতন-অচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকা অজানা-অচেনা বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। কথাকার বিমল কর মানবমনের এই স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন—

> '...মানুষের সংজ্ঞান বা স্বাভাবিক চেতনার একটা সীমা আছে—
> অবচেতনার তা নেই। বরং হাল আমলের পণ্ডিতদের ধারণা,
> একাধিক স্তরে এই গভীর অবচেতনা ছড়িয়ে থাকা সম্ভব।
> মাঝে মাঝে তা অবিশ্বাস্য ধরনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির
> সঞ্চার ঘটাতে পারে।'[৮]

অবচেতন-অচেতন স্তরের গভীরের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানবমন আন্দোলিত হয়ে সচেতন স্তরে তারই প্রকাশ ঘটায়। এই দুই স্তরের অনেকাংশ বোধ্য হলেও বেশিরভাগটাই আপাত-অবিশ্বাস্য মনে হয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা। এই অবচেতন ও অচেতন স্তর কখনোই চেতন বা সংজ্ঞান স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না। বরং, এই স্তরগুলি আমাদের মানসিক উপাদানের গুণ বা ধর্ম হিসেবে অব্যবচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করে। মনের ভেতরের গভীরতা ধারণা করার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড ১৯০০ খ্রিঃ প্রকাশিত 'The Interpretation of Dreams' গ্রন্থে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সচেতন বা সংজ্ঞান, অবচেতন বা আসংজ্ঞান এবং অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তরে মনোজগতকে বিন্যস্ত করেন। প্রসঙ্গত, মনের মধ্যে কোনো স্থানগত বিস্তার নেই। শুধুমাত্র কিছু ধারণা-গুণের প্রেক্ষিতে এই Topographical Division করা হয়েছে। মানসিক

উপাদানের গুণগত অবস্থার পরিবর্তনে অবচেতন সর্বদা অবচেতনরূপে না থেকে কোনো সময় চেতন হয়েও উঠতে পারে। আবার, নির্জ্ঞান মনের চাহিদা-কামনা-বাসনা সময়ে সময়ে চেতন স্তরে প্রকাশ হতে চায়। তবুও অন্তর্জগতের সামগ্রিকতাকে যেন সম্পূর্ণতায় ধরা গেল না। তাই, মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসসমূহ জানার লক্ষ্যে ফ্রয়েড মনোজগতকে গঠনগতভাবে তিনটি স্তরে ধরতে চেয়েছেন। এগুলি হল—অদস্ (Id), অহম্ (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super-ego)। ফ্রয়েড ব্যাখ্যাত Structural Division of Mind এবং Topographical Division of Mind এর প্রভাব পরবর্তীকালে সুদূরপ্রসারী হয়। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, অ্যালফ্রেড অ্যাডলার, জাক লাকাঁ, এরিক ফ্রম প্রমুখ মনোবিদগণ মনের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আরো গভীর, পরিমার্জিত আলোচনায় অগ্রণী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, মনোজগতের অনেকটাই রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। ফলে কৌতূহলের সঙ্গে চলেছে নিরন্তর গবেষণা। তবে এই গবেষণার মুখাপেক্ষী নয় সাহিত্যজগত। সাহিত্য নিজস্ব ভঙ্গিতে শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত করছে মানবজীবন। আর সাহিত্যকে অনুসরণ করে কখনো কোনো তত্ত্ব সত্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে, কখনো বা নতুন আরেক তত্ত্বের নির্মাণের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

চেতন-অবচেতন-অচেতন স্তরের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের রহস্যময় মনোজগতের নানা মাত্রিকতা উন্মোচিত হয়েছে বিমল করের গল্পজগতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর্জগতের জটিল বিন্যাস তাঁর লেখনীতে নিপুণভাবে প্রতিফলিত। অবচেতন মনে থাকা সুপ্ত কামনার ইশারায় প্ররোচিত হয় 'বকুলগন্ধ' গল্পের অঞ্জনা। পূর্বতন ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতির রোমন্থনে এলোমেলো হয়ে যায় দাম্পত্যজীবন। প্রাক্তন প্রেমিক শ্যামল আঘাত দিয়ে দূরে সরে গেলেও অঞ্জনা তাকে ভুলতে পারে না, ফলে স্বামী সুধাংশুর সঙ্গে সম্পর্কেও শীতলতা চলে আসে। বকুল ফুল-বকুল গাছ কেন্দ্র করে শ্যামলের সঙ্গে প্রেমের স্মৃতির আবেশ থাকলেও পরবর্তীতে বকুল ফুল বা ফুলের গন্ধকে সে তীব্র অপছন্দ করে, এমনকি মেয়ে-স্বামীর বকুল প্রীতির জন্য তীব্র কটাক্ষও করেছে। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে, অবচেতনে শ্যামলকে কাছে পাওয়ার বাসনাই বাইরে ঘৃণা রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ফ্রয়েডীয় ভাষ্যে, এ প্রবণতাকে বলা হয় 'বিপরীত অভিব্যক্তি' (turning into opposite)। এই opposite wish অর্থাৎ ভালোবাসা আর বিদ্বেষের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে অঞ্জনা।

প্রকাশ্যে বকুল ফুল ঘৃণা করলেও আড়ালে সে বকুলফুলের মাধ্যমে শ্যামলের সঙ্গে জড়িত প্রেম স্মৃতিকে ছুঁতে চেয়েছে; গল্পের শেষে স্বামী সুধাংশুর কাছে বকুল ফুলের প্রতি তার তীব্র আসক্তি ধরা পড়ে যায়। একইভাবে 'খুব সম্ভব' গল্পে সুধাবিন্দু স্ত্রী প্রতিমার কাছে পদ্মিনীর সম্পর্কে তীব্র কটূক্তি করলেও অবচেতনে এক অজানা দুর্বলতাই রয়েছে। কেননা, ব্যাঙ্কের চেক লেখার সময় নিজের স্বাক্ষরে সে ভুল করে পদ্মিনীর পদবী লিখে দেয়। নিজের ভেতর বাইরের দ্বন্দ্বে দিশেহারা হয়ে পড়ে সুধাবিন্দু। 'মোহনা' গল্পে ময়নার উক্তিতে তারই প্রতিধ্বনি—

> 'আমরা সবাই একটা মানুষ, কিন্তু তুই দেখিস মাঝে মাঝে আমরা দুটো হয়ে যাই, বাইরে যে থাকে সে ভেতরের মানুষটাকে চুপি চুপি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করে। আমি ভাই মনটাকেই একটা মানুষ বলি–ভেতরের মানুষ। তুই কোনোদিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভাল বুঝবি না, অথচ সে আড়ালে থেকে কোথায় যে চালিয়ে নিয়ে যাবে তুই জানিস না।'[৯]

নিজের মনের ভেতরকে ময়না যথাযথভাবে চিনতে পারেনি। 'চাহিদাজগত' ও 'বাস্তবজগতে'র পার্থক্য বুঝতে না পেরে সে প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তার অন্তর্জগতের নিগূঢ় কামনা বহির্জগতের কাছে গুরুত্ব পায় নি। যখনই ময়না নিজের ব্যক্তিক চাওয়া-পাওয়াগুলোকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে, প্রতি ক্ষেত্রেই সে সমাজ-পরিজনদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ব্যক্তিসত্তা হাহাকার করলেও শেষপর্যন্ত সমাজসত্তার পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়।

'কাঁটালতা' গল্পে সুনয়নীর মা নিজের প্রবৃত্তিগত চাহিদাকে তৃপ্ত করতে সঙ্কোচ বোধ করেনি। মনের অদস্ স্তর বা Id এর ইশারায় তিনি বারে বারে প্ররোচিত হয়েছেন। আমাদের মনের অদস্ (Id) 'সুখনীতি' বা Pleasure Principle দ্বারা চালিত হওয়ায়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সুখভোগ। অদস্‌ের এই প্রবৃত্তিগত তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্রিয় হয় মনেরই 'অহম্' স্তর বা Ego; যা বাস্তবতা (reality) নীতির উপর নির্ভর করে। এদের সকলের উপরের স্তরে থাকে 'অধিশাস্তা' বা Super-ego। এই Super-ego বিবেক হিসেবে সক্রিয় থেকে আমাদের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'কাঁটালতা' গল্পে

মনের অদস্ স্তরের প্রভাবে সুনয়নীর মা কামজ সুখলাভে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। অবদমিত বাসনার উচ্ছ্বাসে বিবেক বোধকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিজের মেয়ে'র প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। কামনার তাগিদে একসময় মা নিজেই হয়ে যান সন্তানের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। মনের গভীরে নিহিত প্রবৃত্তির প্রাবল্যের কাছে তাকে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়। ছেলে প্রশান্তের বয়ানে তারই প্রকাশ—

> 'দিদির জন্যে মা'র হিংসে ছিল। রতীনদার জন্যে মা'র এমন একটা অস্থিরতা জন্মে গিয়েছিল যে, মা তার চাতুর্যও ধরে রাখতে পারত না, প্রকাশ হয়ে পড়ত।...আমাদের বাড়িতে রেখে মা রতীনদাকে নিয়ে জঙ্গলে যেত। বাড়ি আর জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলই মা'র বেশি পছন্দসই জায়গা ছিল। অমাবস্যায় যেন মা'র জোয়ার উঠত।'[১০]

প্রবৃত্তির এই তীব্র টানে জড়িয়ে পড়েছিল 'পিঙ্গলার প্রেম' গল্পের কিরণশশী। অল্প বয়সে দরিদ্র স্বামী-সন্তানকে ত্যাগ করে সে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে নতুন সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিল। কিন্তু কোথাও যেন অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল। তাই যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে অভিনেত্রী কিরণশশী পুনরায় যুবক মৃগাঙ্কের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছিল। মানব মনের এই জটিলতা প্রকৃতই ব্যাখ্যাতীত। 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' গল্পের চরিত্র চুনীলালের জবানিতে বিমল কর মানবমনের অন্তরমহলের এই রহস্যাবৃত দিকটি তুলে ধরেছেন—

> '...মানুষগুলো দেখতে ছোট, সাইজে স্মল, চেহারায় হাতি নয়, বাঘ-সিংহ নয়, কুমির নয়;—কিন্তু শালাদের ভেতরে যেন এক একটা আফ্রিকার জঙ্গল লুকিয়ে আছে। কোথায় যে কত অন্ধকার তা তুই বুঝবি না, জানতে পারবি না...'[১১]

'যযাতি' গল্পে বিগত-যৌবন বিপত্নীক নীলকন্ঠ বাড়িতে অষ্টাদশী কুসুমকে দেখে অবদমিত কামনার তাড়নায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। খণ্ডকালের জীবনে জরা-বার্ধক্য-মৃত্যুভয় তার কাছে মান্যতা পায় না। শরীরী ক্ষুধা-কাম দিয়ে সে জীবনকে তীব্রভাবে ভোগ করতে আগ্রহী। তাই মনের অহম্ স্তরের নজর এড়িয়ে যযাতির মন কুসুমকে দেখে প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—

'নীলকন্ঠ নিজের অস্থিরতা নিজেই বুঝতে পারছিল। মনের
মধ্যে অনেককাল পরে সেই বিশ্রী চাঞ্চল্য আবার এসেছে।
আবার সেই তুষের জ্বলন। একটা কথা যেন ভয়ংকর অন্ধকার
থেকে খানিকটা মুখ বার করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছে।
ছটপট করছিল নীলকন্ঠ।'[১২]

বাবার এই অতৃপ্তিজনিত চাঞ্চল্য ছেলে ললিতের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সুতীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে সে নীলকন্ঠকে মুক্ত করতে চেয়েছে। অকথিত বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য কুসুমকে বিয়ের মাধ্যমে নীলকন্ঠকে সংসারী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ললিত।

অবচেতন মনের কামনা অনেক সময় সামাজিক অবদমনের সীমা উজিয়ে সচেতন মনে চলে আসে। আর তখনই শুরু হয় তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব। 'পলাশ' গল্পে দাম্পত্যজীবনে তৃপ্ত হয়েও রতিকান্ত স্ত্রীর মাসতুতো বোন উমার প্রতি মানসিক দুর্বলতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। জঙ্গলে চলতে চলতে সে উমাকে স্ত্রী বিনুর সঙ্গে অভেদরূপে কল্পনা করেছে। স্ত্রী-সন্তানকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে রতিকান্ত উমাকেও ভালোবাসতে চেয়েছে। তার মনোভাবে আভাসিত হয়েছে বহুগামিতা বোধ—

'আমার স্ত্রীকেই আমি ভালোবাসব, একটি শুধু মেয়েকে।
কিন্তু ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে–এই ইচ্ছেকে তুমি
নষ্ট করে দিতে চাও। পারবে ? পারবে না।'[১৩]

কিন্তু সামাজিক বিন্যাসে এই ভালোবাসা বৈধ নয়। তার এই ইচ্ছা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরিণতি পাওয়া সম্ভব নয়। রতিকান্ত মনে মনে এই সত্যকে অনুভব করে—

'ইচ্ছে করাটা এক, আর ইচ্ছে করতে নিষেধ করাটা অন্য
জিনিস। ইচ্ছেটা মনের, নিষেধটা অন্যের।'[১৪]

সামাজিক প্রতিকূলতা স্মরণে রেখে রতিকান্ত এই গোপন চাহিদাকে সজ্ঞানে নির্জ্ঞান স্তরে সরিয়ে দিয়েছে, যাকে ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় Suppression বা 'নিরোধ' বলা যায়।

মানুষের অবচেতন-অচেতন মনের বাসনার এক ভিন্নতর রূপকে বিমল কর 'অশ্বত্থ' গল্পে শৈল্পিক দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পে রেণু'র চেতনায় আদি-

মাতৃসত্তার বিচিত্র মাত্রা লক্ষণীয়। নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্য রেণু ভাড়াবাড়ির অশ্বত্থবৃক্ষটিকে দায়ী করে ঘরত্যাগ করেছে। পরে এই গাছটিকে জড়িয়ে ধরে সে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ববোধকে পূর্ণতা দিতে উদ্যোগী হয়েছে। বাৎসল্যের আবেগে রেণু গাছটিকে সন্তানস্নেহে আঁকড়ে ধরেছে—

> 'রেণু জানে না, তার খেয়ালই নেই, কখন সে ধীরে ধীরে
> তরুতলে বসে পড়েছে, হাত দিয়ে গা ছুঁয়েছে–সেই তরুর,
> ঝুরি ধরে থেকেছে মুঠো করে। তারপর কখন অচেতনে বুক
> উপুড় করে আঁকড়ে ধরেছে সেই বিশাল তরুর একটু।'[১৫]

অশ্বত্থ গাছকে অবোধ শিশু'র সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে সে স্তন্যদান করার তৃপ্তি লাভ করেছে—

> 'দুধ খাইয়ে, আর এক অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেণু খুব
> নিশ্চিন্ত মনে এবার ফিরেই যাচ্ছিল। তার সংসারের কাজই
> যেন।'[১৬]

রেণুর এই মানসিকতায় প্রকৃতপক্ষে নির্জ্ঞান স্তরে স্থিত Mother Archetype এর প্রতিফলন দেখা গেছে। মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং-এর মতে, মানুষের 'জাতিগত মগ্নচৈতন্য' বা 'যৌথ নির্জ্ঞান'-এ (Collective Unconsciousness) বিবর্তনের মাধ্যমে জমা রয়ে যায় কিছু চিহ্ন, কিছু প্রতীক। এগুলিকেই Archetype বলা হয়। আমাদের প্রবৃত্তির ভিন্নার্থক প্রকাশ হিসেবে তারা অবচেতন থেকে সচেতন মনে উঠে আসে। আমাদের নির্জ্ঞান মনে বহন করা একাধিক Archetype এর মধ্যে অন্যতম হল Mother Archetype। এই Archetype আবার 'Good Mother' ও 'Terrible Mother' এর দুই মাত্রায় বিন্যস্ত। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর মনে এই Mother Archetype উদ্ভাসন দেখা গেছে। তাই সে অশ্বত্থগাছকে জড়িয়ে ধরে স্তন্যপান করানোর আনন্দে উচ্ছ্বল হয়েছে।

মানুষের অন্তর্জগতের প্রতি বিমল করে'র গভীর পর্যবেক্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে 'উদ্ভিদ' গল্পে। উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় একাগ্রতার জন্য অনেকে অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকে উদ্ভিদের মতোই স্পন্দনহীন, চেতনাহীন বলে মনে করে। স্বভাবে অন্তর্মুখী হওয়ায় রাজকুমারী চন্দ্রার প্রতি সে প্রকাশ্যে ভালোবাসা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু চন্দ্রার প্রতি তার প্রেমজ কামনা অবদমিত (repressed) ছিল। রাজকুমারীর বিয়ের সন্ধ্যায় সেই

কামনার তাড়নাতেই ঝিলের তীরে এক পাথরের মূর্তিকে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে পূর্ণেন্দু। বন্ধুরা অবাক হয় এই দৃশ্য দেখে—

> '...পূর্ণেন্দুর মাথাটা ক্ষণিকের জন্য থামল। তখন স্ট্যাচুর গলার কাছে তার মাথা। মুখটা উঁচু হয়ে আছে। ...মর্মর মূর্তি তেমনই প্রাণহীন, স্থির। পূর্ণেন্দুই বেড় দিয়ে আরো কিছুটা উঠে গেল। আর স্পষ্টই দেখলাম, দুটি নিষ্প্রাণ ওষ্ঠে একটি আবেগতপ্ত ওষ্ঠ মিশে গেল।'[১৭]

প্রার্থিত ব্যক্তিকে না পেয়ে মনের কামনা বহির্জগতে পাথরের মূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। এই আপাত-অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে পূর্ণেন্দু নিজের মানসিক চলিষ্ণুতাকে যেন সবার কাছে প্রমাণ করতে চায়। কথকের বয়ানে তারই আভাস—

> 'জবাব দেবার কিছু কী ছিল! হতে পারে চন্দ্রাকেই—রাজকুমারী চন্দ্রাকেই, অথবা দুর্লভ চন্দ্রার সুলভ স্মৃতিকেই। কিংবা একটি অবচেতন কামনাকেই।'[১৮]

মনের অদস্ (Id) স্তরের প্রবৃত্তিসমূহের পীড়নে বিধ্বস্ত হয়েছে 'জলজ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জলজ। সৎভাই রন্টু দূরে থাকলেও তার প্রতি দুর্বলতাকে সে এড়িয়ে যেতে পারে নি। এই প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন সম্ভব নয় জেনেও রন্টুর প্রতি অবচেতনে নিহিত আকর্ষণের কারণ তার কাছেও অজ্ঞেয় রয়ে গেছে—

> 'রন্টু থাক আর না-থাক, তার জমানো কত কী থেকে গিয়েছে জলজের মনে। এ যেন অনেকটা সেই ডুবো জাহাজের মতন। জাহাজ ডুবেছে, সমুদ্রের জলের ওপরে কিচ্ছু নেই, তলায় জাহাজের মধ্যে গা জড়িয়ে হাজার জিনিস থাকে।'[১৯]

কিন্তু মনের অহম্ (Ego) স্তরের বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষমতা এক্ষেত্রে জলজকে আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। অধিশাস্তা (Super-ego) স্তরের টানে তার মনে সৃষ্টি হয় অপরাধবোধ। তাই রন্টুর প্রতি আসক্তি রেখে সে নিজের জীবনের সঙ্গে হারিতকে জড়ায়নি। স্বপ্নের মধ্যেও মনে জেগে ওঠে পাপবোধ। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম অনুসারে ফাদার ভৌমিকের কাছে পাপ স্বীকার করে সবাইকে ত্যাগ করে চলে যায় জলজ।

গহন চেতনায় এই পাপবোধ যেন মানুষ যুগে যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে এসেছে। যৌথ নির্জ্ঞান স্তরে সঞ্চিত এই পাপবোধে পীড়িত হয়েছে বিভিন্ন মানুষ। 'শূন্য' গল্পে মৈত্রসাহেব যথার্থই বলেছেন —

> 'আমার এক বিদেশী বন্ধু বলত, মানুষ যদি যুগ থেকে
> যুগে–বংশ থেকে বংশ পরাক্রমে তাদের পাপগুলো সন্তান-
> সন্ততির ঘাড়ে-এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে চালান করে
> না দিয়ে যেত তা হলে আমরা অন্যরকম হতুম।'[২০]

পাপের অনুভব থেকে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে, কিন্তু অচেতন মনের মধ্যে অজানা রহস্যের মতোই তা সঞ্চিত হয়ে চলেছে। 'শূন্য' গল্পে মৈত্রসাহেবের কথাতে এই পাপমুক্ত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে—

> '...যদি কোনোভাবে ধরতে পারতুম স্মৃতিকেন্দ্রের কোথায়
> এই পাপ যুগ থেকে যুগে জমা থাকে–তবে সেই জায়গাটুকু
> অসাড় করে কেটে বাদ দিয়ে দেখতুম মানুষ কি, সে কেমন,
> সে কি করে!'[২১]

নিজের কৃতকর্মের অপরাধবোধ ক্রমশ মানুষের মনে পাপবোধের সঞ্চার করে। এই অপরাধবোধ (Guilty-feeling) জনিত দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে 'পিঙ্গলার প্রেম' গল্পের কিরণশশী। স্বামী-সন্তানকে ত্যাগ করে প্রেমিকের সঙ্গে যৌবনে গৃহত্যাগের স্মৃতি তার মনে পাপবোধের যন্ত্রণা তৈরি করেছে। 'সত্যদাস' গল্পে সত্যদাসের সম্পত্তি ব্যবহার করে ধনী হওয়া রঘুনাথের মনেও উদ্ভুত হয়েছিল পাপ করার বেদনা। মনস্থিত এই পাপই অনেক সময় মানুষকে মানসিক উত্তরণের পথে চালিত করে। পাপবোধের অস্তিত্ব অনেকক্ষেত্রে জীবনে সদর্থক বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হয়। স্বয়ং বিমল কর এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> 'এই জন্যেই অনেক সময় বলা হয়, একটু-আধটু পাপবোধ
> থাকা ভাল, কেননা এই বোধ তাকে ভেতরে ভেতরে পীড়িত
> করে, ফলে সে নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ হতে চায়।'[২২]

'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে শিবানীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে ঠকানোর জন্য তার তিন প্রেমিক অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। শিবানীর চিতার সামনে তিন

বন্ধুই নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথম যৌবনে অনাদি-শিশির-কমলেন্দু তিনজনেই চেতন স্তরে শিবানীকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি তৈরি করে নিলেও অবচেতনে প্রত্যেকেই স্বীয় অপরাধ-অন্যায় সম্পর্কে অবহিত থেকেছে। মনের অধিশাস্তা (super-ego) স্তরের প্রভাবে এরা প্রত্যেকেই নৈতিক উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হয়েছে। 'গুণেন একা' গল্পের গুণেনও এই নৈতিক উৎকণ্ঠাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। 'গুণেন একা' গল্পে কেদারের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ঈশানীর সঙ্গে গুণেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রবৃত্তিগত সুখে সাময়িক তৃপ্তি পেলেও দু'জনেই পাপবোধে আক্রান্ত হয়েছে। অচেতন মনের মধ্যে ছেয়ে থাকা এই বোধকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ফলে এক নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে গুণেন। অসংজ্ঞেয় এক নৈতিক সংকটে সে বিভ্রান্তি বোধ করেছে। একটি প্রবন্ধে গল্পকারের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—

> 'ফ্রয়েডের তত্ত্ব, পাপ তত্ত্ব, শয়তানের তত্ত্ব–একথা যদি বলেন এবং প্রশ্ন করেন, এতো পাপ লুকিয়ে নিয়ে আমরা আছি ?...যা আছে তা হয়তো দুর্বিষহ কিন্তু যা আছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার নয়।'[২৩]

মানবমনে অধিশাস্তা বা Super-ego স্তরের প্রভাবে পাপবোধের উপলব্ধি হয়। এই অধিশাস্তা জীবনে বিবেক রূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'অনাবৃত' গল্পে ইন্দুলেখার জীবনেও পাপজনিত দ্বান্দ্বিকতা জেগে উঠেছিল। ধরিত্রীকুমার সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না। কিন্তু এই দাম্পত্য ইন্দুর 'স্বকামজ রুচি' বা 'Narcissistic Choice' তৃপ্ত হয় নি অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের স্থান নিতে পারেনি ধরিত্রীকুমার। ফলে রয়ে যায় এক অদ্ভুত শূন্যতা। রাজা'র কাছে স্বামীর চরিত্র বিশ্লেষণে সেই ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে সে—

> 'ভাল মানুষ, ভদ্র শান্ত মানুষ, কিন্তু আমার স্বামীর মধ্যে কী ছিল না–আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই।'[২৪]

স্বামীর মৃত্যুর পর চল্লিশোর্দ্ধ ইন্দুলেখার মনের শূন্যতা পূরণ করতে সাহায্য করে মধ্য-পঁচিশের রাজার আন্তরিক সান্নিধ্য। অসম বয়সী দুজন মানুষের এই সম্পর্ক সমাজের বিভিন্ন মানুষ দ্বারা নিন্দিত হলেও ইন্দু নিজের জীবনে রাজার ভূমিকাকে বারে বারে

অনুভব করেছে। তার ব্যক্তিসত্তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক সত্তার নানান ভাবনা। চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বে সে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। তবুও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে একসময় প্রবৃত্তিগত তৃপ্তিকে অতিক্রম করে তার মনে জেগে ওঠে এক অজানা পাপবোধ। ইন্দুর স্বীকারোক্তি—

> 'নিজের কাছেই মানুষ মিথ্যে সাজাতে পারে না। নিজের
> কাছেই সে তার পাপের কথা স্বীকার করতে পারে।'[২৫]

'অনাবৃত' গল্পের মতোই স্বকামজ-রুচির (Narcissistic choice) ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ভাবনার সংঘাত দাম্পত্য জীবনকে মালিন্যময় করে তোলে 'নীরজা' গল্পে। নিজের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে স্বামী হিরণের সাদৃশ্য না পেয়ে নীরজা একদিন সংসার ত্যাগ করে। যদি সেই সুখ-সন্ধান শেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'জানোয়ার' গল্পে সংকীর্ণ নিম্নরুচিসম্পন্ন স্বামী সুধীবন্ধু'কে অতসী তীব্র ঘৃণা করে। স্বামীর অবহেলা-অনাদরে তার অপমানিত নারীসত্তা বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় নিজের অমানুষিক ঘৃণা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, প্রতিশোধস্পৃহায় সে চঞ্চল হয়ে ওঠে—

> '...অতসীর দিন দিন এই ইচ্ছেটাই তীব্র হতে লাগল যে,
> সোমকে—তার স্বামীকে, সে সত্যিই যে সাঙ্ঘাতিক ঘৃণা করে
> এটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যেমন করেই হোক।'[২৬]

তাই সুধীবন্ধু সোমের বিশ্বস্ত চাকর বাহাদুরের সঙ্গে অতসী শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। চাকরের সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে তুলে সে স্বামীকে মানসিক পীড়নের অনুভূতি দিয়ে এক ধর্ষকামী তৃপ্তি লাভ করে। ফ্রয়েডীয় ভাষায় অপরকে দুঃখ দিয়ে ব্যক্তির এই নিজস্ব সুখের অনুভূতিকে ধর্ষকাম বা Sadism বলে চিহ্নিত করা হয়। অতসী কোনো শারীরিক সুখ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাহাদুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় নি। তার প্রতি সুধীবন্ধুর অবহেলা সে মেনে নিতে পারেনি। ফলে নারীত্বের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে এই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই শারীরিক সম্পর্কের অপরাধবোধকে অতসী প্রতিশোধের তৃপ্তিতে অতিক্রম করেছে। 'সুনীতিমালার উপাখ্যান' গল্পে এই ধর্ষকামের প্রতিফলন দেখা যায় সুনীতিমালার চেতনায়। দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার পর স্বামী গগনের কাছে সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন অপমানিত হওয়ার জ্বালায় তার মনে জেগে ওঠে প্রত্যাঘাতের বাসনা। নিবারণের সঙ্গে শারীরিক

সম্পর্কের মাধ্যমে সে ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। নিজের ক্ষতি করেও সুনীতি সংসার ত্যাগের আগে গগনকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে স্বীয় অপমানের জবাব দিয়েছে। স্বামী গগনকে আঘাত করে সুনীতিমালা কেবলমাত্র ধর্ষকামী আনন্দ পেতে চায় নি। বরং এ হল তীব্র প্রতিবাদ। যে শরীরের অক্ষমতার জন্য সে প্রতিমুহূর্তে স্বামীর দ্বারা অবহেলিত-অপমানিত হয়েছে, সেই শরীরকেই অতসী প্রতিবাদের আয়ুধ করে তুলেছে।

'অ্যালবাম' গল্পে চিত্রগ্রাহক সরোজের সঙ্গে স্ত্রী মল্লিকার গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ভাঙার ক্ষেত্রে পুষ্পের মধ্যেও ধর্ষকামী মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্পর্কে তীব্র সচেতন মল্লিকা ছোটোবেলায় থেকে নিজেকেই ভালোবাসত। মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তার মধ্যে আত্মকামের (Ego-libido) প্রভাব ছিল। লিবিডো (libido) যখন আত্মসুখী হয়ে পড়ে মানুষ তখন নিজেকেই শুধু ভালোবাসে। নিজের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসাকেই মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেছেন নার্সিসিজম্ (Narcissism)। মল্লিকার ভাবনার মধ্যে এই মানসিকতা ছিল—

> '...মল্লিকা এ জীবনকে ভালবেসেছিল। নিজেকে, শুধু নিজেকে। নিজের দেহ, রূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং নিজের আত্মাকেই যা শুধু তার অবয়বে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। আর কাউকে মল্লিকা দেখেনি, দেখতে ইচ্ছেও করেনি। শুধু নিজেকেই দেখেছে, দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে, নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।'[২৭]

মল্লিকার দৈহিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করে সরোজ। ছবি তুলতে গিয়ে তাদের মধ্যে এক অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, যা পুষ্পকে আহত করে। শুরু হয় মানসিক অশান্তি। স্ত্রীকে আটকাতে না পেরে পুষ্প স্ত্রীকে আঘাত করার সুযোগ খোঁজে, ড্রেসিং টেবিল থেকে মল্লিকার ছবি সরিয়ে সে ইচ্ছে করেই স্বামী-স্ত্রীর একটি যৌথ ছবি জোর করে রাখতে চায়। এই ছবি হয়তো বা সরোজ-মল্লিকার মনে নিদারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি করবে। তাদের মনে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে সফল হতে চাওয়ার আনন্দ পুষ্প পেতে চেয়েছিল। তার মনোভাবে Sadism এর প্রকাশ লক্ষণীয়—

> 'যতই ভাবছিল ততই একটা ইতর আনন্দ মনটাকে উত্তপ্ত করছিল। ক্ষুরধার কেমন এক প্রতিহিংসা ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল চোখে।'[২৮]

'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে বিমল কর মানুষের মনে নিহিত ধর্ষকামিতার অপর এক মাত্রা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। বরফসাহেবের মৃত্যুর পর তার মেয়ে জিনি অসহায় হয়ে পড়ে। জিনির তিন বন্ধু অর্থাৎ পাঁচু, বীরু ও তিনুর ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক বাধ্যবাধকতায় খ্রিস্টান জিনিকে জীবনে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু তাকে পাওয়ার নিরুদ্ধ (suppressed) কামনা তিনজনেরই ছিল। জিনিকে তারা নিজেদের আয়ত্তের বাইরে যেতে দিতে চায় নি। তাই কখনো জিনির চাকরি কেড়ে নিয়ে, কখনো বা জিনির প্রেমিকদের মারধর করে তারা তৃপ্ত হতে চেয়েছে। Id বা অদস্ স্তরের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির দ্বারা তাদের চালিত হওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে পাঁচু'র ভাবনায়—

> 'এক কথায় বলতে পারি, বিশ্রী একটা ঈর্ষায় আমরা জ্বলতে লাগলুম মনে মনে। এ ঈর্ষা কেন, কার ওপর, তা কি খতিয়ে দেখেছি নাকি ? উহু, সেসব দেখিনি।'[২৯]

মনোবিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার মনে করেন যে, মানুষের এই ক্ষমতালিপ্সা (will to power) অন্যতম মানসিক বৈশিষ্ট্য। রতিসর্বস্বতা নয়, বরং ক্ষমতাসর্বস্বতাই হল মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। এই গল্পেও তিনবন্ধু জিনির উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে উদগ্রীব হয়েছিল।

মানব মনস্তত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক এরিক ফ্রম-এর মতে, ধর্ষকামিতার পাশাপাশি আমাদের নির্জ্ঞান স্তরে মর্ষকামিতা (Masochism) অনুভূতিও সমানভাবে সক্রিয়। 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পেই জিনির মানসিকতায় মর্ষকামী ভাবনা লক্ষণীয়। 'মরাল রেসপন্সিবিলিটি'র নামে ছোটোবেলার তিন বন্ধুর নানাবিধ আক্রমণে সে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মদ্যপ আলু ব্যবসায়ী নন্দকে রক্তাক্ত অবস্থায় তার বাড়িতে ফেলে এসে পাঁচু-বীরু-তিনু'রা 'নোবল্ রিভেঞ্জ' নিতে চেয়েছিল। প্রথমে প্রতিবাদ করেও শেষে আলুওয়ালা নন্দকে বিয়ে করে জিনি প্রবল অভিমানে আত্মপীড়নে মেতে উঠেছে। তার এই মর্ষকামী চেতনার সামনে তিন বন্ধু চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। তিনজনকে মানসিক শাস্তি দিয়ে জিনিও যেন কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ পেয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো মানুষের মতো জিনির মধ্যেও একইসঙ্গে ধর্ষকামিতা ও মর্ষকামিতার প্রকাশ দেখা যায়।

মর্ষকামী চেতনার ভিন্ন এক রূপ গল্পকার বিমল কর 'আঙুরলতা' গল্পে প্রকাশ

করেছেন। যে স্বামী দাম্পত্যজীবনে তাকে চূড়ান্ত ঠকিয়েছে, তার মৃতদেহকে ধর্মনিষ্ঠভাবে দাহ করার জন্য আঙুরলতা সচেষ্ট হয়েছে। সামাজিক সংস্কারের বশে সে দাহকার্যের অর্থ জোগাড় করার জন্য আত্মনিগ্রহে মেতে উঠেছে। সমাজ-সংসারের প্রতি তার ক্ষোভ; মনের জ্বালা মেটানোর জন্য নিজে যন্ত্রণা পেয়েও টাকার বিনিময়ে প্রভুলালের কাছে শরীর বন্ধক রেখেছে। প্রভুলালের দ্বারা শারীরিক নিপীড়িত হয়েও সে যেন প্রতিহিংসা গ্রহণের সুখ লাভ করেছে—

> 'মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে, বাড়ুক। কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট–এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।'[৩০]

'হেমাঙ্গর ঘরবাড়ি' গল্পে স্বামীর আশ্চর্য ব্যাধিকে ঘৃণা করে সংসার ত্যাগ করে পায়রা। অনেক বছর পর সে ফিরে এলেও স্বামী হেমাঙ্গ মানসিকভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং আত্মহত্যার মাধ্যমে হেমাঙ্গ আত্মপ্রবঞ্চনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুখ খুঁজেছে। এই আত্মহত্যা তার মর্ষকামী বা masochism চেতনারই প্রকাশ। হেমাঙ্গের এই মর্ষকামীবোধই তার অবচেতনে থাকা মরণপ্রবৃত্তিকে (death instinct) জাগিয়ে তুলেছিল।

প্রত্যেক মানুষের চেতনাতেই হেমাঙ্গের মতো ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি (destructive instinct) সক্রিয় থাকে, যা মরণের দিকে আমাদের ইশারা করে। ফ্রয়েডের মতে, অবচেতন মনে সুখনীতির সঙ্গে মরণ প্রবৃত্তিও জায়মান অবস্থায় থাকে। মরণমুখী এই প্রবৃত্তিকে Thanatos বলা হয়। 'শীতের মাঠ' গল্পে অসুস্থ নবেন্দু প্রকৃতির নির্জনতার সঙ্গে নিজের একাকিত্ববোধকে মিলিয়ে দেখতে চায়। গভীর বিষাদময়তায় তার মনে thanatos এর বোধ জেগে ওঠে। একাকী নবেন্দু'র মনে উজিয়ে আসে নিজস্ব এক স্বতন্ত্র বোধ—

> 'মাঠ আমায় নির্বাক নিশ্চল অনড় হতে শিখিয়েছে : মাঠের মতন আমি অন্ধ হবে।'[৩১]

নবেন্দু'র নিশ্চল মাঠের মতো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যে তার মর্তুকামী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদ জাক লাকাঁর ভাবনা অনুসরণে বলা যায়, মৃত্যু এখানে যেন 'ক্ষুধার বস্তু' হিসেবে দেখা গেছে। এ হল মানুষের ভ্রূণ-অবস্থা বা জরায়ুর মধ্যে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের অবচেতনে এই আকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে পরিবাহিত

হয়। জাঁক লাকাঁ একেই 'মরণের ইচ্ছা' বলেছেন। 'শীতের মাঠ' গল্পে নবেন্দু জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ পায়নি, বরং জীবনে টিকে থাকার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে। তাই সে মাঠের মতো ক্রমশ নিষ্প্রাণ-নিশ্চল হয়ে উঠতে চায়। 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ ঘরে-বাইরে সর্বদা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। চিঠির রূপকে মৃত্যুকেই সে অন্বেষণ করেছে বারে বারে। ফ্রয়েডের মতে, প্রত্যেক মানুষই অবচেতন মনে সর্বদাই নিষ্প্রাণ অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। এই চাওয়া থেকে মানুষের নিস্তার নেই। একেই 'মরণপ্রবৃত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ছোটোবেলা থেকেই সকলের মধ্যে সচল থেকেছে।

'নিষাদ' গল্পে জলকুও কোনো এক অদৃশ্য চোরাটানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। প্রিয় পোষ্য মানিক নামের ছাগলটি মারা যাবার পর সে তীব্র আক্রোশে প্রতিদিন রেললাইনে অক্লান্তভাবে পাথর ছুঁড়েছে। রেললাইনে কাটা পড়ার ভয় থাকলেও তার এই পাথর ছোঁড়ার কাজ বন্ধ থাকে নি। এক্ষেত্রে, জলকু'র মধ্যে মরণপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আক্রমকপ্রবৃত্তি (aggressivity)। এই Thanatos দুটি ভিন্ন মাত্রায় ক্রিয়াশীল হয় — আত্মঘাতী ও পরঘাতী। 'নিষাদ' গল্পে জলকু'র মৃত্যু কামনার মধ্যে কথকের 'পরঘাতী' হননপ্রবৃত্তি বিম্বিত হয়েছে। 'দূরে বৃষ্টি' গল্পে কথকের মধ্যে Thanatos এর আত্মঘাতী রূপ দেখা গেছে। সাংসারিক অশান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুর প্রতি আসক্তি দেখিয়েছে। কথকের বয়ান—

> '...রাত্রে আমার আত্মহত্যা করার ভীষণ এক টান এসেছিল।
> আমি হাতের কাছে ঘুমের বড়ি ছাড়া কিছু আর পেলাম না।
> ...তা সত্ত্বেও রাত্রে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে।'[৩২]

মানুষের মনের নির্জ্ঞান স্তরে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির (Destructive instinct) বিশেষ রূপ মরণ-প্রবৃত্তি বা Thanatos এর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে Eros বা কামমূলক প্রবৃত্তি। Thanatos প্রধানত বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে প্ররোচিত করে। আর Eros বন্ধনের মধ্য দিয়ে গঠনমূলকতায় অগ্রসর হয়। কাজের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী হলেও Thanatos এর সঙ্গে Eros একইসঙ্গে ক্রিয়াশীল। মানবমনে কামমূলক প্রবৃত্তি এবং হননমূলক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বমূলক সহাবস্থানের ভাষ্য গল্পকার বিমল করে'র 'আত্মজা' গল্পে পাঠক অনুভব করতে পারেন। এই গল্পে বাবা-মেয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মায়ের মনে তীব্র সন্দেহ ও ঈর্ষার প্রকাশ ঘটেছে। ফলে সম্পর্কের মধ্যে তৈরি

হয়েছে তীব্র টানাপোড়েন এবং ঘনীভূত হয়ে উঠেছে অস্তিত্বজনিত নিদারুণ সংকট। অবদমিত বাসনার আড়ালে সুপ্ত থাকা প্রবৃত্তির নগ্নরূপ উন্মোচনে আমাদের চূড়ান্ত বিব্রততাকে 'আত্মজা' গল্পে নিপুণভাবে তুলে আনেন গল্পকার। সাহিত্য-সমালোচক বিমল করে'র গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন—

> 'জীবনের অনেক নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য, যা আপাতত দুঃসহ সেগুলোকেও তিনি (বিমল কর) কখনো এড়িয়ে যাননি।'[৩৩]

'আত্মজা' গল্পে মেয়ে পুতুলের প্রতি স্বামী হিমাংশুর অপরিসীম ভালোবাসার সম্পর্ককে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছে যূথিকা। বাবা-মেয়ের সম্পর্কের প্রগাঢ়তাকে সন্দেহ করে সে হিমাংশুকে বিকৃতমনস্ক হিসেবে দোষারোপ করে। যূথিকার এই অভিযোগ তার স্বামীর মনে তোলে তীব্র আলোড়ন। সন্তানের শরীর-মন স্পর্শ করে তাকে নিজের সত্তার অভিন্ন অংশরূপে উপলব্ধি করেছে হিমাংশু। সন্তান হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মসত্তারই এক প্রতিরূপ—

> 'এ কে ? তার মেয়ে ? এ কি ভিন্ন ? হ্যাঁ, দেহ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তবু ভিন্ন নয়, রক্তের সেই আশ্চর্য লীলার কাছে ওরা এক, সেই আত্মায় ওরা অভিন্ন। ওর আত্মায় এর জন্ম, এর জীবন, এর লীলা।'[৩৪]

কন্যা পুতুলের মধ্য দিয়ে নিজ সত্তাকে নতুন করে ছোঁয়ার সেই আনন্দ শুধুমাত্র স্ত্রীর সন্দেহ দৃষ্টিতে হিমাংশুর কাছে যন্ত্রণায় পরিণত হয়। চেতন-অবচেতনের টানাপোড়েনে সে নিজের অবদমিত কামনার রূপকে যেন হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে। যূথিকার প্ররোচনামূলক অভিযোগে হিমাংশুর সন্তানকে আদর করার মধ্যেও নিজের কামময় প্রবৃত্তির (Eros) তৃপ্তময় প্রচ্ছন্ন রূপের হদিশ পেতে চেষ্টা করে —

> 'পুতুলের বুকে মুখ গুঁজে হিমাংশু হাসছিল বটে, কিন্তু কোথায় একটা সুধার স্পর্শ যেন ছিল। ঠিক, ঠিক–পুতুলের হাঁটুর ওপর থেকে বস্ত্র সরিয়েছে ও কিন্তু চোখে পড়ছে–একটি অন্য আকাশ, কি ফুল, কি পাঁপড়ি। অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পুতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে তার মধ্যে কোনো আনন্দের স্বাদ ছিল না ?'[৩৫]

সংবেদনশীল স্রষ্টা বিমল কর এই গল্পে মেয়ে ও বাবার মধ্যে পারস্পরিক তীব্র আবেগ-ভালোবাসার মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে শিল্পিতভাবে পরিবেশন করেছেন। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে, কন্যা-পিতার মধ্যে একে অপরের প্রতি এই টানকে 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স' (Electra-Complex) রূপে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু গল্পকার কেবলমাত্র তত্ত্বের সীমারেখায় গল্পটিকে বদ্ধ করেন নি। বরং বিমল কর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অন্দরমহলের উজান-ভাটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই কন্যার কাছে ভালোবাসার নিবিড় অনুভূতিতে পাওয়া আনন্দই হিমাংশুর আত্মবিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পাপ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পিতৃত্বের আড়ালে সে নিজের কামুক পুরুষসত্তাকে কল্পনায় নিরীক্ষণ করে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে—

> 'হয়ত অমনিই হবে–স্নেহের আর পিতৃত্বের কুয়াশায় হিমাংশুর সত্য পরিচয় ঢাকা ছিল। আবার যেন একটা বিষাক্ত ছোবল খেয়ে ওর চিন্তাটাই অসাড় হয়ে এল।'[৩৬]

'আত্মজা' গল্প সম্পর্কে স্বয়ং বিমল করে'র মননঋদ্ধ বিশ্লেষণ লক্ষণীয়—

> 'আপাতভাবে গল্পটা মনে হয়, ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি নিয়ে লেখা, কিন্তু এর মধ্যে একটা 'রিজেকশন্' ছিল।...এ জিনিসটাকে অন্য লোক এসে একটা খোঁচা দিয়ে গেল। সেই খোঁচাটাই আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। কিন্তু বাবা তখন ভাবছে কই আমি তো এরকম কিছু ভাবিনি, কোনোদিনই ভাবিনি। মেয়ে তো আমার। তো, এই যে রিজেকশন্, কমপ্লেক্সের রিজেকশনটা তো আমাদের করা উচিত। যদি আমরা ধরেই নিই যে এটা ছাড়া হয় না, সমাজে সভ্যতায় তো সে জিনিষ চলে না। এই যে দ্বন্দ্ব, এর ফলেই মানুষটার মনে ঢুকে গেল অকারণ পাপবোধ। এই গিল্টি কমপ্লেক্স থেকে লোকটি শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হল।'[৩৭]

স্বীয় মনের গহনে সন্তান স্নেহের ছদ্মবেশে অতৃপ্ত কামনার লোলুপ রূপ অনুভব করে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে হিমাংশু। অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর মনোজগত আলোড়িত হয়। অধিশাস্তা স্তরের প্রভাবে নৈতিক উৎকণ্ঠায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জেগে ওঠে মনের মধ্যে আক্রমণাত্মক হননপ্রবৃত্তি। গল্পের বয়ানে তারই প্রতিফলন —

'হিমাংশুরই অসম্ভব ঘৃণা হয় তার ওপর—। শুধু ঘৃণাই
নয়, তাকে ধিক্কার দেয় হিমাংশু, ইচ্ছে হয় ওর টুঁটি চেপে
ধরে, ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধে...'[৩৮]

ক্রমশ আত্মঘাতী মরণপ্রবৃত্তির (Thanatos) দ্বারা সে প্ররোচিত হয়। শেষে আত্মহত্যার মাধ্যমে চেতন-অবচেতনের টানাপোড়েন থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে হিমাংশু। কামমূলক প্রবৃত্তির (Eros) চোরাটানে আবিষ্ট হয়েছিল 'কাচঘর' গল্পে শোভনাও। মাতৃত্বের আনন্দ থেকে চিরবঞ্চিত জেনে সে নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তা সত্ত্বেও, ডাক্তার হিরণের আবেগঘন ব্যবহার তাকে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু তার জীবনের গোপন সত্য জেনে হিরণ দূরে সরে যায়। তাই লিবিডো (libido) স্তরের প্রভাবে শোভনার মনে জেগে ওঠা স্নেহ-ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রয়ে যায়। নির্জ্ঞান মনের কামপ্রবৃত্তি প্রকাশকে বিমল কর অন্য মাত্রায় 'অপহরণ' গল্পে বিন্যস্ত করেছেন। এই গল্পে উমাপ্রসাদ দত্ত ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ-সংসারে সহজাত কামশক্তির প্রাবল্য লক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিগত বোধের উত্তরণে তিনি libido এর নঞর্থকতায় চালিত হননি, বরং তাঁর চেতনায় উদগতি বা Sublimation এর প্রভাব লক্ষণীয়। চরম লিবিডো স্তরে কামজ প্রবৃত্তিগুলিকে উমাপ্রসাদ মননের স্তরে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মনজাত আদি রিপুগুলিকে তিনি সমাজ অনুমোদিত উপায়ে পরিচালিত করেছেন। ফলে, তাঁর রং-তুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণের সীতাহরণ অনুসরণে 'অপহরণ' সিরিজের চিত্রকলা। এই ছবিগুলিতে বিভিন্ন প্রবৃত্তির রূপক হিসেবে রাম-সীতা-জটায়ুর নানা ছবি উঠে এসেছে। একইভাবে 'যযাতি' গল্পে নীলকন্ঠ নিজের অবদমিত কামময় বাসনাসমূহকে উদগতি বা Sublimation এর প্রেক্ষিতে যযাতির যৌবনাকাঙ্ক্ষা-কেন্দ্রিক পালা রচনায় সঞ্চালিত করেছিল। ইয়ুং এর মতে, মানুষের এই লিবিডো শুধুমাত্র যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়। বরং এই libido ব্যক্তির সকল প্রচেষ্টার মূল শক্তি, যা মানুষকে সৃজনশীল করে তুলতে সাহায্য করে।

জটিল মানব মনস্তত্ত্ব উন্মোচনের স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে বিমল করের 'জননী' গল্পটি। মৃত্যুর পর পাঁচ সন্তানের অন্তর্দৃষ্টিমূলক স্মৃতিচারণায় তাদের মায়ের মনোজগতের বিভিন্ন মাত্রা সকলের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। এদের প্রত্যেকের কাছে

মা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বিভাবনায় ধরা পড়েছে। ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ মায়ের মধ্যে সাহসের অভাব ও স্বার্থপরতা দেখেছে, কেউ বা মানসিক অন্ধত্বের থেকে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কেউই নিজের মাকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। তারা প্রত্যেকেই মানসিক অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনোজগতের সমগ্রতাকে ছোঁয়া সহজ নয়। 'ভয়' গল্পে স্ত্রী শোভার মানসিক টানাপোড়েনের কোনো কারণ খুঁজে পায় নি তার স্বামী। সুরঞ্জনের সঙ্গে পূর্বতন সম্পর্কের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি শোভার মনে তীব্র অপরাধবোধের আবেশ তৈরি করেছে। যার ফলে তার মাতৃত্বলাভের আনন্দও ফিকে হয়ে এসেছে। কিন্তু স্ত্রীর অবচেতন মনের আলোড়নকে অশোকও ধরতে সক্ষম হয় নি। গল্পের বয়ানে তারই প্রতিধ্বনি—

> 'মনের বীজগণিত অশোকের জানা ছিল না। শোভার এই
> মনোগতির রূপটাও প্রকট হয় নি এতদিন।'[৩৯]

আপন চেতন-অবচেতন-অচেতন স্তরের নানান জটিল ভাবনার যথার্থ অনুধাবন করতে একজন মানুষকেও চূড়ান্ত বিব্রত হতে হয় নিজের কাছে। 'ইঁদুর' গল্পে মলিনাও নিজের মনোজগতকে চিনতে পারেনি প্রায়শই। স্বামী যতীনের অনুপস্থিতিতে একাকী ঘরে থাকতে গিয়ে সে সবসময় যতীনের বন্ধু বাসুদেবকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। মনের অদস্ স্তরের অবদমিত কামনা বা প্রবৃত্তিকে স্বীকার না করে মলিনার অহম্ (ego) সেই প্রবৃত্তিকে বাসুদেবের মধ্যে অন্বেষণ করতে চেয়েছে। মনস্তত্ত্ব অনুসারে, মলিনার চেতনায় অভিক্ষেপ বা Projection নামক মানসিক প্রক্রিয়া সক্রিয় রয়েছে। নিরুদ্ধ কামনাই তার মনে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। বাসুদেব তাকে নিয়ে হয়ত স্বপ্ন দেখছে বা সে একাকী ঘরে ঢুকে পড়তে পারে ভেবে মলিনার উদ্বেগ নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। সে যেন বাসুদেবের জোর করে ঘরে ঢুকে পড়াটাকেই প্রত্যাশা করছিল। Id বা অদস্‌ের প্রবৃত্তিগত সুখজ কামনাকে আটকাতে Ego বা অহম্‌ই যেন এক কৌশল অর্থাৎ Defence Mechanism গড়ে তোলে। একে মনোবিদরা Reaction formation রূপে অভিহিত করেছেন। অদস্ ও অহমে্র টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত মলিনাকে আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে মনের অধিশাস্তা স্তর। বাসুদেবের প্রতি তার ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ তাকে মানসিকভাবে বিব্রত করে। সারারাত ধরে বৃষ্টিস্নাত মানুষটাকে দেখে মলিনা আপন সংকীর্ণ মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করে—

'কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে যে লোকটা পাথরের মতো বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে মলিনার মনে হল– বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংরা মন। ইঁদুর কি!'[৪০]

'মানসাঙ্ক' গল্পে ছোট্ট ছেলে চন্দনের মনে নানা ভাবনার আনাগোনা লক্ষ করা যায়। আত্মীয়-স্বজনের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া দুই চোরের জন্য তার কষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত রোগা, মলিন চেহারা নিয়ে সে তাদের বাঁচাতে পারার সামর্থ্য দেখাতে পারে না। মনের মধ্যে থাকা হীনতাবোধ তাকে দুর্বল করে দেয়। মনোবিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার মনে করেন, প্রত্যেক মানুষ এই হীনতাবোধ বা Inferiority Complex থেকে মুক্ত হতে চায়। ফলে, হীনতাবোধকে অতিক্রম করতে সে নতুন কোনো প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অ্যাডলার একেই 'অতি ক্ষতিপূরণ' (Over Compensation) বলেছেন। চন্দনও শারীরিকভাবে সক্ষম না হলেও মানসিকভাবে অতিমানবিক কিছু করতে চেয়েছে। কল্পনার নেশায় বটগাছের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে সে নিজেকে বটগাছ হিসেবে অনুভবে গণ্য করেছে। বটগাছের মতো শক্তিশালী হিসেবে নিজেকে ভেবে দুইজন চোরকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করেছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে বটগাছের সঙ্গে এই একাত্মকরণ (Identification) তাকে হীনতাবোধ থেকে মুক্ত করেছে–

'তার শরীরে যে কী ভীষণ শক্তি এসেছে চন্দন এবার তা অনুভব করতে পারল। ও একা এ-ক-শো মানুষের সমান। চন্দন খুব খুশী। মনে হল, এ আনন্দ এত সুখ জীবনে আর সে কখনও অনুভব করেনি।'[৪১]

আবার, অনেক সময় খণ্ডিত ব্যক্তি-সত্তা (Split-personality) মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে দেয়। 'নিষাদ' গল্পে কথকের বিভাজিত সত্তা স্বগত কথনে জলকু'র পোষ্য ছাগলশিশুকে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। জলকু'র চূড়ান্ত পরিণতির জন্য তার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মন সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে। স্বীয় সত্তার এই বিখণ্ডন অনুভব করেছেন কথক স্বয়ং—

'এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন ও সত্তাকে ভাঙলাম। দু-ভাগে। এক ভাগ আমি, অন্যটি জলকু।'[৪২]

অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বময়তায় মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের (alineation) জন্ম হয়। জন্মের পর থেকেই আমরা পারিপার্শ্বিক জগতে অন্যের নানা অবয়বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাই। সহজাত ব্যক্তিত্বের ভাবনা অনেকটাই কাল্পনিক। নিজের স্বরূপের অন্বেষণ না করে, অন্যের image বা অবয়ব দ্বারা একাত্ম হয়ে যায় মানুষ। তাই সময় ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনায় বিচ্ছিন্নতাবোধ আসে। মনোবিদ জাক লাকাঁর মতে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুকালে 'মুকুর ধাপ' দশা থেকেই শুরু হয়। মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে লাকাঁ 'মুকুর ধাপ' (Mirror phase) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'শূন্য' গল্পে ছোটোবেলা থেকে লালিত নিশীথের স্বপ্নগুলি পূর্ণতা পায় নি। ফলে, তার চেতনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতি জেগে ওঠে। নিজের চেনা স্বরূপ থেকে সে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—

> 'আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি ছেলেবেলা থেকে, ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি—দেখতাম তার সবই, প্রায় আতসবাজির ফুলের মতন। ওরা এক একটি চোখ ভোলানো স্বপ্ন। মুহূর্তের মোহ।'[৪৩]

চারপাশের বিভিন্ন অবয়ব দ্বারা বিভ্রান্ত সুধাময়ও নিজের প্রকৃত অস্তিত্ব জানতে ব্যাকুল হয়েছে—

> 'আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি মা। আমার মনে শান্তি নেই। কী ভীষণ অতৃপ্তি যে!'[৪৪]

বিভিন্ন image বা অবয়ব দ্বারা ছোটোবেলা থেকে প্রভাবিত হয়ে চলে মানুষ। সমাজ-পরিবেশ যেভাবে মানুষকে উপস্থাপিত করে, তাকেই সত্য বলে মনে করলে একসময় অহম্ বা ego দ্বারা প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, 'সংশয়' গল্পে সুধাকান্ত উপলব্ধি করেন, চাকরিজীবন শেষে বিদায়সভায় প্রাপ্ত প্রশংসা-স্তুতির বেশিরভাগটাই অন্তঃসারশূন্য। মানসিক দ্বন্দ্বে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন তিনি। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সুধাকান্ত বেরিয়ে এলেও 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ ভ্রমকেই সত্য বলে মনে করেছে। ভ্রম-বাতুলতায় (Parania) আক্রান্ত হয়ে সে বারে বারে মৃত্যুর রূপক হিসেবে প্রতীকায়িত একটি চিঠির সন্ধান করেছে। 'আত্মজা' গল্পে স্ত্রীর যুথিকার সন্দেহপ্রবণতায় অতিষ্ঠ হয়ে হিমাংশুও পীড়ন-জনিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের (delusion of persecution) কাছে

আত্মসমর্পণ করে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে নিজের পাশবিক কামনাকে অন্বেষণ করে সে আত্মহত্যা করে ফেলে।

মনের ভেতরের এই ভ্রান্তি অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বাইরের জগতে অবাস্তব প্রত্যক্ষ করতে প্ররোচিত করে। এই ধরনের ভ্রান্তি Hallucination বা 'অমূল প্রত্যক্ষ' হিসেবে পরিচিত। বিমল করের 'খুব সম্ভব' গল্পে পদ্মিনীর প্রতি গোপন আসক্তির জন্যই অসুস্থ অবস্থাতে সুধাবিন্দু নিজের ঘরে তার অস্তিত্বকে খুঁজে পায়। আবার 'মাছি' গল্পে মাছির মাধ্যমে শহরে রোগের সংক্রমণ ঘটলে কথক মৃত্যুভয়ে জর্জরিত হয়। বিছানায় মাছি না থাকলেও সে বারে বারে hallucination এর প্রভাবে মাছিকে দেখতে পায়। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি—

> 'হঠাৎ মনে হয়েছিল, একটা মাছি আমার মুখে এসে বসেছিল।
> মনের ভুল। কিংবা আমি হয়ত ভয় পেয়ে গিয়েছি।'[৪৫]

মনের ভুলে বাস্তব জগতে অস্তিত্ব না থাকলেও কোনো উদ্দীপক ব্যতীত মানুষের নানা বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষ হতে পারে। মনের ভেতরের অবদমিত কামনা-বাসনা এক্ষেত্রে বাইরে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে। এই hallucination বা অমূল প্রত্যক্ষে বিভ্রান্ত হয়েছে 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পের শিবতোষ মৈত্র। কোলিয়ারি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুর স্ত্রী সানন্দাকে সন্ধ্যাবেলায় কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে নগ্ন অবস্থায় ভয়ংকর রূপে প্রত্যক্ষ করে—

> 'সুনন্দা বলেই মনে হল। কিন্তু এ কেমন সুনন্দা ?...ভীষণ
> লম্বা, যেন গাছের লম্বা পাতার মতন আকৃতি। মাথার দুপাশ
> থেকে চুল গড়িয়ে এসে পায়ের পাতা ছুঁয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন।
> অথচ মাথায় সেই বিশাল চুল–যা দু-পাশ থেকে ওর পায়ের
> পাতা পর্যন্ত নেমে এসেছিল—সেই চুল ওর নগ্নতাকে ঢেকে
> রেখেছে।'[৪৬]

দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্ত সুনন্দার প্রতি নিরুদ্ধ কামনাই তার এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এই অবাস্তব দৃশ্যমানতায় হতবাক শিবতোষ। এই চাক্ষুষ অমূল-প্রত্যক্ষের কার্যকারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তার ভাষায়—

'কেন, কেন আমি অমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—আমার মাথায় আসছিল না! একে কী হ্যালুসিনেশন্ বলে ? কী জানি! আমার চেতনা আর অবচেতনার মধ্যে কি কোনো গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ?'[৪৭]

মানুষের অবচেতন-অচেতন মনের নীরব জগতকে উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিমল কর অনেক গল্পে স্বপ্নের নানাবিধ অনুষঙ্গ এনেছেন। তাঁর নানা গল্পের কাহিনি বিন্যাসে স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মানুষের অন্তর্জগতের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে স্বপ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা আমাদের সাহায্য করে। নিজের রচনায় স্বপ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করার সময় বিমল কর স্বয়ং বলেছেন—

'স্বপ্ন আমাদের জীবনে একটা বড় পার্ট প্লে করে। সাবকন্শাস্কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে স্বপ্নের একটা বড় ভূমিকা তো নিশ্চয়ই আছে।'[৪৮]

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই নির্জ্ঞান মনকে সহজে জানা যায়। তাঁর মতে, নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল স্বপ্ন। এই স্বপ্নের প্রকৃত উৎসভূমি হল আমাদের নির্জ্ঞান মন, যেখানে আমরা নিজস্ব কামনা-বাসনাকে জ্ঞানত বা অজান্তে নির্বাসিত করেছি। স্বপ্ন হল ইচ্ছার গোপন চরিতার্থতা, যা সমাজ-অনুমোদিত নয়। ঘুমের সময় অহম্ স্তর কম সক্রিয় থাকায় স্বপ্নের মাধ্যমে অদস্ের চাহিদাগুলি বেরিয়ে আসে। ইয়ুং ও অ্যাডলারের ভাবনাতেও স্বপ্নের উৎসকে সম্পূর্ণ মানসিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই বিমল করে'র গল্পজগতে স্বপ্ন ব্যবহারের প্রাবল্য লক্ষণীয়। একটি সাক্ষাৎকারে তার ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে—

'তবে স্বপ্ন আমার লেখায় বরাবরই আছে। আমার একটা বিখ্যাত গল্পই আছে স্বপ্নের নবীন। সেই স্বপ্নটা আমি নিজেই দেখেছিলাম।'[৪৯]

'স্বপ্নের নবীন' গল্পে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে নবীন চাকরি পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর কলকাতার ফুটপাতে লটারি টিকিটের ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু বাবা-মা-দাদা এমনকি প্রেমিকা কাবেরীর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় এই কাজ অমর্যাদাকর হিসেবে গণ্য হয়। মাঝরাতে তীব্র মানসিক চাপে থাকা নবীন স্কুটারভ্যান করে লটারি বেচার স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্নের মধ্যে গাড়িতে আগুন লেগে গাড়ি সমেত সে নিজের ধ্বংস হওয়াকে যেন প্রত্যক্ষ করে। ঘরের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর নবীন আত্মবিশ্লেষণে নিজের জীবনে এগিয়ে চলার প্রবল বাধাগুলি বুঝতে পারে এবং নিজের সাফল্যের অনিশ্চয়তা অনুভব করে। এক্ষেত্রে নবীনের রুদ্ধ বা অপূর্ণ আবেগ স্বপ্নের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ হয়ে তার মানসিক সাম্য বজায় রেখেছে।

মানুষের অতৃপ্ত-অপূর্ণ ও অবদমিত কামনা-আবেগ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্ন হল সে সকল ইচ্ছার চরিতার্থতা যা মনের অধিশাস্তা (Super-ego) দ্বারা অনুমোদিত নয়। ঘুমের সময় মনের অহম্ স্তর প্রবলভাবে সজাগ না থাকায় অদস্‌ের চাহিদাগুলি স্বপ্নের রূপে প্রকাশ পায়। তবে ঘুমন্ত অবস্থাতেও যেহেতু অহম্ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায় না, তাই অবদমিত ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। 'রামচরিত' গল্পের পরিতোষ মায়ের মৃত্যুর পরে বিনুমাসির সঙ্গে বাবার অবৈধ সম্পর্ক মেনে নিতে পারে নি। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও সে অবচেতনে বাবার অপরাধের শাস্তি চেয়েছিল। রাতে স্বপ্নের মধ্যে বাবাকে কয়েদি রূপে দেখে তাঁর সুপ্ত ইচ্ছাটাই যেন খানিকটা তৃপ্ত হয়—

> 'পরিতোষ জীবনে কয়েদী দেখেনি, তবু বাবার জামাটা যে কয়েদীর–স্বপ্নে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তার ভয়ঙ্কর অপমানিত লাগছিল নিজেকে। স্বপ্নে, ঠিক সেই মুহূর্তে–বাবার গায়ে কয়েদী পোশাকটা দেখার পর আড়ালে সরে যেতে ইচ্ছে করছিল।'[৫০]

Id বা অদস্‌ের নিহিত ইচ্ছা-কামনাগুলি ছদ্মবেশে স্বপ্নে এলেও স্বপ্নের বাইরের রূপ বা Manifest content এবং স্বপ্নের নিহিতার্থ রূপ বা Latent content ব্যাখ্যা করতে পারলে সেগুলিকে নির্ধারণ করা যায়। সেক্ষেত্রে স্বপ্নক্রিয়া (dream work) অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় স্বপ্নের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা থেকে স্বপ্নের বহির্জগতে প্রকাশিত রূপটি গড়ে ওঠে, তাকে অনুধাবন করা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে। 'সহচরী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নবীন স্বপ্নের মধ্যে প্রেমিকা সরসীর দ্বারা নিজেকে শরীর-মনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখে। স্বপ্নে প্রকাশিত বিষয় (manifest content) অনুযায়ী, নবীনকে সরসীর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত মনে হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের অন্তর্লীন বিষয় (latent content) বিশ্লেষণে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে

আত্মসুখী নবীন দুঃখ-যন্ত্রণায় নিজের অস্তিত্বকে যথার্থভাবে জানার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'বাঘ' গল্পে শচীর বাঘের স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে স্বামী অচিন্ত্যের বাঘ শিকার করার সাফল্য-উচ্ছ্বাস সে দেখতে পায়। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙার পর তার মন শূন্যতাবোধে ভরে যায়। আসলে বাস্তবজীবনে অচিন্ত্যের কাছে স্ত্রীর থেকেও বাঘ-শিকারের মূল্য বেশি। শিকারের নেশায় নিজের স্ত্রীর প্রতি তার কোনো খেয়াল নেই। তাই শশী স্বপ্নের মতোই বাস্তবেও স্বামীর শিকারের সাফল্য আকাঙ্ক্ষা করে। কেননা, স্বামীর ব্যর্থতা তাকে আরো নিঃসঙ্গ জগতে ঠেলে দেবে।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং এর মতে, মানুষের স্বপ্ন তার অতীতের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত দেয়। অ্যালফ্রেড অ্যাডলারও বলেছেন, স্বপ্নের অন্যতম কাজই হল 'এগিয়ে চিন্তা করা' (to think ahead)। তবে, স্বপ্ন যে কখনোই ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা বহন করে না, এ বিষয়ে তাঁরা দুজনেই একমত। 'পলাশ' গল্পে উমা স্বপ্নে দেখা জলভর্তি পুকুরকে একদিন পাহাড়ি অঞ্চলে জামাইবাবু রতিকান্তের সঙ্গে খুঁজে পায়। এই পুকুর স্বপ্নে অবদমিত বাসনার প্রতিরূপ হয়ে উঠে এসেছে। 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' গল্পে চুনিলাল পূর্বে স্বপ্নে দেখা একটি গলিকে বাস্তবে অনেক পরে আবিষ্কার করেছিল। এই গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়েই পরবর্তীকালে তাঁর ব্যর্থ প্রেমসত্তাকে পূর্ণতা দিয়েছিল।

মনোবিদ ফ্রয়েডের ধারণা অনুসারে, স্বপ্নের মধ্যেও মাঝে মাঝে কল্পনার সৃজনশীল ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়। যে কোনো স্বপ্নের মধ্যেই ভাবনা-চিন্তার নাট্যায়ন (dramatisation) ও চলচ্চিত্রায়ন (cinematisation) ঘটে চলে। 'সংশয়' গল্পে সুধাকান্তের দৃষ্ট ফেয়ারওয়েলের স্বপ্নে সহকর্মীদের আসা-যাওয়া, নিজের একাকী হয়ে যাওয়ার মধ্যে নাট্যায়ন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' গল্পে স্ত্রী শিবানীকে পঙ্গপাল-পিঁপড়ের দলের আক্রমণ বা রাস্তায় হাঁটা একজন অন্ধ মেয়েকে হঠাৎ তুলে নিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন বিলাস দেখেছিল, তার মধ্যেও চলচ্চিত্রায়ন লক্ষ করা যায়। স্বপ্নের এই চলচ্চিত্রায়নে শিবানীর পূর্বকার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা বিলাসের অবচেতনে নিবিড়ভাবে রয়ে যাওয়াকেই ইঙ্গিত করে। তবে, কল্পনার সৃজনশীলতার পাশাপাশি নাট্যায়ন-চলচ্চিত্রায়নের সার্থক প্রকাশ দেখা যায় 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দনের স্বপ্নে। এখানে, শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল চন্দন স্বপ্নে নিজেকে বটগাছ রূপে কল্পনা করেছে। বটগাছ হয়ে সে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তেমনি দুই চোরকে তার ডালে

আত্মহত্যা করতে বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। গল্পকারের শৈল্পিক লেখনীতে স্বপ্নকল্পনার অসাধারণ বর্ণনা—

> 'চন্দন অনুভব করছিল, তার শরীর কিন্তু সমানেই মাটিতে মিশে যাচ্ছে। বুকও গেল। যাক্-যাক্-যাক্ না। বুক যাক্, শেষ দুটি শাখা যাক্, গলা, মাথা—সবই চলে যাক—তবু ওরা দুটিতে বাঁচুক।'[৫১]

বিমল কর বিভিন্ন গল্পে স্বপ্নপ্রতীকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়ায় (dream-work) প্রতীকের নানা মাত্রিক অর্থময়তা প্রতিফলিত হয়। মনোবিদ হ্যাভলক এলিসের মতে, মানুষের স্বপ্ন বিভিন্ন প্রতীকে পরিপূর্ণ। মনের অবদমিত বা অনৈতিক ইচ্ছা সরাসরি প্রকাশিত হতে না পেরে বিভিন্ন প্রতীকের ছদ্মবেশে স্বপ্নে চলে আসে। 'হেমন্তের সাপ' গল্পে ডালিম স্বপ্নে গগনকে গুহার মধ্যে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখেছে। তত্ত্ব অনুসারে 'গুহা' স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক অর্থাৎ গুহা প্রতীকে ডালিমের অবদমিত ও অতৃপ্ত যৌনকামনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'মোহনা' গল্পে ভাগ্য গণনার কাগজটাকে সাপ রূপে স্বপ্নে দেখেছে মোহনা। সাপ সাধারণত পুরুষ জননাঙ্গের প্রতীক। কিন্তু ইয়ুং এর মতে, সাপ হল শয়তানের প্রতীক। এক্ষেত্রে তার জীবনের ধ্বংসের দিকে অগ্রসরণকেই বোঝাতে চেয়েছে। ফুলদা'র কাছে মোহনার স্বীকারোক্তিতে আরেকটি স্বপ্নপ্রতীকের উল্লেখ হয়েছে—

> 'আমি, জানিস ফুলদা, একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি একটা গয়নার বাক্স হয়ে বিজনের আলমারির লকারে ঢুকে গিয়েছি, বিজন লকার বন্ধ করে দিচ্ছে। উরে বাব্বা, সে কী ভয় আমার, গলা শুকিয়ে কাঠ ঘামতে ঘামতে মরি, ঘুম ভেঙে গেল।'[৫২]

ফ্রয়েডের মতে, 'বাক্স' জরায়ুর প্রতীক। এই স্বপ্নের মাধ্যমে মোহনা কেবলমাত্র শরীরীযন্ত্র হিসেবে বিজনের কাছে গৃহীত হওয়ার কল্পনায় কষ্ট পেয়েছে। কেননা, শুধু শরীর দিয়ে সে কারো মন ভোলাতে চায় নি।

অনেক সময়, আমাদের রুদ্ধ (suppressed) যৌন আবেগ বা ইচ্ছা প্রতীকের ছদ্মবেশ ধরে স্বপ্নে উপস্থিত হয়। 'জলজ' গল্পে জলজের নির্জ্ঞান মনে বৈমাত্রেয় ভাই

রন্টুর প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ-দুর্বলতা ছিল। সচেতন মনে স্বীকার না করলেও স্বপ্নের মাধ্যমে তাই উন্মোচিত হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে জলজ নিজেকে নগ্নরূপে প্রত্যক্ষ করেছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে, অবাধ যৌনতার প্রতীক হয়ে নগ্নতা স্বপ্নের মধ্যে চলে আসতে পারে। তাই স্বপ্নে নিজেকে নগ্নরূপে প্রত্যক্ষণ জলজের অবদমিত কামনাকেই প্রতীকায়িত করেছে—

> 'শেষে পাতার ঘূর্ণি। সেখানে রন্টু। পাতায় পাতায় রন্টুর
> ঝোড়ো চেহারা গড়ে উঠল। ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে জলজ
> শুধু পাতায় ঢাকা পড়ল না, তার শ্বাস রোধ হয়ে এল।
> একেবারে নগ্ন সে। মনে, শরীরে।'[৫৩]

স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় আমাদের অস্তিত্বের টানাপোড়েন উঠে আসে। 'সহচরী' গল্পে নবীন আত্ম ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়। প্রেমিকা সরসীর দ্বারা সে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেখেছে। এক অদ্ভুত স্বপ্ন ধরা পড়ে তার অবচেতনে—

> 'সরসী এল। নির্বাস। আসার পর দেখলাম, সে বিনা বাক্যব্যয়ে
> আমার ওপর বসে চকচকে একটা ছোরা আমার বুকে এবং
> কণ্ঠনালীতে কয়েকবার বসিয়ে দিল। দিয়ে আমার দুটি হাত
> বিচ্ছিন্ন করে ছিল, নিম্নাঙ্গ মাটিতে ফেলে দিল, কী আশ্চর্য,
> আমি কণ্ঠহীন, হৃদয়হীন, হস্তপদহীন দরজির দোকানের তুলো
> ভরা নকল উর্ধাঙ্গ মূর্তির মত হয়ে পড়লেও সবই দেখতে
> পাচ্ছিলাম।'[৫৪]

এই বিচিত্র স্বপ্ন যেমন নবীন-সরসীর সম্পর্কের কৃত্রিমতাকে তুলে ধরেছে, তেমনি নবীনের আস্তিত্বিক যন্ত্রণাকে ব্যঞ্জিত করেছে। এই অন্তঃসারশূন্য-অনিকেত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নবীন ক্রমশই বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বহির্বাস্তবতার ক্লেদাক্ততা থেকে মুক্তি পেতে নবীন ক্রমশই নিজের জগতে গুটিয়ে যায়। তার অন্তর্জগতে সক্রিয় হয়ে ওঠে পরাবাস্তবতা (Surrealism) বোধ। ক্রমশ মিলেমিশে যায় চেতন-অবচেতন-অচেতন মনের অনুভূতিগুলি। অস্তিত্বের শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে নবীন ক্রমশ পরাবাস্তব জগতের মধ্যে নিজেকে অন্বেষণ করে। বহির্বাস্তবে নয়, বরং পরাবাস্তবতার অনুভূতিতে সে নিজের সত্তাস্থিত শূন্যতাকে অনুভব করে। সরসীর প্রতি ব্যক্ত করে তার যন্ত্রণাময় অনুভূতি—

'এই দেখো, আমি তোমার নবীন রাস্তায় পড়ে আছি। আমার হাত, পা নেই; আমার গলা জবাই করা। ছাগলের মতন প্রায় দু-খণ্ড; আমার বুক দেখো-মস্ত গর্ত, হৃদপিণ্ড নেই; আমার মুখ চুপসে আছে; মাড়ি বা দাঁত নেই; আমার চোখের মধ্যে তুমি তোমার আঙুল ডুবিয়ে দিতে পার।'[৫৫]

মানুষের পরাবাস্তবতাবোধের এক অসাধারণ ভাষারূপ হল বিমল কর সৃষ্ট 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পটি। বহির্বাস্তবে নদী প্রেক্ষাপট হলেও নন্দকিশোর অধিবাস্তব স্তরে মৃত্যুরূপী মহারাজের সঙ্গে কথোপকথনে মেতে উঠেছে। পরাবাস্তব জগতেই সে জীবন-মৃত্যুর অন্তহীন দ্বিরালাপকে অনুভব করেছে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নন্দকিশোরের অবচেতনে স্মৃতিগ্রস্ত সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা বিনা বাধায় উন্মোচিত হয়েছে। 'মহারাজ' নামে চিহ্নিত মৃত্যুকে সে মানব অবয়বে দেখতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। বরং, পরাবাস্তববোধে তিনি মৃত্যুরূপী মহারাজকে ভিন্ন রূপে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান —

'তারপর কী যেন হল, সে যেন দেখল, লোকটার মুখ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। চোখ নাক মুখ আছে-অথচ সবই কেমন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। জলের তলায় শ্যাওলা ভাসলে যেমন দেখায়-অনেকটা সেইরকম। তার চোখ নাক মুখ স্বাভাবিক আকৃতি হারাচ্ছে। তরল হয়ে গলে গিয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে বুঝি। চোখ দুটো ভাসতে লাগল। নাক বড় হয়ে উঠছিল।'[৫৬]

আমাদের অবচেতনে স্থিত মৃত্যুভয় এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে উত্তীর্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই গল্পে দ্যোতিত হয়েছে। জীবন-মৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে মানুষের অন্তর্জগতের বিচিত্র টানাপোড়েনকে গল্পকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন।

বিমল করের গল্পবিশ্ব জুড়ে মানুষের অন্তর্ভুবনের জিজ্ঞাসু পরিক্রমা লক্ষ করা যায়। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে নানান পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তর্জগতের বিচিত্র ভাষ্যকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গল্পে রূপায়িত করেছেন। তবে শুধুমাত্র স্থান-কালের নিরিখে তাঁর মানব মনস্তত্ত্ব রূপায়ণের দক্ষতা বিচার সমীচীন নয়। বিমলবাবুর গল্পে স্থান-কালের পরিসীমার উর্দ্ধে মানুষের সামগ্রিক মনস্তত্ত্বের অনুপুঙ্খ মাত্রাগুলি শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয়ছে। কোনো বিশেষ শ্রেণি বা নির্দিষ্ট কালের প্রেক্ষিতে

তিনি মানব মনস্তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় ভাষ্য রচনা করেন নি, বরং নির্বিশেষে মানুষের অন্তরমহলের বহুল স্বরকেই তাঁর লেখনী ব্যঞ্জিত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

কোনো মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় তত্ত্ব রূপায়ণ বা তথ্য পরিবেশন করার প্রতি বিমল করের উৎসাহ ছিল না। বহির্জগতের নানা ঘটনা, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মানবমনের অন্তর্জগতে উত্থিত আলোড়নকেই তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুভবী মন্তব্য—

> 'আমার গল্পেও কোনো একটা ইনসিডেন্ট, কোনো একটা কিছু ঘটলো একটা লোকের জীবনে, তারপর ওই যে তরঙ্গটা তার মনের ভেতর তৈরি হলো, তার ভেতরে সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনগুলো হতে শুরু করলো, আমি প্রধানত সেই ব্যাপারটা নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করি।'[৫৭]

মানবজীবনে অন্তর্বাস্তবতার বহুমাত্রিক প্রতিফলনই ছিল গল্পকার বিমল করের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর বিভিন্ন গল্পে মানব মনস্তত্ত্বের বিম্বন যেমন নানান তাত্ত্বিকতাকে প্রামাণ্য করে তুলেছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রে তত্ত্বের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার বাইরে নতুন ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছে। চিরাচরিত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় চেতন-অবচেতন-অচেতন মনের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গল্পে তুলে ধরেছেন। তাই মানবমনস্তত্ত্বের শৈল্পিক রূপায়ণে বিমল কর এক অনন্য স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. 'উপন্যাস ভাবনা' : বিমল কর; 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকা; ৩য় বর্ষ; ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
২. 'উড়োখই' (১): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; মে, ২০০৮, পৃ. ১০-১১
৩. 'কিছু খড় আর কুটো : বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'; 'বিমল করের উপন্যাস: প্রসঙ্গ অসুখের উপমা; সুব্রত ঘোষ; বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ; ২০০৬; পৃ. ২০৩
৪. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ'; সাহিত্য সংখ্যা; ১৩৮২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৯
৫. 'কিছু খড় আর কুটো : বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'; তদেব; পৃ. ২০২
৬. প্রস্তাবনা : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১৯৭৩
৭. 'উড়োখই' (২): বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ১৯৯৭; পৃ. ৮০

৮. ভূমিকা : বিমল কর; একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ; অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স; জানুয়ারি, ১৯৯৮

৯. 'মোহনা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ৪৭৫

১০. 'কাঁটালতা' : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ. ১৭

১১. 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' : বিমল কর; একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ; অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স; জানুয়ারি, ১৯৯৮; পৃ. ৩৭

১২. 'যযাতি': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৩৭

১৩. 'পলাশ': বিমল কর; তদেব: পৃ. ১৮৫

১৪. তদেব; পৃ. ১৮৪

১৫. 'অশ্বত্থ': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২১২

১৬. তদেব; পৃ. ২১৩

১৭. 'উদ্ভিদ' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১১৯

১৮. তদেব; পৃ. ১১৯

১৯. 'জলজ': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৪০১ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৭০

২০. 'শূন্য': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৬৭

২১. তদেব; পৃ. ১৬৮

২২. 'উড়োখই'(২): বিমল কর; তদেব; পৃ. ১২৩

২৩. 'ফ্রয়েড জন্মশতবার্ষিকী': বিমল কর; সাপ্তাহিক 'দেশ'; ১২মে, ১৯৫৬; পৃ. ১৭২

২৪. 'অনাবৃত': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ; পৃ. ১১৩

২৫. তদেব; পৃ. ১১৪

২৬. 'জানোয়ার': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৫৬-১৫৭

২৭. 'অ্যালবাম': বিমল কর; শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকা; পৃ. ১৬৫

২৮. তদেব: পৃ. ১৬৪

২৯. 'বরফসাহেবের মেয়ে': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩৭

৩০. 'আঙুরলতা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২২৬

৩১. 'শীতের মাঠ': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৯৬-১৯৭

৩২. 'দূরে বৃষ্টি': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৫৯৭

৩৩. ভূমিকা: সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠগল্প: বিমল কর; প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

৩৪. 'আত্মজা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১১০

৩৫. তদেব; পৃ. ১০৮

৩৬. তদেব; পৃ. ১০৮

৩৭. '...আমার পরিশ্রমটা অনেকটা মজুরের মতন'; বিমল করের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়; 'দেশ'; ৩ নভেম্বর, ১৯৯০; পৃ. ২৬

৩৮. 'আত্মজা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১০৯

৩৯. 'ভয়' : বিমল কর; কাচঘর; ক্লাসিক প্রেস; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৮

৪০. 'ইঁদুর' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৭

৪১. 'মানসাঙ্ক': বিমল কর; সুধাময়; এভারেস্ট বুক হাউস; ১ম সং; আষাঢ়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; পৃ. ১১৯

৪২. 'নিষাদ': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৯০

৪৩. 'শূন্য': বিমল কর; তদেব; পৃ. ১৬৫

৪৪. 'সুধাময়': বিমল কর; তদেব; পৃ. ২৫৫

৪৫. 'মাছি': বিমল কর; শারদীয় 'দেশ'; ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ; পৃ. ৫১

৪৬. 'বিচিত্র সেই রামধনু': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৬৭৬-৬৭৭

৪৭. তদেব; পৃ. ৬৭৮

৪৮. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯; পৃ. ৩৮৪

৪৯. তদেব; পৃ. ৩৮৪

৫০. 'রামচরিত': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২০৬

৫১. 'মানসাঙ্ক': বিমল কর; সুধাময়; তদেব; পৃ. ১২৯

৫২. 'মোহনা': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৪৭৫

৫৩. 'জলজ': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৪০১ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৭১

৫৪. 'সহচরী': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; পৃ. ৪৮১

৫৫. 'সহচরী': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৪৯০

৫৬. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা': বিমল কর; তদেব; পৃ. ৭১৩

৫৭. 'বিমল করের সঙ্গে কথোপকথন'; 'কর্ণিক' পত্রিকা; জানুয়ারী-মার্চ; ১৯৯৩; পৃ. ৪৬-৪৭

সপ্তম অধ্যায়

প্রকৃতিচেতনা : নিসর্গ ও মানবজীবনের অন্তর্লীন সম্পর্ক

প্রকৃতির বিচিত্র স্পর্শে মানবজীবন প্রতিমুহূর্তে স্পন্দমান। প্রকৃতির সঙ্গে নানাবিধ অভিঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা ক্রম বিবর্তনশীল হয়েছে। মানুষের জৈবিক বিবর্তনের পথে নিসর্গপ্রকৃতির অবদান যেমন সর্বজনগ্রাহ্য, তেমনি তার চেতনাজগত বৈচিত্র্যময় বিকাশের ক্ষেত্রে নিসর্গপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ দ্বারা বারে বারে জারিত হয়েছে। প্রকৃতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণকে মানুষ বারে বারে অমান্য করতে সচেষ্ট হয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও সাহচর্য পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সর্বদা প্রকাশ করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক থাকলেও তার সাহচর্যেই বিবর্তনের মাধ্যমে এই বিশ্বে অভিযোজিত হয়ে চলেছে মানুষ। তাই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যেন এক অদ্ভুত দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান লক্ষণীয়। চৈতন্যহীন প্রকৃতি ও চৈতন্যময় মানবের মধ্যে বাহ্যিকভাবে আপাত বিরোধিতা থাকলেও অন্তর্লীন জগতে তারা একই সঙ্গে একে অপরের পরিপূরকতায় সহায়ক হয়ে ওঠে।

বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনা জুড়ে প্রতিনিয়ত চলেছে নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির আশ্চর্য মেলবন্ধন। হৃদয় মননহীন নিসর্গের কাছে মানুষের হৃদয় বারে বারে আশ্রয় পেয়ে ঋদ্ধ হতে চেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন ক্রমশ অভিযোজিত হয়েছে, তেমনি তার বিকাশে অন্যতম সহায়কও হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক তাই সর্বজনস্বীকার্য। মানুষের 'অস্তিত্বশীল হওয়া'র (to exist) এর ক্ষেত্রে নিসর্গপ্রকৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সত্তাগতভাবে মানুষ অপূর্ণতা বোধ করে, তাই পূর্ণতা লাভের প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ। এই শূন্যতা পূরণ করে প্রকৃতিজগত। এই প্রকৃতিকে আপন সত্তায় অঙ্গীভূত করে সম্পূর্ণতা পেতে চায় মানবজগত। প্রকৃতির নির্যাস থেকেই যেন অগ্রসরণের পাথেয় সংগ্রহ করে নেয় মানুষ।

প্রাচ্য জীবনবোধে ও সংস্কৃতিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় দর্শনভাবনা অনুসারে, এই পাঞ্চভৌতিক জগতে আমাদের অস্তিত্ব

যেন জল-মাটি-আকাশ-বাতাস-আলোর সঙ্গে সমালীন হয়ে আছে। অথর্ব-সংহিতার দ্বাদশ খণ্ডে বর্ণিত ভূমিসূক্ত বা পৃথিবীসূক্তে মানুষ ও প্রকৃতির অপরূপ মিলনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই সূক্তে মহাকালের ধারায় বিশ্বলোকে মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিবিধ মাত্রায় ব্যঞ্জিত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও মানবজীবনে প্রকৃতির অমোঘ প্রভাবকে স্বীকার করা হয়েছে। বেদে প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে। পাঁচটি 'ভূত' পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের মিলনে সৃষ্ট মানবজীবন। নিসর্গপ্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই কোনো না কোনো না ভাবে মানুষের প্রাণধারণের চালিকাশক্তি রূপে চিহ্নিত। তাই আমাদের জীবনায়নে প্রকৃতি একইসঙ্গে আধার ও আধেয় হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

মানুষ ও প্রকৃতির এই অন্তর্লীন সম্পর্ক নানা বিচিত্র সংবেদনায় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় ধারার সাহিত্যে বিভিন্ন সাহিত্যস্রষ্টার লেখনীতে নিসর্গ-মানুষের এই দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক নান্দনিক মাত্রায় রূপলাভ করেছে।

মানবজীবন প্রবাহে নিসর্গপ্রকৃতির এই সম্পৃক্ততা সাহিত্যিক বিমল করের বিভিন্ন ছোটগল্পে বারে বারেই ভাষ্যময় হয়ে উঠেছে। তাঁর শিল্পিত লেখনীতে প্রকৃতি নিজের মূকময়তা অতিক্রম করে মানুষের জীবনে অনুভূতিশীল সত্তা হিসেবে সমান্তরাল বিন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি নির্মোহ-নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেন নি, বরং প্রকৃতির রহস্যময় সত্তার বৈচিত্র্যময়তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। অন্যান্য গল্পকারদের মতোই বিমল করের গল্পেও প্রকৃতির উপস্থিতি অনিবার্যভাবেই এসেছে মনে করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাঁর গল্পবিশ্বে প্রকৃতি শুধুমাত্র বর্ণনীয় বিষয় কিংবা পাঠ-উপভোগের প্রসঙ্গ হয়ে আসেনি, মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা ও আত্ম অন্বেষণের সঙ্গী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনের নানান প্রেক্ষিতে কোনো গল্পে প্রকৃতি নিজেই উপমেয় হয়েছে, কখনো বা উপমান হয়ে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় উঠে এসেছে। প্রকৃতি চেতনার ক্ষেত্রে বিমল কর কখনোই রবীন্দ্রিয় বা বিভূতিভূষণীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সর্বতোভাবে আবিষ্ট হন নি। রাবীন্দ্রিক ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে রহস্যময় ঐশীশক্তির সর্বব্যাপকতাকে অন্বেষণ করতে আগ্রহী হন নি। আবার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিমল কর প্রকৃতির বন্দনা করেন নি। এমনকি, নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের অতীন্দ্রিয়বাদী মুগ্ধতাও তাঁর গল্পে লক্ষণীয় নয়। আবার জীবনানন্দের মতো প্রকৃতির

সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মায়াও তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তাঁর গল্পে নিসর্গপ্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কিন্তু একই সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যে বিম্বিত হয়েছে। প্রকৃতির সাহচর্যে মানুষের জীবনবোধ ও মনোজগত যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি মানুষেরই অপর সত্তা হয়ে কখনো প্রতিস্পর্ধীতায় প্রকৃতি স্বয়ং চরিত্র হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতীকায়িত হওয়ার পাশাপাশি নিসর্গপ্রকৃতি নানান গল্পে মানুষের আত্ম-অন্বেষণের সহায়ক ও দার্শনিক উপলব্ধির চিহ্নায়ক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বিমল করের প্রকৃতিচেতনা তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কায়িত।

বিমল করের সৃষ্ট গল্পভুবনে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক বিন্যাস তেমনভাবে গুরুত্ব পায় নি। বিশেষ কোনো স্থানিক পটভূমির নিসর্গ বর্ণনায় তিনি মনোযোগী নন। অগ্রজ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ-তারাশংকর কিংবা অনুজ সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো এক্ষেত্রে বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতির প্রাণবন্ত অনুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষ করা যায় না। বাংলা ও বাংলার বাইরে নানা অঞ্চলের প্রকৃতি বিভিন্ন গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিকতার মানদণ্ডে তাঁর গল্পের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করা যায় না। ছোটবেলায় বাবা-কাকার কর্মসূত্রে তিনি বাংলা-বিহার-বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথনমূলক গ্রন্থ 'উড়োখই'তে বাংলার আসানসোল, ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ, বিহারের ধানবাদ-ঝরিয়া ইত্যাদি রেলশহর ও কোলিয়ারি অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে রয়েছে তারই পরিচয়—

> 'আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে ধানবাদ, আসানসোল,
> কুলটি, মাঝে মাঝে হাজারিবাগ, আর ঝরিয়া কয়লাখনির
> দিকে। কলকাতায় আসি কলেজে পড়ার সময়।'[১]

তাই বিমল করের প্রথম দিকের বিভিন্ন গল্পে ছোটোনাগপুর মালভূমি সন্নিহিত বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ড সীমানার শুষ্ক-রুক্ষ প্রকৃতির বর্ণনা দেখা গেছে। বহির্বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল অর্থাৎ বিহারের ছোটনাগপুর সংলগ্ন মালভূমি অঞ্চল, ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ অঞ্চলের পাথুরে-পাহাড়ি প্রকৃতি একাধিক গল্পে পটভূমি রূপে উঠে এসেছে। এছাড়া ধানবাদ-ঝরিয়া-আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনি এলাকার নিসর্গপ্রকৃতির নানা রূপ ভিন্ন ভিন্ন গল্পে প্রতিবেশ তৈরি করেছে। লেখকের কথায়—

> '...'বরফসাহেবের মেয়ে', 'মানবপুত্র', 'কাচঘর' এবং অন্যান্য

কিছু গল্প কোনোটারই পটভূমি কলকাতা নয়। 'পিয়ারীলাল বার্জ'ও শহুরে কলকাতার গল্প নয়। এই সব গল্পের পটভূমি মফস্বল; বাংলা-বিহার সীমান্তের কোনো কয়লাখনি অঞ্চল হয়তো কখনও বা কারখানা-শহর, রেলশহর।'[২]

'কাঁটালতা', 'নরকে গতি', 'সোপান', 'সুখ' ইত্যাদি গল্পে কলকাতা থেকে দূরের এই সীমান্ত সংলগ্ন প্রাকৃতিক পটভূমি গুরুত্ব পেয়েছে। বিহারের ছোটনাগপুর সন্নিহিত পাহাড়ি অঞ্চলের প্রকৃতি 'কাঁটালতা' গল্পে পটভূমি রূপে এসেছে। 'সোপান' গল্পে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত এলাকা, 'সুখ' গল্পে সাঁওতাল পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়ে চলেছে। আবার 'অপহরণ' গল্পে হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গল্পের নানা অনুষঙ্গে ফুটে উঠেছে। প্রবাসী সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের সাহিত্যে এবং রমাপদ চৌধুরীর গল্প-উপন্যাসে বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের কয়লাখনি অঞ্চল বা রেলওয়ে এলাকার প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। সুবোধ ঘোষের রচনায় এই অঞ্চলের মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রতিফলন বিমল করের ভাবনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। লেখকের কথায়—

'সুবোধ ঘোষের লেখায় যে সোসাইটির চেহারা পাই বিহার বর্ডারের—কিছু বাঙালি কিছু বিহারী অধ্যুষিত সেটা আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে।'[৩]

বাংলা-বিহার সংলগ্ন এলাকার নিসর্গপ্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপ তাঁর একাধিক গল্পে উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে, পড়াশুনার জন্য ও সাংসারিক জীবনের টানে তিনি কলকাতা শহরে চলে আসেন। ফলে অনেক গল্পে কলকাতাসহ বিভিন্ন শহুরে অঞ্চলের প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জীবন কাটানোর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতির প্রতি লেখকের মনোজগত আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। বাংলার কোনো বিশেষ অঞ্চলের নিসর্গপ্রকৃতির আধারেও গল্পগুলি রচিত হয় নি। এইসব গল্পে বাংলার বাইরের বিভিন্ন জনপদের নিজস্ব প্রকৃতি বা কলকাতাকেন্দ্রিক শহুরে অঞ্চলের প্রকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। নানা গল্পে বাংলা অপেক্ষা বিহার-ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকার প্রকৃতির প্রসঙ্গ উঠে এলেও তা কোনো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে তেমনভাবে প্রতিফলিত করেনি। তবে বিমল করের ছোটগল্পের ধারায় বাংলার গ্রামীণ

প্রকৃতির সার্থক উপস্থাপনের আস্বাদন থেকে প্রায়শই বঞ্চিত থেকেছে পাঠক-পাঠিকাগণ। পারিবারিক জীবন ও কর্মসূত্রে শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় বহির্বঙ্গে অতিবাহিত করলেও মধ্য-যৌবনকাল থেকে তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাসত্ত্বেও, তাঁর গল্পে গ্রামীণ বাংলার নিসর্গপ্রকৃতি কোনো বিশেষ মাত্রায় উপস্থাপন হতে দেখা যায় নি। গ্রামবাংলার সার্থক প্রকৃতিচিত্রণের ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যর্থতার কথা স্বয়ং গল্পকারই স্বীকার করেছেন —

> 'যে বাংলাদেশ, বাংলার জল-বাতাস, মানুষ, তাদের ক্রিয়াকর্ম অনেক বাঙালি সাহিত্যিকের উপজীব্য হয়েছে, দুঃখের বিষয় আমার তা হয় নি। আমি একটিও বাংলার গ্রাম্যচিত্র রচনা করতে পারিনি। আমি হয় শহুরে মানুষের কথা লিখেছি, না হয় বাংলার বাইরের কোনো জনপদের। স্বীকার করব, এই ব্যর্থতা আমার আছে।'[৪]

বিমল করের গল্পজগতে সর্বদা অনিবার্য সত্য হয়ে উপস্থিত হয়েছে নিসর্গপ্রকৃতি। নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক পরিসরের প্রকৃতি এক্ষেত্রে প্রাধান্য না পেলেও নিসর্গজগত বৈচিত্র্যবর্ণিলতায় গল্পের কাহিনি-বিষয়-প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিসর্গের জল-মাটি-আলো-আগুন-আকাশ-বাতাসের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজস্ব জীবনবোধের সন্ধানী হয়েছে। প্রকৃতির সান্নিধ্য ব্যতীত স্বল্পায়ু জীবনে মানুষের জীবনাভূতি কখনোই পূর্ণতার স্বরূপকে উপলব্ধ করতে সমর্থ হয় না। মানবপ্রকৃতির জীবনায়নে নিসর্গপ্রকৃতির এই চিরন্তন প্রভাবকেই বিমল কর গল্পের অন্তর্বস্তুতে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে —

> 'আমার মনে হয়েছে প্রাকৃতিক পট-পরিবেশ, আকাশ, নদী, গাছপালা—এই সবকিছুর মধ্যে মানুষের পরিচয়টুকু জড়িয়ে রয়েছে। আত্মানুসন্ধান অথবা আলোর জন্যে ব্যাকুলতা, এতো চিরকালের ছবি। এ-সব কিছুই আমার সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি।'[৫]

তাই নিসর্গপ্রকৃতি তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি রূপে সজীব হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের অজস্র অনুভূতি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রতিফলিত হয়ে চলে প্রকৃতিতে। বিমল

করের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি কেবল দর্শনীয় বা উপভোগ্যতার বিষয় নয়, বরং আমাদের জীবনের চিরন্তন ধারক। প্রকৃতির মধ্য দিয়েই মানুষ যেন জীবনের বহমানতাকে উপলব্ধি করতে চায়। 'জননী' গল্পে বসন্তের এক সান্ধ্য প্রকৃতির পটভূমিতে মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানরা আত্মজিজ্ঞাসায় অবগাহন করেছে। নিসর্গপ্রকৃতিই পাঁচ সন্তানকে নিজস্ব অনুভূতির উৎসারণে প্রাণিত করেছে। প্রকৃতির মায়াময় পটভূমিতেই আলোড়িত হয়েছে সবাই। গল্প কথকের ভাষ্য—

> 'স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো
> কদম গাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে।
> করবীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে যাচ্ছিল,
> শব্দ হচ্ছিল পাতার। আমরা আমাদের ছায়ার নকশা থেকে
> চোখ তুলে কখন যে শূন্য দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানে না।'[৬]

চৈত্রমাসের এই সন্ধ্যার প্রকৃতির আবহে পাঁচ সন্তান নির্মোহ দৃষ্টিতে মায়ের সঙ্গে নিজেদের বাৎসল্য সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছে। তাই বাগানে মায়ের বেদীর সামনে আকাশ-বাতাস-চাঁদ-নক্ষত্রকে সাক্ষী রেখে সন্তানরা ভালোবাসার মন-সাহস-ভরসা-স্বার্থত্যাগ ও হৃদয়ের দৃষ্টিতে পূর্ণ করে মৃত্যুপরবর্তী যাত্রাপথে জননীকে এগিয়ে দিয়েছো। একইভাবে 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে শিবানীর জ্বলন্ত মৃতদেহের সামনে তিনজন প্রেমিক আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছে। ফাল্গুনের শেষে নদীর চড়ায় অপরাহ্নবেলার প্রকৃতিই তিনজনকে স্বকৃত অন্যায়ের স্বীকারোক্তিতে সাহায্য করে—

> 'নদীর দিকে অপরাহ্নের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমরা
> তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা,
> কখনো পায়ের তলার ঘাসমাটি দেখছিলাম।'[৭]

এই প্রাকৃতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনজন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা-কৌমার্য-নির্ভরতা হরণের অন্যায়কে কবুল করেছে। 'পলাশ' গল্পে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অপরাহ্নের অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে রতিকান্ত ও উমার মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে উমার প্রতি নিজের সুপ্ত অথচ তীব্র ভালোবাসার অনুভূতিতে ভরে উঠেছে রতিকান্ত। 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পে কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় শিবতোষ বন্ধু রাজশেখর স্ত্রী সুনন্দাকে অধ্যাসময় দৃষ্টিতে দেখেন।

আর সুনন্দার প্রতি তাঁর অব্যক্ত ভালোবাসাকে আজীবন বহন করে চলেন। মায়াবী সান্ধ্য প্রকৃতি ক্ষণিকের জন্য হলেও শিবতোষের চেতনায় সুনন্দার প্রতি অবদমিত ভালোবাসাকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। আবার বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতির রুক্ষতা-ভয়ংকরতার মধ্যে জলকুর আক্রোশ বিম্বিত হয়েছে 'নিষাদ' গল্পে। 'অবিশ্বাস্য' গল্পে জ্যোৎস্না-প্লাবিত পাহাড়ি অঞ্চল কিংবা 'শীতের মাঠ' গল্পে শীতকালীন রুক্ষ-শুষ্ক মাঠের পটভূমি গল্পের মূল বিষয় পরিস্ফুটনে সহায়তা করেছে। 'অশ্বত্থ' ও 'পলাশ' গল্পেও পটভূমি হিসেবে নিসর্গপ্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'কাম ও কামিনী' গল্পে নিসর্গ পটভূমিতেই গল্পের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ করা যায়। 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে প্রকৃতির স্পর্শে নন্দকিশোর জীবন-মৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতাকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে। তাই বলা যায় নিসর্গপ্রকৃতি পটভূমি রূপে বিমল করের গল্পের প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিমল করে'র একাধিক গল্পের কাহিনিবিন্যাস ও ঘটনার অগ্রগতিতে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। 'ইঁদুর' গল্পে বর্ষণমুখর রাত্রি গল্পের কাহিনিকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রবল বর্ষায় সিক্ত বাসুদেবের অসহায় অবস্থা মলিনীর কাছে নিজের মনের সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করে দেয়। 'কাঁটালতা' গল্পে ঝড়-বৃষ্টিতে কাঁটাজঙ্গলের মধ্যে বসন্ত-প্রশান্ত-সুনয়নীর মনের মধ্যে মায়ের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন পরিস্ফুট হয়েছে। নিসর্গপ্রকৃতি বর্ণনায় বিমল করের শৈল্পিক নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। প্রকৃতির উপস্থাপনায় তিনি পূর্বজ বা সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যিকের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিমল কর প্রকৃতিকে অবলোকন না করলেও জীবনানন্দের মতো প্রকৃতির সঙ্গে সচেতনভাবেই একাত্ম হতে চান নি। রোমান্টিক দৃষ্টিবোধ থাকলেও তাঁর লেখনী অতিশয় আবেগময় বর্ণনা থেকে মুক্ত থেকেছে, বিভূতিভূষণের মতো রোমান্টিক অতীন্দ্রয়তাবোধের প্রকাশ সেখানে দেখা যায় না। আবার ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন হয়ে বিমল কর নিসর্গ প্রকৃতি বর্ণনায় মেতে ওঠেন নি। বরং কল্পনার স্বকীয়তায় তিনি প্রকৃতিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরের প্রকৃতি বর্ণনায় তারই প্রমাণ রয়েছে—

> 'দুপুরের রোদ দেখে মনে হচ্ছে, যে বিরাট চৌবাচ্চায় সারা
> সকাল দুপুর ভরে রোদ জমা হয়েছিল যেন তার জল বেরোবার

মুখটা খুলে গেছে হঠাৎ–আর কল কল করে রোদ বেরিয়ে
চৌবাচ্চা খালি হয়ে যাচ্ছে।'[৮]

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো প্রেমিক পুরুষের দৃষ্টিতে নিসর্গকে পর্যবেক্ষণ করতে চাননি বিমল কর; তবে প্রকৃতির সৌন্দর্যময়তা দর্শনের প্রতি ছিল তাঁর অপার আগ্রহ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র সংবেদনায় বিভিন্ন গল্পে নানা মাত্রায় প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভূত হয়েছে। 'অশ্বত্থ' গল্পে এক হেমন্তের সন্ধ্যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণিত —

'উঠোনের ওপর এলিয়ে-পড়া অশ্বত্থের ডালপালায় নীলের
রং মেশানো অপরূপ জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। যেন রূপোর
জলে একরাশ ডুবানো পাতা ভাসছে। ভিজে-ভিজে, নরম
এবং মসৃণ ! সেই পাতার জাফরি গলিয়ে উঠোনের সিমেন্টে
কেমন এক ছায়া-বোনা চাঁদের আলো লুটিয়ে রয়েছে।'[৯]

বিমল করের গল্পে প্রকৃতি নিছকই চিত্র হয়ে থাকেনি, বরং চিত্রময়তার সঙ্গে স্রষ্টার কল্পনার রসায়নে স্পর্শময় চিত্রকল্পে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চিত্রধর্মিতার সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতি আমাদের কল্পনার জগতকে নানা সূক্ষ্ম অনুভবে নিষিক্ত করে। 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পে শিবতোষ মৈত্রে'র চোখে মধ্যপ্রদেশের বারকিবুইয়ার কোলিয়ারি অঞ্চলের প্রকৃতি এক সন্ধ্যায় চিত্রকল্পময় হয়ে ধরা পড়েছিল—

'সেই নীল কুয়াশা গাঢ় হতে হতে আচমকা যেন উজ্জ্বল হয়ে
উঠল। তারপর আগুনের শিখার মতন জ্বলতে লাগল।
অদ্ভুত দৃশ্য। সহস্র নীল শিখা যদি ক্রমাগত দমকা বাতাসে
কাঁপতে থাকে যদি ঢেউয়ের মতন ফণা তুলে এক পাশ
থেকে আরেক পাশে ক্রমাগত আছড়াতে থাকে—কেমন
লাগতে পারে।'[১০]

'নিষাদ' গল্পেও চিত্রকল্পের অনবদ্যতায় রৌদ্র-তপ্ত গ্রীষ্ম প্রকৃতির রূঢ়তা-ক্রূরতাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। 'কাঁটালতা', 'পলাশ', 'সুধাময়', 'আত্মজা' ইত্যাদি গল্পেও চিত্রকল্পের শৈল্পিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চিত্রকল্পের মাধুর্যে নিসর্গপ্রকৃতি লৌকিক জগত ছেড়ে অলৌকিক রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর গল্পে সমুদ্র-পর্বতের বিশালতার ধ্রুপদী বর্ণনা নেই, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতির তুচ্ছ বিষয়েরও সূক্ষ্ম বর্ণনা আছে।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে তিনি অনুপুঙ্খভাবে (detailing) প্রকৃতিকে পাঠকের সামনে এনেছেন। বিভিন্ন গল্পে এই অনুপুঙ্খ নৈসর্গিক বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে—

> 'নদী থেকে বাতাস আসছে দমকে দমকে, বাগানের বড়
> শিশুগাছের পাতা খসে পড়ছে, মহুয়াগাছের তলায় চাঁদের
> আলো জাফরি কেটে খেলা করছে আপনমনে, দু-দশটা ফুলের
> গাছ জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে আছে।'[১১]

কাব্যময়তার মেদুর স্পর্শে বিমল করে'র গল্পে প্রকৃতিবর্ণনা এক স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। ছোটগল্পকার কমলকুমার মজুমদার চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেছেন। কিন্তু কাব্যিক দৃষ্টিময়তায় বিমল কর প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী ছিলেন। 'বকুলগন্ধ', 'মানসাঙ্ক', 'অপহরণ' প্রভৃতি গল্পে এই কাব্যিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যময়তার মধ্যে রহস্য ও সৌন্দর্য উভয়ই নিহিত থাকে। 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দনের প্রকৃতির সঙ্গে সাঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার অনুভূতি কাব্যিক মূর্চ্ছনায় দ্যোতিত হয়েছে। 'অপহরণ' গল্পে গল্পকার কাব্যময়তার মেদুরতায় জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যার বর্ণনা করেছেন। 'সুধাময়' গল্পে নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণনায় এমনই এক কাব্যময়তার উদ্ভাস —

> 'কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে, সেই ফিনকি–ছোটা জ্যোৎস্নায়
> নদীর জল যখন রূপোর পাতের মতন ঝকঝক করছে,
> কলকল একটা শব্দ উঠে বাতাসে মিশ খেয়ে গেছে, ঝিঁ ঝিঁ
> ডাকছে, জোনাকি উড়ছে, কেমন এক আশ্চর্য গন্ধ, চর আর
> বুনো লতাপাতা ফুটফুটে আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের ঘোরে
> ফিসফিস করে উঠছে–বিশ্ব-চরাচর শান্ত, স্তব্ধ, সমাহিত...'[১২]

বিমল করের গল্পে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে শীত ঋতুর নিসর্গপ্রকৃতি। প্রথম পর্বের গল্প থেকে পরিণত পর্ব পর্যন্ত বেশিরভাগ গল্পেই শীতঋতুর বিচিত্র রূপময়তা পরিস্ফুট হয়েছে। এক্ষেত্রে, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের শীতের রূপের বর্ণনা প্রাধান্য পায় নি। বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের তথা বাংলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের শীত ঋতুর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'সোপান' গল্পে বিহার-উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শীতের মায়াবী বর্ণনা রয়েছে—

'শীতের রোদ খুব ঘন এবং হলুদ হয়ে এসেছে, যেন সকাল থেকে নীল অনন্ত আকাশে মাঘের রোদ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, ফুটে ফুটে এখন তা ঘন ও ঠাণ্ডা হয়ে পুরু একটা সর পড়ে গেছে রোদের।'[১৩]

জীবনানন্দ দাশের কবিতাবিশ্বে ছিল হেমন্তের প্রাধান্য। আর বিমল করের গল্পজগতে রয়েছে শীত ঋতুর সরব সমারোহ। 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া', 'উদ্বেগ', 'সম্পর্ক', 'মোহনা', 'কাঁটালতা', 'সুখ', 'বিচিত্র সেই রামধনু' ইত্যাদি গল্পে শীতের নৈসর্গিক আবহের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কুয়াশাময় শীতের প্রকৃতি নানা প্রসঙ্গে গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে। তাঁর গল্পে 'কুয়াশা' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যা রহস্যময়তাকে প্রায়শই ইঙ্গিতবহ করে তুলেছে। কোনো কোনো গল্পে শীত ঋতুর মাধ্যমে আমাদের জীবনচর্যার নানা প্রসঙ্গ ইঙ্গিতধর্মিতায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, 'শীতের মাঠ' গল্পে শীতকালে মাঠের শূন্য-রিক্ত রূপের মধ্য দিয়ে অসুস্থ নবেন্দুর জীবনের নিঃসঙ্গতা-একাকিত্ব প্রতিফলিত। একইসঙ্গে শীতের শুষ্কতা-রুক্ষতার মধ্য দিয়ে অতসী-নবেন্দুর দাম্পত্য সম্পর্কে উষ্ণতার অভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আবার 'সোপান' গল্পে নিয়তিরূপী শীতের অন্ধকারে এক প্রাচীন মিনারে আরোহণকারী পরিবারের মানুষজন জীবনে একাকী পথচলার সত্যকে অনুধাবন করেছে। শীতের মায়াবী সন্ধ্যায় তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দ্বিচারী মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কোনো এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে সন্তানের পিতা হিমাংশু হঠাৎই এক আত্ম আবিষ্কারে রত হবে—

'শীতের কুয়াশায় সমস্ত আচ্ছন্ন; পাশের বাড়িটাও হারিয়ে গেছে। হয়ত অমনিই হবে—স্নেহের আর পিতৃত্বের কুয়াশায় হিমাংশুর সত্য পরিচয় ঢাকা ছিল।'[১৪]

কোথাও আবার শীতকাল যেন মানুষের জীবনের ওঠাপড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। 'গগনের অসুখ' গল্পে শীতকাল যেন গগনের জীবনে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। জীবনের উষ্ণতাকে হারিয়ে শীতঋতুই তাঁর সঙ্গী হয়ে হাজির হয়েছে। 'গগনের অসুখ' গল্পে শীতকাল যেন গগনের জীবনের নির্দেশক হয়ে ওঠে —

'গগন এ-ঘরে আছে। এখানেই থাকবে গগন। শীত আসবে, শীত যাবে; আবার শীত আসবে। গগন জানে তার ছোটমামা

নেই, তার ছোটমামা তাকে শীতের পর নিয়ে যেতে আসবে না।'[১৫]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কায়নকে গল্পকার বিমল কর নানা গল্পে বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন। এই বিশ্বজগতে মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতির পারস্পরিক পরিপূরকতা সর্বজনগ্রাহ্য। তাঁর গল্পে নিসর্গপ্রকৃতি শুধুমাত্র পটভূমি-আবহ বা অনুষঙ্গ হয়ে উপস্থিত হয় নি, বরং মানুষের জীবনে অজস্র অনুভূতি-যন্ত্রণা-ভালোবাসা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে ভাষাময় হয়ে উঠেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে নিঃসঙ্গতা-মানসিক যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকতে চেয়ে মাঠকেই আরো নিবিড় করে পেতে চেয়েছে নবেন্দু। 'অশ্বত্থ' গল্পে সন্তানহারা রেণু মাতৃত্ববোধের অতৃপ্তিতে প্রকৃতির কাছে ছুটে গেছে। হৃদয়হীন বিশাল অশ্বত্থ গাছকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে তার যন্ত্রণাদগ্ধ মাতৃহৃদয় তৃপ্তি লাভ করেছে। এখানে প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ানুভূতির শরিক হয়ে উঠেছে। মানবজীবনে প্রকৃতির এই মরমি সাহচর্য গল্পকারের লেখনীতে নান্দনিক হয়ে উঠেছে। 'অশ্বত্থ' গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিমল করের প্রকৃতিভাবনার স্বাতন্ত্র্যতাকে চিহ্নিত করেছেন—

> 'বিমল কর অধিকতর স্বতন্ত্র মাত্রায় প্রকৃতিকে গল্পে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও গল্পে প্রকৃতি-মানুষের সম্বন্ধের বিষয়টি এমন অভিনবত্ব পেয়েছে, যা শুধু বিমল করের গল্পে পাওয়া গেল।'[১৬]

'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে শিবানীর দেহ সৎকারের পর তিনজন প্রেমিকপুরুষকে সন্ধ্যায় চাঁদের আলো ভুবনের প্রেমসত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। 'আত্মজা' গল্পে বিপর্যস্ত হিমাংশু হাতের শিরা কাটার পর প্রকৃতির পরিসরেই সন্তানকে শেষ বারের মতো কাছে পেতে আকুল হয়েছে —

> 'এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই আকাশ যেন দেখতে পেল হিমাংশু, খানিকটা আকাশ এবং ক্রিমসন রঙের একটি মেঘ। মেঘ— মেঘ। না, মেঘ নয়; মেয়ে। হিমাংশুর মেয়ে, যার নাম পুতুল, বয়স পনেরো বছর নয়, পনেরো দিন।...পনেরোটি পাপড়ি যেন আরো খুলে যায়, একে একে একটি করে—

আর এক একটি পাপড়িতে একটি করে বছর বিকশিত হয়ে
ওঠে।'[১৭]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই একাত্মতা পরম সত্য। এই সত্যকে স্বীকার করেই যেন বিমল করে'র গল্পের চরিত্ররা প্রকৃতির অন্তরমহলে প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে প্রকৃতিও এগিয়ে এসে মানবজীবনে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দনের কিশোর মন জানালার বাইরের বটগাছের সঙ্গে অজানা এক সম্পর্কের টানে জড়িয়ে পড়ে। শারীরিক সামর্থ্যে ব্যর্থ হবে জেনে ছোট্ট চন্দন প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে মনোগত কামনাকে পূরণ করতে চায়। চেতন-অবচেতনের দোলাচলে সে ক্রমশই বটগাছ হয়ে ওঠার মায়াবী অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে—

'আবিল ভাবটা কেটে যাবার পর চন্দন অনুভব করল, সে
আর চন্দন নেই, বাইরের বটগাছ হয়ে গেছে। যেন চন্দন তার
মন এবং প্রাণ নিয়ে এই বটগাছের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।'[১৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনতুলসী' গল্পেও প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পরের প্রতি একীভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে। 'বনতুলসী' গল্পে বনতুলসীর জঙ্গলে নায়ক প্রকৃতির মধ্যে নারীসত্তাকে অঙ্গীভূত রূপে অনুভব করেছিলেন। তেমনি বিমল করে'র 'উদ্ভিদ' গল্পেও পূর্ণেন্দু আপন অনুভূতিতে উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে চেয়েছে। প্রকৃতির সংস্পর্শে সে স্বীয় অস্তিত্বগত শূন্যতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। প্রেমের অনুভব প্রকাশে ব্যর্থ উদ্ভিদবিদ্যার এই অধ্যাপক নিজেই যেন 'ক্রিপার' বা লতানো উদ্ভিদের মতো আচরণ করেছে। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের বাবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য থেকেই সুধাময়ের জন্ম হওয়ার কথা উপলব্ধি করেন। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, প্রকৃতির নানা উপাদানে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দের সঙ্গে এই সন্তান পৃথিবীতে এসেছে। আর 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দন স্বয়ং বটগাছ হয়ে উঠতে চায় এবং গাছ হয়ে দুই যুবক-যুবতীকে অন্যান্য মানুষের আক্রোশ থেকে বাঁচাতে উদ্যোগী হয়।

প্রকৃতি ও মানুষের এই পারস্পরিক সাহচর্যের কাহিনি বিমল করের গল্পে রূপায়িত হয়েছে। বিমল করে'র গল্পভুবনে বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রের নামে প্রকৃতির ছোঁয়া আছে। আঙুরলতা-মোহনা-ডালিম-হৈমন্তী-চন্দনা-তুষারকণা-তরুলতা প্রমুখ নারী চরিত্রের পাশাপাশি চন্দন-

গগন ইত্যাদি নামে পুরুষ চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন গল্পকার।

জীবনে চলার পথে নানা বিপন্নতা-যন্ত্রণায় বিমল করে'র বিভিন্ন গল্পের চরিত্ররা প্রকৃতির সাহচর্যে মুক্তি পেতে আগ্রহী। নিসর্গ হয়ে উঠেছে তাদের পরম আশ্রয়স্থল। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণু প্রকৃতির মধ্যেই বাৎসল্য রসের সন্ধান করেছে। সন্তানকে হারানোর ক্ষেত্রে প্রথমে অশ্বত্থ বৃক্ষটির প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করলেও শেষে তাকে সন্তান স্নেহে আপন করেই রেণু অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে। 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' গল্পে গল্প-কথক মনুষ্য জীবনের জটিলতা থেকে সরে গিয়ে মেঘ-পাখি হতে চান। কখনো বা তাঁর গল্পের কোনো কোনো চরিত্র অন্তর্জ্বালা থেকে বাঁচতে প্রকৃতিতে আশ্রয় খুঁজেছে। 'বকুলগন্ধ' গল্পে প্রেমিক শ্যামলকে জীবনে পায়নি অঞ্জনা। যে বকুল তলায় তাদের প্রেমের সূচনা, সেই বকুলফুলকে স্পর্শ করে, ঘ্রাণ নিয়ে অঞ্জনা শ্যামলের ভালোবাসাকে অনুভব করতে আকুল হয়েছে। সারারাত বকুলতলায় কাটিয়ে যে নিজেই যেন বকুলগাছের সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেছে—

> 'অনেক গোহাগে গা মন ভরে, অনেক গন্ধ আর ফুল নিয়ে
> ও গাছপাথর হয়ে গেল এ-জীবনে।'[১৯]

সহাবস্থান সত্ত্বেও নিসর্গ ও মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বান্দ্বিকতা সর্বদা বর্তমান। গল্পকার প্রকৃতি আর মানুষের এই দ্বন্দ্বময় সম্পর্ককেও পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। এই বিশ্বজগতে জড়ময় নিসর্গজগত ও প্রাণময় মানবজগতের মধ্যে প্রায়শই অস্তিত্বের আধিপত্য নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, ফলে বারে বারে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। কিন্তু যথার্থ উত্তর নিয়েও রয়েছে অজস্র সংশয়। 'উদ্ভিদ' গল্পে বটানির লেকচারার পূর্ণেন্দুবিকাশের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই উত্তরহীন প্রশ্ন —

> '....হু ইজ্ মোর সুটেবল্ টু দিস্ আর্থ, অ্যানিমালস্ অর
> প্ল্যান্টস্ ? অর্থাৎ কোন জীবন উপযুক্ত বেশি; সেই জীবন,
> যা রেসপন্ড্ করতে পারে, রি-অ্যাক্ট করতে জানে, প্রয়োজনে
> হিংস্র, ক্রুয়েল–অথবা অসহায়, অনড়, মূক জীবন–যা
> সম্পূর্ণভাবেই দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে আয়ু আর ক্ষুধা
> নিয়ে পড়ে আছে।'[২০]

প্রকৃতপক্ষে, আপন সত্তার সঙ্গে মানুষ যুগে যুগে প্রকৃতিকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে। সত্তাবাদীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রকৃতি হল 'স্ব-স্থিত সত্তা', আর মানুষ হল 'স্ব-হেতু সত্তা'। প্রকৃতির অনুভূতিকে আত্মস্থ করেই মানুষ 'জগৎ-মধ্যস্থ-সত্তা'য় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। প্রকৃতিকে অস্বীকার করে মানুষের পক্ষে আত্ম-অন্বেষণ সম্ভব নয়। বরং, আত্মতার মধ্যেই প্রকৃতিকে পেতে চেয়েছে মানুষ। গল্পকার বিমল করে'র 'শীতের মাঠ' গল্পে নিসর্গ ও মানুষের সত্তাগত সম্পর্ক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অসুস্থ নবেন্দু জানালার পাশে একাকী অবস্থায় একমাত্র পাশের মাঠটিকেই সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। মূক নির্জন প্রান্তর তাঁর সত্তাগত শূন্যতাকে নীরবে দ্যোতিত করেছে। শীত ঋতুতে সকালের আলোয় সে মাঠটাকে নিজের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে অনুভব করেছে—

> 'আরও বেলায় সমস্ত মাঠটা উজ্জ্বল, শীতের গাঢ় তপ্ত রোদ টলটল করছে। আমলকির ঝোপটার দিকে চেয়ে চেয়ে নবেন্দুর মনে হয়, এখন মাঠটা যেন এক ধরনের জীবনের মধ্যে গলে গেছে।'[৯]

প্রত্যেক মানুষের 'সত্তা'র (self) ক্ষেত্রে 'অপর' (other) হয়ে ওঠে নিসর্গপ্রকৃতি। প্রকৃতি ব্যতীত কোনো মানুষের সত্তাগত পূর্ণতার উপলব্ধি হয় না। 'উদ্ভিদ' গল্পে পূর্ণেন্দু'র জীবনে উদ্ভিদই যেন 'অপর' সত্তা হয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দনের ভাবজগত সম্পূর্ণতা পেতে চেয়েছে প্রকৃতির সাহচর্যে। ঘরের পাশে স্থিত বটগাছটি 'অপর' সত্তা হয়ে তাঁর সত্তাস্থিত আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে সহায়তা করেছে। মানুষের 'আত্ম' (self) জগত ও তার 'অপর' (other) জগত অর্থাৎ নিসর্গপ্রকৃতির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে 'অশ্বত্থ' গল্পে। রেণু'র মাতৃসত্তার নানা উপলব্ধির সমান্তরালে বিন্যস্ত হয়েছে 'অপর' সত্তারূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের বৈচিত্র্যময় আচরণ। অশ্বত্থের সঙ্গে বিবিধ কথোপকথনে নির্মিত হয়েছিল রেণুর মনোজগতের ভাঙা-গড়া। ভয়ংকর শত্রুরূপে সে অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে, পরে সেই বৃক্ষকেই তার মাতৃত্বের পূর্ণতালাভে সহায়ক মনে করেছে। তাই অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো সন্তান কামনা করে মাতৃত্বে পরিপূর্ণ হতে চেয়েছে—

> 'আর কি আশ্চর্য, রেণু হঠাৎ ভেবেছে, এ গাছটা যদিও তার

নয়, তবু তার যদি নিজের রক্ত-মাংস থেকে একটা সেই গাছ
হত–এমনি করেই জ্বালাত।'[২২]

বিমল কর নিসর্গপ্রকৃতিকে মানবজীবনের সত্তাগত অংশরূপে অনুধাবন করেছেন। তাই, প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গের মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন। কখনো মানুষকে, কখনো বা মানুষের জীবনের অনুভূতিগুলিকে প্রকৃতির নানা মাত্রায় বিম্বিত হতে দেখা গেছে। 'কাচঘর' গল্পে সন্তান ধারণে অক্ষম শোভনাকে অপুষ্পক উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে জিনিয়াকে বন্ধুরা যেমন ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে, তেমনি 'আত্মজা' গল্পে হিমাংশুও মেয়ে পুতুলকে ফুল হিসেবেই কল্পনা করেছে। 'অ্যালবাম' গল্পে সৌন্দর্যময়তায় উজ্জ্বল মল্লিকাকে 'জলজ পুষ্প' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পকার অনেকক্ষেত্রে নিসর্গপ্রকৃতি দিয়েই মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। 'মোহনা' গল্পে মোহনার দৈহিক সৌন্দর্য নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' গল্পে ত্রিলোচনের চেহারার বর্ণনার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়—

'ত্রিলোচনকে দেখলে দু'পলক তাকাতে হত, তার চেহারা
বেশভূষা আমাদের শহরের প্রান্ত সীমাগুলো মনে করিয়ে
দিত। তেমনি মেঠো, মুক্ত, রোদে জলে পোড় খাওয়া। মাঠ,
ধুলো, গাছের শুকনো পাতা, অনুর্বর পতিত প্রকৃতির মতন
ত্রিলোচনের চেহারায় যে নীরসতা ছিল তা অনুভব করা যেত।'[২৩]

'পালকের পা' গল্পে তুষার তার স্বামীকে 'ঝড়ের মতন কালো কুশ্রী ভয়ঙ্কর' রূপে অভিহিত করেছে। একইসঙ্গে গল্পকার তুষারকে 'বৃহৎ লাল প্রজাপতি' হিসেবে বর্ণনা করেন। 'উদ্ভিদ' গল্পে রানি সুবর্ণসুন্দরী মেয়ের কাছে অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম পূর্ণেন্দু'কে নিষ্প্রাণ উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তোলার আরেকটি শৈল্পিক নিদর্শন রয়েছে 'উপাখ্যান' গল্পে। এখানে ধ্রুবের দৃষ্টিতে মৃত অমিয়ার বর্ণনা—

'অমিয়া পৌষের প্রত্যুষকালের মতন কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে
শুয়ে আছে।'[২৪]

ভারতীয় দর্শনের ভাবনা অনুযায়ী সমগ্র নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে সংজ্ঞা বা চেতনা

বর্তমান। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণময় সত্তাকে অনুভব করা হয়েছে। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে নিসর্গপ্রকৃতি নানাভাবে মানবায়িত হয়েছে বিমল করে'র গল্পে। তাঁর লেখনীতে জড়প্রকৃতিও চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠে মানবজীবনের পরিসরকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর কাছে অশ্বত্থ বৃক্ষ এক মানবীয় গুণসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। অশ্বত্থের সঙ্গে কথোপকথনে সে মুখরিত হয়েছে। এই গল্পে অশ্বত্থবৃক্ষ যেন সচেতনভাবে স্বেচ্ছায় পাতা ঝরানোর খেলায় মেতেছে—

> 'হ্যাঁ, খেলা! খেলা বইকি! থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছে–দমকা
> হাওয়া, অশ্বত্থের ঝাঁকড়া ডালের পাতাগুলো গা হেলিয়ে
> মাথা দুলিয়ে কেমন এক পট্‌পট্‌ শব্দ করছে, তারপর ঝরঝর
> করে ঝরে পড়ছে সারা উঠোন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।'[২৫]

টমাস হার্ডি'র কথাসাহিত্যে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণসত্তার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। 'দি উড্‌ল্যাণ্ডারর্স' উপন্যাসে প্রকৃতিকে তিনি মানবীয় অনুভূতির সাপেক্ষে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার বিমল কর গল্পের মধ্যে নিসর্গপ্রকৃতিতে মানবীয় গুণ আরোপ করেছেন স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে। 'অশ্বত্থ' গল্পে অশ্বত্থ গাছ এবং 'শীতের মাঠ' গল্পে নিথর মাঠও মানবীয়তায় সমুজ্জ্বল। 'উপাখ্যান' গল্পে নিশীথ প্রকৃতি যেন চেতনসম্পন্ন হয়ে উঠেছে—

> 'প্রথমে মনে হল, বুঝি চাঁদটা এতক্ষণে হাত দিয়ে কুয়াশার
> পরদা গুটিয়ে নিয়ে মুখ বাড়িয়েছে, পরক্ষণেই ধ্রুব বুঝতে
> পারল, রাত শেষ হয়ে আসছে।'[২৬]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গাছ' গল্প নিসর্গপ্রকৃতির মানবীকরণের এক শৈল্পিক দৃষ্টান্ত। এই গল্পে মানুষের মতোই গাছের ভালোবাসা-যন্ত্রণা-ভয়-মুগ্ধতা ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে। নিসর্গ ও মানুষ যেন অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে 'গাছ' গল্পে—

> 'গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত
> রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি।'[২৭]

'অশ্বত্থ' গল্পে অশ্বত্থ বৃক্ষও মানবীয় আচরণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গাছ' গল্পের অনামা গাছের মতোই এই অশ্বত্থ মানবিক অনুভূতি সম্পন্নতায় উপস্থিত হয়েছে—

'....রেণুর পায়ের শব্দে গাছটা যেন কতকাল পরে কল্ কল্ করে কথা বলে উঠল। কাছে পেয়ে যেন খুশি দিয়ে আগলে ধরল।'[২৮]

মানবীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গপ্রকৃতিকে বিমল কর কাহিনির মধ্যে চরিত্ররূপেও উপস্থিত করেছেন। 'অশ্বত্থ' গল্পে এই অশ্বত্থ গাছটি একটি চরিত্র হয়ে প্রতিভাত হয়েছে রেণুর মনে। সন্তানের মঙ্গলভাবনায় ব্যাকুল মা গাছটিকে শত্রুরূপেই চিহ্নিত করেছে। আবার, পরে মাতৃত্ববোধে সেই গাছকেই সন্তানসম ভাবনায় স্তন্যপান করাতে উদ্যোগী হয়েছে রেণু। এই গল্পে অশ্বত্থবৃক্ষ ও রেণু উভয়েই যেন সমান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে গল্পকারের কাহিনি বয়নের দক্ষতায় নির্জন মাঠটিও যেন এক নীরব চরিত্র হয়ে উঠেছে। অসুস্থ নবেন্দু একাকিত্ব-অসহায়তার মধ্যে একমাত্র সঙ্গী হিসেবে মাঠটাকেই আপনজন বলে মনে করেছে—

'তবু এখন মাঠ ভরে যে-শীত অন্ধকার শূন্যতা, নবেন্দু পরিপূর্ণভাবে তা অনুভব করতে পারছিল। এই ঘরে এই আদিগন্ত মাঠটা সন্ধের পর চুপি চুপি রোজ এসে দাঁড়ায়।'[২৯]

মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন নিসর্গপ্রকৃতির স্নিগ্ধ-কোমল রূপকেও গল্পকার তুলে ধরেছেন। 'রামচরিত', 'অপহরণ', 'হেমন্তের সাপ', 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' ইত্যাদি গল্পে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' গল্পে এরকমই একটি নিদর্শন —

'শালজঙ্গলের উত্তুরে বাতাস এখন বড় তীক্ষ্ণ, শরীর কনকন করে, হাড়ে লাগে সেই তীক্ষ্ণতা। সকালের আকাশ কত পরিষ্কার, রোদও অফুরন্ত, তবু জড়সড় ভাব যেতে যায় না যেন। ধুলো উড়ছে শীতের। চুপচাপ পাতা ঝরে আসছে গাছের, খেতখামারে নতুন গন্ধ, পুকুরের জলে সর পড়ছে বুঝি, সারা রাতের হিম বোধ হয়।'[৩০]

বিপরীতভাবে প্রকৃতির ভয়ংকর-রুদ্র রূপও গল্পে এসেছে। 'কাঁটালতা' গল্পে কাঁটা-জঙ্গলে আটকে জ্যোতি-নীহার-গোপী'রা নিসর্গের নির্দয় রূপের মুখোমুখি হয়। এক বৃষ্টিধৌত শীতার্ত সন্ধ্যায় ভয়াবহ কাঁটাজঙ্গলের মধ্যে আটকে পড়ে তারা। ভয়ংকর

রূপের চেনা প্রকৃতি ক্রমশ অচেনা হয়ে যায় তাদের কাছে। 'অবিশ্বাস্য' গল্পে জাহাঙ্গীর সাহেব পূর্ণিমার রাত্রেই চাঁদকে দানবীয় রূপে প্রত্যক্ষ করে—

> 'মাথার ওপরে উঠে এল চাঁদ, এত বেশী উজ্জ্বল বিশাল শ্বেত
> এবং অস্থির মতন দৃঢ় যে আমি যেন এক হিংস্র ভয়ঙ্কর
> দানবের ক্রূর হাস্য অনুভব করলাম।'[৩১]

'নিষাদ' গল্পেও প্রকৃতির ক্রূর বীভৎস রূপ বর্ণিত হয়েছে। রৌদ্রদগ্ধ প্রকৃতি যেন মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গল্পকথকের দৃষ্টিতে গ্রীষ্মের দুপুর এক রুদ্র-মূর্তি ধারণ করেছে—

> 'অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ,
> লোহা, স্লিপার সবই–সমস্ত কিছু এক ভয়ঙ্কর দহনের
> ঝলসানিতে জ্বলছে। অবোধ্য-আকারহীন এবং নির্মম কোনো
> হিংস্রতা তার বিরাট করতল আস্তে আস্তে গুটিয়ে মুঠো করে
> নিচ্ছে।'[৩২]

এই নির্দয় প্রকৃতিও পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়জ সংবেদনশীলতায় উপস্থিত হয়। একাধিক গল্পে বিমল কর প্রকৃতির ইন্দ্রিয়জ (Sensuous) রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিসর্গের স্পর্শে বিচিত্র অনুভবে মুখর হয় মানুষ। 'সুধাময়' গল্পে গোধূলি প্রকৃতির মায়াময় আবহ সুধাময়কে রাজেশ্বরীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হতে প্ররোচিত করে। 'পলাশ' গল্পে বসন্তের অপরাহ্নে উমা আঁচল ভরা পলাশ ফুলের গন্ধে-স্পর্শে নিজের অপ্রাপণীয় ভালোবাসাকে ছুঁতে চেয়েছিল —

> 'উমা আঁচল জড়ো করা পলাশ ফুল মাঝে মাঝে তুলছিল
> আর রাখছিল কখনো ফুলের নরম পাপড়ি গালে গলায় ধীরে
> ধীরে বুলিয়ে কোমল অথচ অন্যরকম এক স্পর্শ নিচ্ছিল।'[৩৩]

'বকুলগন্ধ' গল্পে অঞ্জনা বকুলফুলকে জড়িয়ে ধরে যেন প্রাক্তন প্রেমিক শ্যামলকেই অবচেতনে কাছে পেতে উদগ্রীব হয়। বকুলফুলের স্পর্শে সে শ্যামলের ছোঁয়া খুঁজে পেয়েছে। এক্ষেত্রে নিসর্গপ্রকৃতি মানুষের জৈবপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির সহায়ক হয়ে উঠেছে। বিমল করে'র গল্পে ইন্দ্রিয়ময় (sensual) সত্তায় নিসর্গপ্রকৃতি সেজে উঠেছে। প্রকৃতির আদিম সত্তায় প্রচ্ছন্ন থাকা কামজ সংবেদনার অসাধারণ চিত্র দেখা যায় 'উদ্ভিদ' গল্পে।

কথকের ভাষ্যে পরিস্ফুট প্রকৃতির ইন্দ্রিয়ঘন রূপ—

> 'অনুভব করার চেষ্টা করছিলুম, তেমন সুখ—যে সুখে এমন
> স্তব্ধ রাতেও একটি লতা চুপি চুপি তার সবুজ ডগা তিল তিল
> করে বাড়িয়ে জড়িয়ে একটি অদ্ভুত কামনাকে প্রকাশ করছে।'[৩৪]

গল্পকার বিমল করের প্রকৃতিভাবনার বহুমাত্রিকতা সম্বন্ধে সমালোচক সাগরময় ঘোষ যথার্থই বলেছেন —

> 'প্রকৃতির গন্ধ স্পর্শ যেমন তাঁর রচনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে
> ওঠে, তেমনি জীবনের জ্বালা বা বিকারও তার রচনায় স্থান
> পায়।'[৩৫]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যময় রূপের পাশাপাশি নিসর্গপ্রকৃতি এক প্রতিস্পর্ধী সত্তা হয়ে অনেকক্ষেত্রে মানবজীবনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে প্রকৃতির কাছে মানুষ আশ্রয় খোঁজে, অনেকক্ষেত্রে সেই প্রকৃতিই যেন তার শত্রু হয়ে যায়। 'অশ্বত্থ' গল্পে প্রথমে রেণু অশ্বত্থবৃক্ষকে আপন করে নেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সে নিজের সন্তানের বিপদ হিসেবে অশ্বত্থকে চিহ্নিত করে। রেণুর ভাবনায় উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ—

> '.....খোকন নিয়ে সে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওই
> গাছ শত্রুতা করতে শুরু করেছিল। খোকনের সঙ্গেই। গাছটা
> যেন হিংসে আর বিদ্বেষে জ্বলত। জ্বলছিল।'[৩৬]

মানবজীবনে সহায়ক প্রকৃতির বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে 'উপাখ্যান' গল্পে। শীত প্রকৃতি ভয়ংকর হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী অমিয়ার কাছে ধ্রুবকে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। প্রকৃতির এই প্রতিকূলতাকে তীব্রভাবে অনুভব করেছে ধ্রুব—

> 'শীত তাকে অর্ধ অজ্ঞান করেছে। বাতাসের ক্ষুরধার
> আঘাতগুলি ধ্রুব এখন কেমন অসাড় যন্ত্রণায় অনুভব করছিল।
> তার মনে হচ্ছিল, নিষ্ঠুর চন্দ্র, নির্দয় কুয়াশা এবং এই মৃত্যুসম
> শীত তাকে অমিয়ার কাছে পৌঁছতে দেবে না।'[৩৭]

বিমল করের প্রকৃতিভাবনায় নিসর্গপ্রকৃতির নিয়তিকল্প রূপ দেখা যায়। প্রকৃতির সর্বগ্রাসিতার সামনে অসহায় হয়েছে মানুষ। টমাস হার্ডি'র সাহিত্যে প্রকৃতি অলঙ্ঘ্য, অমোঘ নিয়তি হয়ে এসেছে মানুষের জীবনে। 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ' উপন্যাসে

নিসর্গ নিয়তির মতো মানবজীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। 'নিষাদ' গল্পে বিমল কর নিয়তিরূপী প্রকৃতির ভয়ংকরতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। আলোচ্য গল্পে গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নই জলকুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছে। 'অশ্বত্থ' গল্পে অশ্বত্থ গাছটি কোমলে-কঠিনে রেণুর মাতৃসত্তার আনন্দ-দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় থেকেছে। অন্যদিকে, 'সোপান' গল্পে শীতের সন্ধ্যার অন্ধকারে অসহায় বোধ করেছে মিনারে আরোহণকারী মানুষরা। প্রকৃতি যে তার সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে আমাদের জীবনে নিয়তি রূপে চিহ্নিত, তার উপলব্ধি দেখা যায় 'হেমন্তের সাপ' গল্পে গগনের ভাষ্যে—

> 'এই দিন, এই রাত্রি, এই যে ষড় ঋতু—এদের কাছ থেকে
> তুমি আমি আমরা যে কিছুই লুকোতে পারি না।'[৩৮]

চলমান জীবনে নানা অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে প্রতীকায়িত করে তুলেছে গল্পকার বিমল কর। 'গগনের অসুখ' গল্পে গগনের ভাবনায় শীতঋতু জীবনচর্যার প্রতীক হয়ে এসেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে নীরব রুক্ষ মাঠ নবেন্দু'র নিঃসঙ্গতাকে ইঙ্গিতবহ করেছে। 'পলাশ', 'বকুলগন্ধ' গল্পে পলাশ ও বকুল ফুল প্রেমের প্রতীক হয়ে কাহিনিতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'উদ্ভিদ' গল্পে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক পূর্ণেন্দু রাজকুমারী চন্দ্রার প্রতি হৃদয়ের উষ্ণতা প্রকাশে ব্যর্থ। তাঁর আবেগের নিষ্প্রাণতাকে জড়ত্বময় নিসর্গ প্রকৃতির প্রতীকে চিহ্নিত করেছেন রানি সুবর্ণসুন্দরী। কন্যা চন্দ্রার প্রতি পূর্ণেন্দু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

> '....আর তোমার বটানির প্রফেসর তো একটা প্ল্যান্ট। উদ্ভিদ।
> ওর একটু অ্যানিমাল হওয়া উচিত ছিল। নয় কি ?'[৩৯]

নিসর্গপ্রকৃতি রূপে-রূপান্তরে মানুষের মনোজগতের প্রতিফলক হয়ে উঠেছে বিমল করের একাধিক গল্পে। নিসর্গপ্রকৃতি কখনো কখনো মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে প্রভাব ফেলে। কখনো বা অন্তর্জগতকে উন্মোচিত করে তোলে। 'উদ্ভিদ' গল্পের কথক উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক পূর্ণেন্দুর চেতনায় জ্যোৎস্নাত রাত্রির প্রভাব দেখেছেন। পূর্ণিমার মাদকতায় পূর্ণেন্দুর কামনাময় চাঞ্চল্য কথকের ভাষায়—

> '....ধবল জ্যোৎস্নার কোন অদৃশ্য কুহক মোহ বিস্তার করেছে
> পূর্ণেন্দুর চোখে, মনে, চেতনায়। আশ্চর্য, অদ্ভুত কোনো
> মোহ।'[৪০]

'কাচঘর' গল্পে প্রেমে ব্যর্থ শোভনার হৃদয়ের হাহাকার ঝড়ো প্রকৃতির উদ্দামতায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছিল। 'জানোয়ার' গল্পে বাসন্তী প্রকৃতিই স্বামীর প্রতি অতসীকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে—

> 'বসন্ত বুঝি আরও উগ্র, আরও তীব্র হল। ক'দিন থেকে হাওয়া বইছে কেমন এক হাওয়া যেন। অতসীর ভেতর একটা চাপা আগুন এবার সব কিছু চৌচির করে তার মধ্যে থেকে জ্বলে উঠেছে।'[৪১]

'সুধাময়' গল্পে সন্ধ্যার পশ্চিমে ম্লান আকাশ সুধাময়ের মনের নিঃস্বতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে সময়ে সময়ে মাঠের রূপ নবেন্দু'র অন্তর্জগতের ভাবনাকে প্রতিবিম্বিত করেছে। এই গল্পে গোধূলি বেলায় মাঠের নৈসর্গিক রূপ নবেন্দু'র মনের বিষাদ-বেদনার আধার হয়ে উঠেছে—

> 'নবেন্দু এই মুমুর্ষু রিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে আছে। এখন বাইরের ছায়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে তার মনে আস্তে আস্তে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা, অধৈর্য, বেদনা নামবে, ছায়া যত ঘন হবে শীতের সন্ধের অন্ধকারে ডুবে যাবে, নবেন্দুর মনের এই শূন্যতা আকুলতা ততই এক হাহাকারে অসাড় হয়ে আসবে।'[৪২]

নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে জীবনদর্শনের সারসত্য অন্বেষণ করেছেন গল্পকার বিমল কর। পঞ্চভূতে সৃষ্ট মানবজীবন বিশ্বের আকাশ-মাটি-জল-বাতাস-আগুনে নিজের অস্তিত্ব-সত্তাকে বারে বারে অনুভব করতে চেয়েছে। 'সত্যদাস' গল্পে দিন-রাত্রির অনন্ত মিথুনের মধ্যে সত্যদাস মানবজীবনের চলমানতাকে ব্যাখ্যায় খুঁজেছে। 'মানবপুত্র' গল্পে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্য থেকে ঈশ্বর প্রেরিত মনুষ্যপুত্রকে আবির্ভূত হতে দেখেছে কেষ্ট। 'সুধাময়' গল্পে নিসর্গপ্রকৃতিকেই ঈশ্বর বলে অনুভব করার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন গল্পকার। বিশ্বপ্রকৃতিই সুধাময়ের বাবার কাছে ঈশ্বরকল্প হয়ে উঠেছে। সুধাময়ের মা পুণ্যময়ীর ভাবনাতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়—

> 'স্বামী তাঁর মৃত্যু বিলাসী ছিলেন না, পুণ্যময়ী জানতেন কিন্তু যে বিশ্বচরাচরকে তিনি ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন—হয়ত সেই অখণ্ড জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াকে তিনি মৃত্যু বলে ভাবেন নি।'[৪৩]

সায়াহ্নের সময় নিসর্গপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ঐশীশক্তির অনুভূতি উঠে এসেছে এই গল্পে। স্যানেটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে পরিমল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের নেপথ্যে ঈশ্বরীয় অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করেছে —

> 'গোধূলিতে পাহাড় ছোঁয়া আকাশে সূর্য অস্ত যেত। কী যে রঙ-যেন কোনো অনন্তপুরুষ প্রতিদিন তার বুক থেকে এক সমুদ্র রক্ত এখানের রক্তহীন পাংশু কাতর রুগীদের বুকে ঢেলে দিয়ে যেত।'[৪৪]

নিসর্গপ্রকৃতি রহস্যময়। মানবজীবনও রহস্যময়তায় পূর্ণ। খণ্ডকালের জীবনে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে অনুধাবন করতে সদা উন্মুখ। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সে যেন নিজের সত্তাগত রহস্যকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী। নিসর্গের রহস্যের মধ্যেই জীবনকে বহুলমাত্রায় দেখতে চেয়েছেন বিমল কর। নিসর্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকাশ এবং রহস্য উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর বিভিন্ন গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'উদ্ভিদ' গল্পে নিসর্গের সত্তাগত রহস্যভেদ করতে উদগ্রীব হয়েছিল অধ্যাপক পূর্ণেন্দু। তাঁর সেই একাগ্রতার বর্ণনা রয়েছে উক্ত গল্পে—

> 'মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে সাইটোপ্লাজমের আশ্চর্য জগতে সে যেন কোনো এক রহস্য খুঁজে বেড়ায়। স্লাইডের প্ল্যান্ট সেল আয়োডিনের ছোঁয়ায় যে নীলাভ-বিচিত্র রূপসজ্জা করে, রূপদক্ষ একটি চোখ নিষ্পলক চোখে দেখে সেই রূপোত্তীর্ণ রহস্যকে।'[৪৫]

এই বিশ্বজুড়ে চলেছে মানুষ ও প্রকৃতির অন্তহীন দ্বিরালাপ। নিসর্গপ্রকৃতির বহুমাত্রিক সাহচর্যে মানুষ এগিয়ে চলে। মানুষের জীবনায়নের ধারাবাহিক ইতিহাস যেন প্রকৃতির মধ্যেই প্রকাশময়। চেতনে-অবচেতনে প্রকৃতির সঙ্গে সর্বদাই একাত্মতা অনুভব করেছে মানুষ। মানবজীবনে নিসর্গপ্রকৃতির অন্তহীন প্রভাবকে সর্বদা স্বীকার করেছেন বিমল কর। তাঁর গল্পজগতে নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিতত্ব শৈল্পিকতায় বর্ণিত হয়েছে। নিছক বর্ণনা বা প্রসঙ্গের উল্লেখে নয়, বরং নিসর্গপ্রকৃতিকে মানবজীবনের বিচিত্র অনুভবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। প্রাতিস্বিক সত্তার পূর্ণতার অনুধ্যানে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক হল নিসর্গপ্রকৃতি। এই নিসর্গপ্রকৃতি জড় হলেও সে মানুষকে

অস্তিত্বশীল হতে প্রাণিত করে। কখনো অস্তিত্বের শূন্যতা অতিক্রমণে, কখনো বা অস্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধিতে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির আপাত-বাহ্যিক জড়ত্বকে অতিক্রম করে তার রহস্যময় মর্মে পৌঁছাতে চান গল্পকার বিমল কর। নিসর্গপ্রকৃতির সহায়তায় তিনি মানব অস্তিত্বের সারসত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তাই নিসর্গপ্রকৃতির বৈশ্বিকতায় মানুষের আপন অস্তিত্বের অনন্ত অন্বেষণই হল বিমল করের প্রকৃতিভাবনার মূল সুর।

তথ্যসূত্র :

১. প্রস্তাবনা : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১৯৭৩

২. তদেব

৩. সাক্ষাৎকার : বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩৮৭

৪. 'আমার লেখা': বিমল কর; 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা; ১৩৮২; পৃ. ১৪

৫. সাক্ষাৎকার : বিমল কর; বিমল করের উপন্যাস: প্রসঙ্গ অসুখের উপমা; ড.সুব্রত ঘোষ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০০৬; পৃ. ২০৪

৬. 'জননী': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০০৫; পৃ. ৩০৫

৭. 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন'; তদেব; পৃ. ৩৮১

৮. 'গগনের অসুখ'; তদেব; পৃ. ২৯৬

৯. 'অশ্বত্থ'; তদেব; পৃ. ২০১

১০. 'বিচিত্র সেই রামধনু'; তদেব; পৃ. ৬৭৬

১১. 'সুনীতিমালার উপাখ্যান'; বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ. ৫২

১২. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ; জুলাই; ২০০৫, পৃ. ২৫

১৩. 'সোপান'; তদেব; পৃ. ৩৩৮

১৪. 'আত্মজা'; তদেব; পৃ. ১০৮

১৫. ‘গগনের অসুখ’; তদেব; পৃ. ৩০০

১৬. ‘বিমল করের দুপুর বিকেল’: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; ‘দেশ’; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫; পৃ. ১১৯

১৭. ‘আত্মজা’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব, পৃ: ১১০

১৮. ‘মানসাঙ্ক’ : বিমল কর; সুধাময়; এভারেস্ট বুক হাউস; ১৯৫৯; পৃ. ১১৮

১৯. ‘বকুলগন্ধ’ : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৭৮

২০. ‘উদ্ভিদ’; তদেব; পৃ. ১১৩

২১. ‘শীতের মাঠ’; তদেব; পৃ. ১৮৫

২২. ‘অশ্বত্থ’; তদেব; পৃ. ২০৬

২৩. ‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’; তদেব; পৃ. ২৭১

২৪. ‘উপাখ্যান’: বিমল কর; শারদীয়া দেশ পত্রিকা; ১৩৬৮; পৃ. ১৮৮

২৫. ‘অশ্বত্থ’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২০৫

২৬. ‘উপাখ্যান’: বিমল কর; শারদীয়া ‘দেশ’ পত্রিকা; ১৩৬৮; পৃ. ১৮৮

২৭. ‘গাছ’ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প; দে’জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ১৯৮৯; পৃ. ৩০৬

২৮. ‘অশ্বত্থ’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৯৯

২৯. ‘শীতের মাঠ’; তদেব; পৃ. ১৯৬

৩০. ‘স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ’ : বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯৯৬; পৃ. ১০৯

৩১. ‘অবিশ্বাস্য’: বিমল কর; ‘দেশ’; ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮; পৃ. ৪১৫

৩২. ‘নিষাদ’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৮৫

৩৩. ‘পলাশ’; তদেব; পৃ. ১৮১

৩৪. ‘উদ্ভিদ’; তদেব; পৃ. ১২০

৩৫. ভূমিকা : সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠ গল্প : বিমল কর; প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫

৩৬. ‘অশ্বত্থ’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২১১

৩৭. ‘উপাখ্যান’ : বিমল কর; শারদীয়া ‘দেশ’ পত্রিকা; ১৩৬৮; পৃ. ১৮৫

৩৮. ‘হেমন্তের সাপ’: বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ.৬৬৬

৩৯. ‘উদ্ভিদ’; তদেব; পৃ. ১২০

৪০. ‘উদ্ভিদ’; তদেব; পৃ. ১১৯

৪১. ‘জানোয়ার’; তদেব; পৃ. ১৫৮

৪২. ‘শীতের মাঠ’; তদেব; পৃ. ১৯৪

৪৩. ‘সুধাময়’; তদেব; পৃ. ২৫৬

৪৪. ‘সুধাময়’; তদেব; পৃ. ২৬৫

৪৫. ‘উদ্ভিদ’; তদেব; পৃ. ১১৫

অষ্টম অধ্যায়

চরিত্র নির্মাণ কুশলতা

চরিত্রই হল ছোটগল্পের ভরকেন্দ্র। চরিত্র ব্যতিরেকে গল্পের 'হয়ে ওঠা' সম্পূর্ণতা পায় না। নানা চরিত্রের বিন্যাসের মাধ্যমে ছোটগল্প জীবনের অজস্র স্বরকে নানা মাত্রায় উপস্থাপিত করে। তবে শুধুমাত্র চরিত্র সৃষ্টি করলেই হবে না, একইসঙ্গে কথাবস্তুর আধারে সে সকল চরিত্রকে পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসঋদ্ধ হয়ে ওঠাও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্রষ্টার চরিত্রায়নের শৈল্পিক কৌশলে গল্পের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিভিন্ন চরিত্র। কখনো চরিত্রদের কেন্দ্র করেই গল্প এগিয়ে চলে; আবার গল্পের অন্তর্টানে উঠে আসে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। মানবজীবনের কথনবিন্যাসেই গল্পের মধ্যে অনিবার্যভাবে রূপায়িত হয়ে চলে অজস্র চরিত্র।

বিমল করের গল্পবিশ্বের ধৃতিকেন্দ্রে রয়েছে মানবজীবনের গভীরতর সত্যকে উন্মীলনের আকাঙ্ক্ষা। ফলে গল্পে সজীব হয়ে উঠে এসেছে অজস্র চরিত্র। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রেক্ষিতে এই সকল চরিত্ররা বৈচিত্র্যময়তায় উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের রহস্যলালিত জীবনায়নের প্রকাশই মূল অন্বিষ্ট হওয়ায় তাঁর গল্পে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চরিত্রবিন্যাস। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন—

'আমার লেখায় আগাগোড়া একটা মানবিক বক্তব্য ছিল...'[১]

এই 'মানবিক বক্তব্য' এর বহুমাত্রিক প্রকাশের তাগিদেই গল্পে গল্পে সৃষ্টি হয়েছে নানা স্বতন্ত্র চরিত্র। তাঁর গল্পভুবনে 'গল্প' প্রাধান্য না পাওয়ায় চরিত্ররাই সক্রিয়ভাবে পাঠক-পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মানুষের অন্তর্জগত উন্মোচনে আগ্রহী বিমল কর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। ব্যক্তিমানুষ সর্বদাই পৃথক গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পের চরিত্রায়নে তিনি চরিত্রের সামাজিক সত্তাকে তুলে ধরলেও ব্যক্তিসত্তাকেই চূড়ান্ত পরিণতিতে বিম্বিত করতে চেয়েছেন বারে বারে। গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ বা অন্য চরিত্রের দৃষ্টিকোণে যেমন চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, আবার বিমল করের আত্মসৃষ্ট কথকসত্তা অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং চরিত্ররূপে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনচর্যার আধারেই বিমল করের গল্পবিশ্ব গড়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের জীবনকে নিয়ে কয়েকটি গল্প সৃষ্টি করলেও তাঁর

গল্পে ঔপনিবেশিক চেতনায় আচ্ছন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই মূল প্রতিপাদ্য হয়েছে। ফলে বিমল করে'র গল্পের প্রধান চরিত্ররা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম সার্থক রূপকার সুবোধ ঘোষ-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-রমাপদ চৌধুরীর মতো তিনিও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বমুখর মানসিক চেতনা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। তবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের টানাপোড়েনে মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থান চিহ্নিত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজকেন্দ্রিক অর্থনীতি-রাজনীতির উত্থান-পতনে মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তর্জগতের বহুমাত্রিক আলোড়নের ইতিকথাকে তিনি পুরুষ-নারী ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিন্যাসকে মান্যতা দিয়ে চরিত্রগুলি নির্মিত হয় নি। সমসাময়িক গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেমন কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালিকে স্বীয় গল্পজগতে তুলে ধরেছেন, তেমনি বিশেষ কোনো স্থানিকতায় বিমল করের গল্পের চরিত্ররা আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। গল্পকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে বাংলাসহ বহির্বঙ্গের নানা পরিবেশ থেকে চরিত্ররা গল্পে উঠে এসেছে। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক সাগরময় ঘোষের মন্তব্যে তারই প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়—

> 'ওঁর (বিমল কর) অভিজ্ঞতার গণ্ডি বহু বিস্তৃত, শুধু শহরের
> মানুষ নয়, কলকাতা বা বাংলাদেশ ছাড়িয়েও আরও বিস্তীর্ণ
> এলাকার নানা ধরনের মানুষ তিনি দেখেছেন।'[২]

বিমল করের অভিবাসী সত্তার প্রভাবে বিবিধ ভৌগোলিক অবস্থান থেকে চরিত্ররা চিত্রিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বসবাসের কারণে বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের অবস্থান থেকে তিনি নারী-পুরুষ নানা চরিত্র তুলে এনেছিলেন। কলকাতার পাশাপাশি কয়লাখনি ও রেলশহর সংলগ্ন অঞ্চলের প্রভাব তাঁর চরিত্র নির্মাণে দেখা যায়। অনুজ সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ভাবনা উঠে এসেছে —

> 'বিমলদার প্রথম জীবন কেটেছিল হাজরিবাগ-আসানসোল
> অঞ্চলে। এই অঞ্চলের মানুষ তাঁর ছোটগল্পে, উপন্যাসে
> উঠে এসেছে বারংবার।'[৩]

তবে কোনো স্থানিকতায় আক্রান্ত হয়নি এই চরিত্রগুলো। কলকাতার পটভূমিতে 'অপেক্ষা' গল্পের শিবতোষ, 'সম্পর্ক' গল্পের শৈলেশ-অনিলা, 'স্বপ্নের নবীন' গল্পের নবীন চরিত্রের সমান্তরালে আসানসোলের পটভূমিকায় 'ইঁদুর' গল্পের মলিনা, মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় 'শূন্য' গল্পের নিশীথ বা 'অপহরণ' গল্পে হাজারিবাগের উমাপ্রসাদ চরিত্রের চিত্রায়নে মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অঞ্চলভেদে পৃথক হয়ে প্রকাশ পায় নি। ভৌগোলিক পরিধির বিচিত্র বিস্তার থাকলেও মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর্থ-সামাজিক স্তরে প্রধানত বাঙালি জীবনায়নের ভাষ্যই গল্পে দ্যোতিত হয়েছে। চরিত্রের নামকরণের মধ্যেও বাঙালিয়ানার প্রভাবও লক্ষণীয়। বিমল করের গল্পে গ্রামীণ সমাজের মানুষের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না; অধিকাংশ গল্পে নাগরিক চরিত্রেরই প্রাধান্য রয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিকতা এক্ষেত্রে গুরুত্ব না পেলেও শহরাঞ্চলের মানুষরাই বিভিন্ন চরিত্র রূপে উপস্থিত হয়েছো।

চলমান জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারে বিমল কর গল্পের চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করেছেন। শীলিত কল্পনাশক্তিতে তিনি জীবনের বাস্তবতা ও সাহিত্যের বাস্তবতার অন্তবর্তী পার্থক্য পূরণে সমর্থ হয়েছেন। ফলে চরিত্রগুলি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যথার্থই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। অনুজ সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে একান্ত আলাপচারিতায় বিমল কর চরিত্র-সৃষ্টির শৈল্পিক কৌশল সম্পর্কে যে ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

> 'তন্ত্রসাধকরা যেমন শ্মশানে প্রেত নামায়, লেখককে তেমন চরিত্রগুলোকে কল্পনার জগত থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে।'[৪]

গল্পের চরিত্রকে কল্পনা থেকে বাস্তবে উত্তরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্নাতীত দক্ষতা সর্বজনস্বীকার্য। তাই 'উদ্ভিদ' গল্পের জীববিদ্যার অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশ, 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' গল্পের স্বপ্নালু বিলাস কিংবা 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' গল্পের ত্রিলোচনের প্রত্যেককেই আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধিভুক্ত বলেই মনে হয়। নিসর্গের প্রতি আস্তিত্বিক টান প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা পূর্ণেন্দুবিকাশ যেন আমাদেরই এক ভিন্নসত্তার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। আবার, যৌবনতপ্ত ভোগবাদের প্রতি মানুষের জীবনভর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে গল্পকার 'যযাতি' গল্পের নীলকন্ঠ চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। স্ত্রী নারায়ণীর

কাছে ব্যক্ত তাঁর ভাবনা মানুষের চিরাচরিত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকেই যেন ধ্বনিত করে—

> 'বয়স আবার কী ? যতদিন শরীরে ক্ষুধা আছে, কাম আছে, ভোগের ক্ষমতা আছে, ততদিন মানুষ জোয়ান। যখন থাকবে না, তখন সে জরাগ্রস্ত, অক্ষম, অচল।'[৫]

প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাপেক্ষে অচেনা-অজানা অনেক চরিত্রকে বিমল কর সূক্ষ্ম অথচ গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে বিশ্বাস্য ও বাস্তব করে তুলেছেন। 'আঙুরলতা' গল্পে যথাযথ প্রতিবেশের বর্ণনায় সংগ্রাম-যন্ত্রণা-আশাভঙ্গ ইত্যাদির টানাপোড়েনে দেহব্যবসায়ী আঙুরলতা বাস্তবোচিতভাবে বিকশিত হয়েছে। গল্পকারের বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণের প্রভাবে 'মানবপুত্র' গল্পে অসীম ক্ষুধায় কাতর গঙ্গামণি কিংবা 'অশ্বত্থ' গল্পে মাতৃত্বের অপার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল রেণু চারিত্রিক স্বতন্ত্রতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে গল্পকার প্রায়শই অনুপুঙ্খ বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথম থেকেই তিনি স্বীয় সৃষ্ট চরিত্রের সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের সচেতন করে দিতে ইচ্ছুক। এ যেন নিজের সৃজনশীল ভাবনার সহযোগী হিসেবে পাঠকসমাজকে পাওয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। একটি সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গ-সাপেক্ষে তিনি মত ব্যক্ত করেছেন—

> 'বর্ণনা না দিলে চরিত্রটা জীবন্ত হবে কেমন করে ? তাছাড়া কোনো চরিত্রের সঙ্গে যখন পাঠক পরিচিত হয় তখন সে নিজেই তার একটা চেহারা কল্পনা করে নেয়। এটা অনেক সময় ভুল হতে পারে। তাই আগে থেকে সামান্য সাজেস্ট করে দেওয়া ভালো।'[৬]

তবে, বর্ণনার মাধ্যমে বিমল কর চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান নি। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্জগতের উন্মোচন প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় তিনি বাহ্যিক প্রেক্ষিতে চরিত্রের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে চেয়েছেন, যদিও এই প্রক্রিয়ার সফল ফলশ্রুতির ক্ষেত্রে সন্দিহানও ছিলেন—

> 'একজন যখন কথা বলে তখন তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটাই তো কথা বলে। লেখার মধ্যে তো সেটা ছবি এঁকে দেখানো সম্ভব নয়। তাই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। তাতেও যে ষোলোআনা বোঝানো যায় তাও কিন্তু নয়, তবু–'[৭]

'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পে পিয়ারীলাল, 'জানোয়ার' গল্পে সুধীবন্ধু সোম, 'সংশয়' গল্পে সুধাকান্ত বা 'মোহনা' গল্পে মোহনা ইত্যাদি নানা চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনার মাধ্যমে গল্পকার প্রাথমিক ধারণা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন—

> 'পিয়ারীলাল সব পারে—পারে না শুধু মাথার কাজ। অসম্ভব রকমের বোকা ও–সাতবার একটা কাজ শিখিয়ে দিলে ঊনপঞ্চাশবার ভুল করে বসবে। তার ওপর মাথায় বেশ একটু ছিট আছে।'[৮]

আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু চরিত্র স্বয়ং আত্ম-বর্ণনায় মুখরিত। 'বিচিত্র সেই রামধনু'তে শিবতোষ, 'দূরে বৃষ্টি'তে সাধুচরণ নিজেরাই নিজেদের বর্ণনা দিয়েছে। 'অনাবৃত' গল্পে ইন্দুলেখার বয়ানেই তার চরিত্রের বিকাশ সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হয়—

> 'স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা তখন নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে আর ব্যস্ত নই, বিব্রত নই। নিজেদের ঘনিষ্ঠতম করার কোনো বাধাই আর তখন ছিল না। তবু কোথায় যে কী ঘটছিল কে জানে!'[৯]

কখনো এক বা একাধিক চরিত্রের বর্ণনায় কোনো একটি বিশেষ চরিত্র নির্মিত হয়ে যায়। 'অপহরণ' গল্পে চঞ্চলের বর্ণনায় উমাপ্রসাদের আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্ব, 'নীরজা' গল্পে কথকের বয়ানে নীরজার স্বার্থপরতা-আত্ম অনুশোচনা বিবৃত হয়েছে। 'শূন্য' গল্পে মৈত্র সাহেবের জবানীতেই নিশীথের মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে—

> 'কুমুদশংকরের ভাইপো নিশীথ দিন কয়েক হল এখানে এসেছে। ওর সমস্ত কথা শুনেছি। ছেলেটির বয়স অল্প।...খুব নরম ধাতের মানুষ হলে যা হয়–নিশীথেরও দেখছি তাই– দুঃখ আঘাতগুলো মনে বড় বেশি করে বেজেছে। ছেলেটি মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছে।'[১০]

অনেক সময় অন্যের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণনাকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। 'নরকে গতি' গল্পে মনোময়ের চরিত্রের সুপ্ত স্বার্থপরতা উন্মোচন করতে ব্যস্ত শরদিন্দু চরিত্রের কল্যাণময় জীবনবোধের পরিচয় আমরা পাই। আবার, 'রামচরিত' গল্পে বাবার ভোগবাদী ভাবনা, প্রাপ্ত যন্ত্রণার নির্মোহ বর্ণনা পরিতোষের ভাষ্যে

রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই, জীবনের শ্রেয়নীতির উপর আস্থাশীল এক চরিত্র হিসেবে পরিতোষকে যেন গল্পকার সমান্তরালভাবে নির্মাণ করেছেন।

বিমল করের শৈল্পিক উপস্থাপনায় বিভিন্ন গল্পে কাহিনির সূচনা থেকেই নানা চরিত্র সম্পর্কে এক পাঠজ কৌতূহল অনুভূত হয়। কাহিনির পরিণতি অপেক্ষা চরিত্রের বিবর্তনই যেন মূল মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। ফেনায়িত আতিশয্যের পরিবর্তে স্বল্প পরিসরে একটি চরিত্রকে গড়ে তোলার কুশলতা তাঁর লেখনীতে বিরাজ করতো। 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ, 'কাম ও কামিনী' গল্পের বিজলি-কুঞ্জবাবু বা 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি'র হেমাঙ্গ চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পর্বেই পাঠক-পাঠিকা তাদের পরিণতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি প্রার্থিত পরিণতির পরিবর্তে নতুন এক স্বতন্ত্র মাত্রায় উপস্থিত হয়। 'সুনীতিমালার উপাখ্যান' গল্পে রোমান্টিক সুনীতির জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতায় প্রতিশোধে-প্রতিরোধে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা আমাদের কাছে প্রত্যাশাতীত ছিল। 'কাচঘর' গল্পে শান্ত-স্থিতধী শোভনার শেষপর্যন্ত মাতৃত্ব সত্তার অপূর্ণতা না পাওয়ার যন্ত্রণা গল্পের পাঠককে স্তব্ধবাক করে দেয়।

অনেক সময়, একটি প্রধান চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য একাধিক চরিত্রকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রদের বিকাশ-বিবর্তনের সমান্তরালেই মূল চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন গল্পকার। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে তিন প্রেমিক কমলেন্দু-অনাদি-শিশিরের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণের নিরিখে পরোক্ষভাবে শিবানী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। পরোপকারী, সরল, সম্পর্কে ব্যর্থ হয়েও ভালোবাসার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ এক নারী রূপে সকলের কাছে প্রতিভাত হয় শিবানী। 'জননী' গল্পেও মায়ের চরিত্রকে গল্পকার পাঁচ সন্তানের কথোপকথনের পারস্পরিকতায় নির্মাণ করেছেন। মায়ের মধ্যে সুপ্ত স্বার্থপরতা, হৃদয়ের উষ্ণতার অভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সন্তানদের আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন।

বিমল করের বেশ কিছু গল্পে আত্মসৃষ্ট কথকসত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠে এসেছে। 'একটি গল্পের খসড়া' গল্পের কথক স্বয়ং এক লেখক চরিত্র হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। আবার 'সেই ঘর এই বাসা' গল্পেও কথককেই অস্তিত্বের সংকটে বিদ্ধ এক চরিত্র রূপে আমরা পাই।

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চলমান আবর্তে ঋদ্ধ মানুষের অন্তর্জগতের

টানাপোড়েনকেই বিমল কর ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। চরিত্রের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের বার্তা দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না, বরং দোদুল্যমান পারিপার্শ্বিকতায় মানুষের অন্তরমহলের আলোড়নকে তুলে ধরাই চরিত্রভাবনার ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছে। ফলে গল্পের বেশিরভাগ নারী-পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সংঘাত-মুখরতা, দ্বন্দ্বময়তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। 'মানবপুত্র' গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রভাবে খিদের জ্বালায় গঙ্গামণির যন্ত্রণা দেখে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হয় কেষ্ট। খাদ্যের অভাবে মানুষের এই সংগ্রামে তাঁর ক্ষুব্ধ চিত্তের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার —

> '...চায়ের লিকার দেখে দেখে আর কাপ ধুয়ে ধুয়ে যার
> মনটাই জলো-জলো হয়ে থাকল, সেই কেষ্ট ভেবেই পায় না,
> চালের আকালে দেশটাই যখন জল-ভিক্ষু চাতক পাখির
> মতো শূন্য চোখে চেয়ে রয়েছে, তখন বাবুরা কেমন করে,
> কোথা থেকে আসে, চকচক করে, কাটলেট মুখে পুরে দিব্যি
> চিবোয়, মাংস খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পথে।'[১১]

বাইরের জগতের টানাপোড়েনে চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে 'উদ্বেগ' গল্পে। অজানা রোগের প্রকোপে শহর জুড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু শিশিরের মনেও ভয়ের সৃষ্টি করে। বন্ধু নিশীথ ও অন্যান্যদের মৃত্যুর সময় কিছু করার ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে সে নিজেকে অবচেতনে অপরাধী মনে করে—

> '...শিশির কিছু বলতে পারবে না—কেন না প্রতিটি মৃত্যুর
> উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ করছে। সে শুধু লজ্জিত হবে। অনুতপ্ত
> হবে।'[১২]

অতীতচারিতা ও স্মৃতিমেদুরতায় আক্রান্ত হওয়া বিমল করের গল্পের চরিত্রদের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে চরিত্ররা যেমন অন্য চরিত্র সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে, কখনো সেই চরিত্র সম্বন্ধেও পাঠক-পাঠিকা সম্যক অবহিত হন। 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে কথক পাঁচুদা অতীত জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জিনির প্রতি দুর্বলতা ও অধিকার লাভে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটির প্রতি অন্যায়ের কথা ব্যক্ত করেন। এখানে পাঁচুদা'র বয়ানেই তার মধ্যবিত্তসুলভ ভণ্ডামি সকলের কাছে ফুটে ওঠে। 'রামচরিত' গল্পে স্মৃতিমেদুর পরিতোষের মাধ্যমে তার বাবা

ও বিনু মাসির চরিত্রগত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন', 'জননী', 'মোহনা', 'বিচিত্র সেই রামধনু' ইত্যাদি গল্পে নানা চরিত্রের উপস্থাপনে অতীতচারিতার সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছে। 'শোকসভার পর' গল্পে সুধাকরের শোকসভার শেষে ধূর্জটির কাছে প্রতিমার স্মৃতিচারণে অতীত জীবনের বিন্যাসে প্রধান চরিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে। পাঠকের পাঠজাত অভিজ্ঞতায় এক স্বার্থপর-আত্মসুখবিলাসী চরিত্র হিসেবে সুধাকর চিহ্নিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে নানা চরিত্র সৃজনে বিমল করে'র শৈল্পিক দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বিশ শতকের পাঁচ দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত আত্মমুগ্ধ-স্বার্থকেন্দ্রিক-অন্তঃসারশূন্য-দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত বাঙালি তাঁর গল্পের জগতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র হয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে অনাদি-শিশির-কমলেন্দু'র চরিত্র তিনটির মাধ্যমে আত্মকেন্দ্রিক-স্বার্থমগ্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। শিবানীর সরল হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে এরা জীবনে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকেই বিশ্বাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে আপন স্বার্থে—

> 'আমরা তিনজনে, তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য,
> নির্ভরতা তো হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান
> করেছি।'[১৩]

মধ্যবিত্তের উঁচুতে ওঠার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে স্বার্থপর হয়ে প্রিয়জনকে প্রতারণা করার প্রবণতাকে গল্পকার 'উপাখ্যান' গল্পে ধ্রুব চরিত্রের মাধ্যমে ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন। নিজের ভুলে সর্বস্বান্ত ধ্রুব স্ত্রী অমিয়াকে বিপদের মধ্যে রেখে পালিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি। গল্পের বয়ানে তার সেই আত্মময় অনুভূতিরই প্রকাশ দেখা গেছে—

> 'আমি বাঁচব, আমার বাঁচা উচিত....আমার পক্ষে মূর্খের
> মতন বুক পেতে সংসারের ছররা খেয়ে বুক ঝাঁঝরা করা
> সম্ভব নয়—বস্তুত এই তীব্র আত্মবোধে নিজেকে রক্ষা করার
> বাসনায় ধ্রুব একদিন চলে গেল।'[১৪]

'নীরজা' গল্পে নীরজা, 'কাচঘর' গল্পের হিরণ, 'গুণেন একা' গল্পের গুণেনের মধ্যে আত্মসুখসর্বস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'অ্যালবাম' গল্পের মল্লিকার

মতো 'নীরজা' গল্পের নীরজাও সুখসন্ধানের দ্রুততায় বিভ্রান্ত হয়ে অস্তিত্বের সংকটে বিদ্ধ হয়েছে। 'কাচঘর'এ শোভনার মাতৃত্বলাভে অক্ষমতার কথা শুনে হিরণ সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তার ছদ্ম-প্রেমিকসত্তার অন্তঃসারশূন্যতাকে লেখক উন্মোচন করে দিয়েছেন। 'গুণেন একা' গল্পে অসুস্থ কেদারের দোকান এবং তার স্ত্রী ঈশানীকে আয়ত্তে এনেও স্বার্থপর গুণেন একসময় আত্মপ্রতারণার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে —

> 'একদিকে কেদারের দোকান, অন্যদিকে ঈশানী—এই দুইয়ে
> মিলে গুণেনের সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে। গুণেন এখন
> মনে মনে কি চায় সে জানে!'[১৫]

ঔপনিবেশিক চেতনায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখ ও মুখোশের ক্লান্তিকর অথচ অনিবার্য খেলা ধরা পড়েছে বিমল করে'র নির্মিত নানা চরিত্রে। 'ইঁদুর' গল্পে মলিনা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাসুদেবের প্রতি বারে বারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে আপন অবদমিত কামনার স্বরূপকে সে ক্রমশ আবিষ্কার করে। 'পলাশ' গল্পে মধ্যবিত্ত স্ববিরোধী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে রতিকান্ত। স্ত্রী বিনুকে ভালোবেসেও কোথাও যেন সে শূন্যতা অনুভব করে। উমাকে ভালোবেসে এই শূন্যতাকে অতিক্রম করতে চাইলেও স্বগতকথনে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—

> 'আমার স্ত্রীকেই আমি ভালোবাসব; একটি শুধু মেয়েকে।
> কিন্তু ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে—এই ইচ্ছেকে তুমি
> নষ্ট করে দিতে চাও। পারবে ? পারবে না।'[১৬]

যুদ্ধোত্তরকালে মধ্যবিত্ত সমাজে নৈতিকতা-মূল্যবোধের যে অবক্ষয় এসেছিল তারই প্রতিফলন দেখা যায় 'সংশয়' গল্পে সুধাকান্ত চরিত্রে। কর্মজীবনের শেষে সংবর্ধনা সভায় সবার প্রশংসা পেলে বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সুযোগসন্ধানী-উচ্চাকাঙ্ক্ষী-স্বার্থপর এক ব্যক্তি। নীতি-ন্যায়কে উপেক্ষা করে যে কোনো উপায়ে আত্মসুখী হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। অবচেতন মনের তাগিদে তিনি নিজেই বাইরের মুখোশটা উপড়ে নিয়ে ভেতরের মুখটাকে নিরীক্ষণ করে আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান। সুধাকান্তের একান্ত স্বীকারোক্তি—

> '...আমার ধাত বা চরিত্র আপনার যা বললেন তা নয়, আমি
> যথেষ্ট ক্লেভার, মাথায় বুদ্ধি রাখি....আমি সকলকে আপনার
> করার জন্য ভদ্র ভাঁড়ামি জানি, ভদ্রলোকের ধাতে সহ্য হয়
> এমন নীচতা, নোংরামি, চালাকি জানি।'[১৭]

মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার প্রেক্ষিতে চরিত্র নির্মাণে বিমল কর বৈচিত্র্যময়তা দেখিয়েছেন। 'আত্মজা' গল্পে স্বামী হিমাংশু ও মেয়ে পুতুলের বাৎসল্য সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছে স্ত্রী যূথিকা। গল্পকার নৈপুণ্যের সঙ্গে যুথিকার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে কাহিনির মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে ব্যাধিগ্রস্ত হেমাঙ্গ আত্মীয়স্বজন বিচ্যুত হয়ে জীবনে একাকিত্বের যন্ত্রণা পেয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর পর অনুতপ্ত স্ত্রী ফিরে এলেও সে ভেতর থেকে মেনে নিতে পারেনি। চূড়ান্ত অস্তিত্বের সংকটে আত্মহত্যা করে হেমাঙ্গ। অবচেতন মনে মানুষের অপার আকাঙ্ক্ষাকে বিমল কর 'মানসাঙ্ক' গল্পে চন্দন চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পে ছোট্ট ছেলে চন্দন উন্মত্ত মানুষের হাত থেকে যমুনা-অজিতকে বাঁচাতে ব্যগ্র হয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে অবচেতন স্তরে সে বৃহৎ বৃক্ষ হয়ে আত্মহত্যা থেকে তাদেরকে বিরত করতে চেয়েছে। চন্দনের মনোজগতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে গল্পকার নতুন মাত্রায় ধরতে চেয়েছেন —

> '...শাখা প্রশাখা পল্লব ছড়িয়ে চন্দন ছুটতে ছুটতে ভাবল–
> তার দেহের এই শাখা অথবা প্রশাখায়, এই অজস্র পাতার
> আড়ালে সেই দুটি মানুষকে ও লুকিয়ে ফেলবে, আড়াল করে
> নেবে, তারপর মাথায় করে পার করে দেবে পাহাড়।'[১৮]

বিমল করের সৃষ্ট গল্পবিশ্বে আদর্শবাদী দার্শনিক কয়েকজন চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা মানবজীবনের নিহিত সত্যকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে চরিত্রগুলিকে গল্পকার রূপকধর্মী করে তুলেছেন। 'সত্যদাস' গল্পে সত্যদাস চরিত্রের রূপকধর্মিতার অন্তরালে জীবনে সুখ-দুঃখের দ্বান্দ্বিকতা বিধৃত হয়েছে। 'সুধাময়' গল্পে মৃত্যু-প্রেম-কামনা-সংযমের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে সুধাময় আত্মসত্তার স্বরূপের প্রতি সন্ধানী হয়েছেন। জীবনপথে চলতে চলতে সে জীবনকে আবিষ্কার করতে ব্যাকুল হয়েছে। গল্পের শেষে তাঁর অন্বেষণের যাত্রাকেই লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন–

> 'সুধাময় তারপর মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে চলে
> গেল। কেন–কে জানে ? হয়ত এত সংশয়, দুঃসহ বেদনা
> তার সহ্য হয়নি। সে নতুন করে তার বিশ্বাসকে খুঁজতে
> বেরিয়েছে কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।'[১৯]

মৃত্যুবোধের মধ্য দিয়েই জীবনকে অনুভব করার যে দার্শনিক আকাঙ্ক্ষা মানুষের

সত্তায় স্থিত, তারই প্রতিভূ হয়ে উঠেছে 'অপেক্ষা' গল্পের শিবতোষ। মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্বে আলোড়িত এই চরিত্র বিমল করে'র দার্শনিক প্রজ্ঞার চিহ্নায়ক হয়ে উঠেছে। অবধারিত মৃত্যুকে অপরসত্তা রূপে নির্মিত করে তিনি শিবতোষ চরিত্রের উপলব্ধিকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন—

> 'শিবতোষ অনুভব করতে পারল, কোনোদিন সে আসবে, অতি অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু সে কেমন, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, শিবতোষ বুঝতে পারল না। শুধু শিবতোষ আজ এই মধ্য নিশীথে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে সেই অবধারিতকে অনুভব করতে পারছে।'[২০]

তাঁর গল্পের জগতে একাধিক নিঃসঙ্গ চরিত্রের বিন্যাস দেখা যায়। নির্জনতার নিবিড়তাতেই তারা যেন স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। 'হরিশের বিষাদ' গল্পে একাকী হরিশ নিজের জগত নিয়েই বেঁচে থাকে। মায়ের অন্যায়, মনের যন্ত্রণাকে নীরবে সহ্য করে নিঃসঙ্গ হয়ে সে পোষ্য কুকুরের কাছে অনর্গল কথা বলে চলে। হরিশের মতোই 'গগনের অসুখ' গল্পের গগন অসুস্থতার জন্য ক্রমশ সমাজ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের সাহচর্যের কৃত্রিমতাকে অনুধাবন করে তার যন্ত্রণা হয়। 'শীতের মাঠ' গল্পে আমরা অপর এক নিঃসঙ্গ মানুষ নবেন্দুর মুখোমুখি হই। অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দী নবেন্দু প্রতিদিন মাঠের দিকে তাকিয়ে নির্জনতা-শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করে। শেষপর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে সঙ্গী করে সে নিঃসঙ্গতাকে আত্মস্থ করে নেয়—

> 'নবেন্দু এই মুমূর্ষু রিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে আছে। এখন বাইরের ছায়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে তার মনে আস্তে আস্তে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা, অধৈর্য, বেদনা নামবে, ছায়া যত ঘন হবে শীতের সন্ধের অন্ধকারে ডুবে যাবে, নবেন্দুর মনের এই শূন্যতা আকুলতা ততই আশ্চর্য এক হাহাকারে অসাড় হয়ে যাবে।'[২১]

এই নিঃসঙ্গতা-একাকীবোধ বিমল করের গল্পের চরিত্রদের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার স্বকীয়তায় 'উদ্ভিদ' গল্পের পূর্ণেন্দুবিকাশ, 'আঙুরলতা'র গল্পের আঙুরলতা, 'সুধাময়'র সুধাময়, 'মোহনা' গল্পের মোহনা, 'নদীর

জলে ধরা-ছোঁয়া খেলা'র নন্দকিশোর প্রত্যেকেই যেন একে অপরের থেকে পৃথক। জীবনভাবনার অনন্ত সরণিতে এরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, একাকী।

কয়েকটি গল্পে বিমল কর নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন। 'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পের কোলিয়ারির কর্মী পিয়ারীলাল-কৌশল্যা, 'হাত' গল্পে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হীরালাল প্রভৃতি সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদেরই প্রতিনিধি। তবে গল্পকার আর্থ-সামাজিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করতে চান নি। বরং মনোজগতের টানাপোড়েনেই চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়েছে। 'মানবপুত্র' গল্পে ভবঘুরে গঙ্গামণির লাঞ্ছনা দেখে হোটেলকর্মী কেষ্টর অনুভূতির গভীরতা পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করে। 'আঙুরলতা' গল্পে আঙুরলতা বিমল করে'র সৃষ্ট অন্যতম মনোযোগ আকর্ষণকারী চরিত্র। বিশ্বাসঘাতক স্বামীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য তার আত্মত্যাগ মানবিকতাকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঊর্দ্ধে উঠে আঙুরলতা গঙ্গার কাছে শ্মশানঘাটে দাঁড়িয়ে জীবনের সারসত্যকে উপলব্ধি করতে উদ্যোগী হয়েছে—

> 'না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।'[২২]

বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী কয়লাখনি ও রেলশহর তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি হওয়ায় বিভিন্ন অবাঙালি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী একাধিক চরিত্র রয়েছে নানা গল্পে। 'জোনাকি' গল্পে স্যামুয়েল, 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে জিনি কিংবা 'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পের পিয়ারীলাল ধর্মগতভাবে খ্রিস্টান হলেও চরিত্রবিকাশে গল্পকার ধর্মীয় অনুষঙ্গকে কখনো গুরুত্ব দেন নি। এছাড়া 'হাত' গল্পে ড্রাইভার হীরালাল, 'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পে কৌশল্যা, 'রাতপাখির ডাক' গল্পে চা-বাগান শ্রমিক প্রেমবাহাদুর প্রভৃতি নানা অবাঙালি চরিত্র বিমল করের গল্পে উঠে এলেও সামাজিক বা জাতিগত সংস্কৃতি বা আচার-আচরণের প্রেক্ষিতে তারা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নি।

নারী চরিত্র চিত্রণে বিমল করের শৈল্পিক স্বকীয়তা বিভিন্ন গল্পে প্রতিফলিত

হয়েছে। তাঁর গল্পে পুরুষদের সমান্তরালে নারীরাও নিজস্বতায় উজ্জ্বল। অনেকক্ষেত্রে, ভাবনার মগ্নতা ও নিজস্বতায় নারী চরিত্ররা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে বেশি সক্রিয়। নারীবাদের বিশেষ কোনো তাত্ত্বিকতায় চরিত্রগুলি বিন্যস্ত হয় নি। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে তিনি বিভিন্ন মাত্রিকতায় নারীচরিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পভুবনের নারীরা প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসকে অগ্রাহ্য করে স্বকীয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছে বারে বারে।

'জানোয়ার' গল্পে দাম্পত্য জীবনে স্বামী সুধীবন্ধুর নির্লিপ্ততা ও অবহেলাকে মেনে নিতে পারেনি অতসী। অর্থ-ক্ষমতার প্রতি আসক্ত স্বামীর কাছে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য-গুরুত্ব বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছে। গল্পের মধ্যেই তা বিবৃত হয়েছে—

> 'আশ্চর্য, অতসীর দিন দিন এই ইচ্ছেটাই তীব্র হতে লাগল যে, সোমকে–তার স্বামীকে, সে সত্যিই যে সাংঘাতিক ঘৃণা করে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যেমন করেই হোক। যেন সেটা বোঝানোর উপর অতসীর অস্তিত্ব, অতসীর স্বাতন্ত্র্য, তার নারীত্ব নির্ভর করছে।'[২৩]

প্রতিশোধস্পৃহায় অতসী এক ভয়ংকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। স্বামীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহাদুরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে সে স্বামীকে মানসিকভাবে তীব্র প্রত্যাঘাত করেছে। 'সুনীতিমালার উপাখ্যান' গল্পে দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে পঙ্গু সুনীতি নিজের প্রতি স্বামী গগনের নিস্পৃহতায় কাতর হয়েছে। দুর্ঘটনার পূর্বে তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসার কৃত্রিমতাকে সে উপলব্ধি করে। গগনের কাছে দেহ ব্যতীত নিজের মূল্যহীনতায় তার হৃদয় স্বগত প্রশ্নে ব্যাকুল হয়—

> '...গগন কি আমার কাটা পায়ের বাইরে আর কিছুই দেখতে পেল না। টিকটিকির লেজ কেটেছে যেখানে সেখানেই কি তার চোখ আর মন! তার বাইরে আমি–সুনীতি-সুনু কেউ নই। আমার কোনো অস্তিত্ব নেই অন্য কোথাও।'[২৪]

ভালোবাসার এই অপমানে ক্ষত-বিক্ষত সুনীতি পুরুষের কাছে এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করতে চায় নি। নিবারণের সঙ্গে সম্পর্কে সন্তানসম্ভবা হয়ে সে স্বামীকে বিদ্রুপ করে এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পুরুষের ভণ্ডামি-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধে

সে পুরুষকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বাইরের জগতের পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার সীমারেখায় বদ্ধ না হয়ে বিমল কর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা অন্তর্জগতের উপলব্ধিজাত সত্যবোধকে সর্বদা গুরুত্ব দিয়েছে। 'জলজ' গল্পে মায়ের দ্বিতীয় স্বামী সোমনাথের পুত্র রন্টুর প্রতি দুর্বলতাকে নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারেনি জলজ। অবচেতনে সুপ্ত ভালোবাসা লুকিয়ে হারিতের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার দ্বিচারিতায় তার সত্তা সাড়া দেয়নি। তাই সবাইয়ের কাছ থেকে সে নীরবে বিদায় নিয়েছে। 'অনাবৃত' গল্পে স্বামীহারা ইন্দুলেখা সাংসারিক স্বাচ্ছল্যের মধ্যে থাকলেও দাম্পত্যজীবনে কখনোই তৃপ্ত হতে পারেনি। স্বল্পবয়সী রাজার মানসিক সাহচর্যে সে জীবনের অনেক অপূর্ণতাকে অতিক্রম করেছে। আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধবীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে আঘাত পেলেও রাজাকে কেন্দ্র করে জীবনের আনন্দ উপলব্ধিকে অতসী নিঃসংকোচে ব্যক্ত করেছে—

> 'আমি আমার কাছেই বলছি, আমি ওই রাজার যৌবনের ভালমন্দ দুইই ভালবেসেছি। ও আমার কাছে শুধু রাজা নয়, একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের তাজা ছেলে নয়, ও তারও বেশি হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[২৫]

মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে ভালোবাসা সম্পর্কে নারীর এই কুন্ঠাহীন স্বীকারোক্তি আমাদের ভাবনাকে আলোড়িত করে। 'মোহনা' গল্পে মোহনা জীবনের ভাঙন-গড়নের মধ্যে সত্তাগত তাৎপর্যকে অনুভব করতে চেয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর চিরাচরিত মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কামনা-প্রেম-চাহিদাকে লুকিয়ে রাখতে চায় নি। জীবনের প্রবল টানাপোড়েনের মাঝেও মোহনা আত্মসচেতন হয়ে উঠতে আগ্রহী। ফুলদা'র কাছে তার সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে—

> 'জীবনটা আমার। আমার নয় ? এই শরীর বল মন বল সবই তো আমার। আমার নিজের যদি শরীর নিয়ে মনে না হয় যে, আমি চোর তবে আমি কেন তাকে নিয়ে কোথায় রাখি, কোথায় ধরি করে ভয়ে মরব। আমি কি চুরি করে আমার দেহটা এনেছি ? এ আমার জন্ম থেকেই। কেন আমি নিজের জিনিস নিয়ে পথ হাঁটতে ভয় পাব ? না না, আমার ভয়টয়

ছিল না। বরং আমি দেখতাম ওই জিনিসটা আমার সম্পদ।'[২৬]

'আঙুরলতা' গল্পে দেহব্যবসায়ী আঙুরলতা চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বময়তা ও তার উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা গল্পকারের লেখনীতে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। এক সন্তানহারা নারীর বাৎসল্যের প্রতি অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর চরিত্রে। এছাড়া, 'পিঙ্গলার প্রেম' গল্পে কিরণশশী, 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে জিনি প্রভৃতি ভিন্ন মাত্রার নারী চরিত্র সৃজনে বিমল কর সফল হয়েছেন।

প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিমল কর নানা গল্পে অপ্রধান চরিত্রগুলিকেও যথেষ্ট উজ্জ্বল করে তুলেছেন। স্বল্প পরিসরের মধ্যে কয়েকটি ইঙ্গিতেই তিনি চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই অপ্রধান চরিত্রগুলির উপস্থিতির জন্য মূল চরিত্রগুলি যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছে। 'জানোয়ার' গল্পে সুধীবন্ধু সোমের দেহরক্ষী বাহাদুরকে কম সংলাপের মধ্যেও তিনি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। এই চরিত্রটি গল্পের পরিণতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে ভুবন চরিত্রটিই যেন শিবানীর তিন প্রেমিকের বিবেকের প্রতিরূপে উপস্থিত হয়েছে। 'যুধিষ্ঠিরের আয়না'তে রূপকধর্মী চরিত্র যুধিষ্ঠিরের পাশে গগনচন্দ্রের চরিত্রটিও যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের জীবনদর্শন গঠনে তার বাবা-মা'র অনিবার্য ভূমিকা ছিল। বিমল করের শৈল্পিক প্রশ্রয়ে এই দুটি চরিত্র সুধাময়ের পাশে কখনোই ম্লান হয়ে যায় নি।

বিমল করের সৃষ্ট চরিত্র বহির্জগতের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে সর্বদা আত্মবিশ্বাসী। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে তারা বারে বারে লড়াই করার চেষ্টা করেছে; বিপর্যয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। 'আঙুরলতা' গল্পের আঙুরলতা, 'অনাবৃত' গল্পের ইন্দুলেখা, 'স্বপ্নের নবীন' গল্পের নবীন প্রত্যেকেই জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক প্রচলিত ধারায় বিমল করে'র গল্পবিশ্বের চরিত্ররা আস্থাশীল হতে পারে নি। বরং অনেকক্ষেত্রেই তারা নিজস্ব শর্তে জীবনে বাঁচতে আগ্রহী। সর্বোপরি, যন্ত্রণা-স্বপ্নভঙ্গ-আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বিচিত্র মাত্রায় জারিত হয়েও চরিত্রগুলি মানবিকতাবোধে উজ্জ্বল। কোনো কোনো চরিত্র আবার জীবনের পূর্ণতা সন্ধানে উদ্বেল হয়েছে। 'অপেক্ষা' গল্পের শিবতোষ, 'সুধাময়' গল্পের সুধাময়, 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়া খেলা'র নন্দকিশোর

জীবনদর্শনের গভীরে পৌঁছতে চেয়েছে।

ঘটনা-পারম্পর্য বা কাহিনি বিন্যাসের ভারে চরিত্রগুলিকে কৃত্রিমতায় ঋদ্ধ করতে চান নি বিমল কর। কোনো চরিত্র সম্পর্কে গল্পকার পাঠককে প্রাথমিক সূত্রে পরিচয় করিয়েছেন; কিন্তু চরিত্রগুলিকে তিনি কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে চান নি। একটি সাক্ষাৎকারে সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে বিমল করের ভাবনাকে ব্যক্ত করেছিলেন—

> 'বিমলদা বলতেন, চরিত্রগুলো বইয়ের পাতা থেকে উঠে যেন পাশে এসে বসে। যদি কেউ হেঁটে যায়, তার পোশাকের শব্দও যেন পাঠক শুনতে পায়।...তোর বই খোলা মাত্রই যেন বইয়ের পাতা থেকে চরিত্রগুলো জীবন্ত নেমে আসে। অক্ষরগুলো পড়ে থাকবে পিছনে।'[২৭]

অনুপুঙ্খতা ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির সমন্বয়ে বিমল কর চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলার বিরল শৈল্পিকতা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবলমাত্র গল্পের বর্ণ-শব্দ-বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি; একইসঙ্গে পাঠকের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। অন্তর্জগতের সক্রিয়তায় উজ্জ্বল চরিত্রগুলি আমাদের মনোজগতেও আলোড়ন তোলে। গল্পে নানান মাত্রার নারী-পুরুষ চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে বিমল কর শেষ পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকাদের সত্তাস্থিত বহুস্বরকেই ধ্বনিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

তথ্যসূত্র :

১. প্রস্তাবনা : বিমল কর; নির্বাচিত গল্প; হীরক রায় সম্পাদিত; অনন্য প্রকাশন; ১৯৭৩

২. ভূমিকা: সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠ গল্প : বিমল কর; প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

৩. 'কইতে কথা বাধে': সমরেশ মজুমদার; আরুণি পাবলিকেশনস; ২০০০; পৃ. ৩৯

৪. সাক্ষাৎকার: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়; 'আমার সময়'; জানুয়ারি ২০১০; ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা; পৃ. ১৬

৫. 'যযাতি': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ২৩৩

৬. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য: সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; ২০০৯; পৃ. ৩৯১

৭. তদেব, পৃ. ৩৯১

৮. 'পিয়ারীলাল বার্জ': বিমল কর; বরফসাহেবের মেয়ে, ভারতী গ্রন্থ ভবন; ১৯৫৭; পৃ. ৪

৯. 'অনাবৃত': বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯৮৯; পৃ. ১০৪

১০. 'শূন্য': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ১৬৬

১১. 'মানবপুত্র'; তদেব; পৃ. ৫১

১২. 'উদ্বেগ'; তদেব; পৃ. ৩২০

১৩. 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন'; তদেব; পৃ. ৩৮৯

১৪. 'উপাখ্যান': বিমল কর; শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকা; ১৩৬৮; পৃ. ১৮৮

১৫. 'গুণেন একা' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৬৩৪

১৬. 'পলাশ'; তদেব; পৃ. ১৮৫

১৭. 'সংশয়'; তদেব; পৃ. ৩৬৯

১৮. 'মানসাঙ্ক' : বিমল কর; সুধাময়; এভারেস্ট বুক হাউস; ১৯৫৯: পৃ. ১১৮

১৯. 'সুধাময়' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৬৯

২০. 'অপেক্ষা'; তদেব; পৃ. ৩৩৭

২১. 'শীতের মাঠ'; তদেব; পৃ. ১৯৪

২২. 'আঙুরলতা'; তদেব; পৃ. ২২৯

২৩. 'জানোয়ার'; তদেব; পৃ. ১৫৭

২৪. 'সুনীতিমালার উপাখ্যান' : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; ২০০৬; পৃ. ৬১

২৫. 'অনাবৃত'; বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯৮৯; পৃ. ১১৪

২৬. 'মোহনা'; বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৪৭৬

২৭. সাক্ষাৎকার: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়; 'আমার সময়' পত্রিকা; জানুয়ারি ২০১০, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা; পৃ. ১৬

নবম অধ্যায়

প্রাকরণিক কৃৎকৌশল

গল্পকার বিমল করের শৈল্পিক লেখনীতেই বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা ছোটগল্প নানাবিধ প্রাকরণিক নিরীক্ষায় নতুন রূপে উপস্থাপিত হওয়ার প্রেরণা অনুভব করেছিল। রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের সৃজনশীলতায় বহমান বাংলা ছোটগল্প 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন ধারায় অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়। তবে কল্লোলীয় এবং পরবর্তীকালে তারাশংকর-মানিক-বিভূতিভূষণের গল্পের এই বাঁকবদল প্রধানত গল্পের বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়েছিল। প্রকরণ বা আঙ্গিকগত নতুনত্বের স্বাদ অধরাই ছিল। অবশ্য এই ধারাতেই স্বল্প সময়ের জন্য হলেও প্রমথ চৌধুরী 'চারইয়ারী কথা'এর মাধ্যমে ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে গল্প সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে নাথানিয়েল হথর্ন ১৮৩৭ খ্রিঃ 'টোয়াইস টোল্ড টেলস্' গ্রন্থে ছোটগল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে হথর্নের গ্রন্থে সমালোচনা করা প্রসঙ্গে এডগার অ্যালেন পো ১৮৪২ খ্রিঃ মে মাসে 'গ্রেহাম'স্ ম্যাগাজিনে ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। হথর্ন ও অ্যালেন পো'র নির্দেশিত সংজ্ঞাকে মান্যতা দিয়েই রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য গল্পকারগণ ছোটগল্প রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প বিষয় বৈচিত্র্যে নানাভাবে সমৃদ্ধ হলেও প্রাকরণিক ক্ষেত্রে পো-হথর্নের ধারাকেই কখনো অনুকরণ, কখনো বা অনুসরণ করে চলেছিল। ঔপনিবেশিক ভাবনায় মোহগ্রস্ত বাংলা ছোটগল্পকে বিষয়-আঙ্গিকের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা করতে একদল নবীন গল্পকারের মাধ্যমে প্রথম শৈল্পিক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাহিত্যিক বিমল কর। বিশ শতকে পাঁচের দশকের শেষপ্রান্তে বাংলা ছোটগল্পের চিরাচরিত ভাবনা বিন্যাসের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে উপস্থিত হল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'। বিষয়ের পাশাপাশি প্রকরণের অভিনবত্বে বাংলা গল্পকে শিল্পসুষমায় ঋদ্ধ করলেন গল্পকার বিমল কর।

বাণিজ্যিক পত্রিকার দায়বদ্ধ লেখক হয়েও বিমল কর বাংলা গল্পকে প্রাতিষ্ঠানিকতার

চক্রব্যূহ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। ভিন্ন ধারার প্রাকরণিক বিন্যাসের আধারে বিষয়ের বৈচিত্র্যময় গভীরতায় তিনি বাংলা ছোটগল্পকে এক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। হথর্ন এবং এডগার অ্যালেন পো'এর ভাবনায় প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের 'গল্পতন্ত্র'কে শিল্পিতভাবে প্রথম আঘাত করলেন বিমল কর। তাঁর মতে, সমকালীন গল্পকাররা সময়সম্ভূত নতুন ভাবনা-অভিজ্ঞতাকে চিরাচরিত প্রাকরণিক কৌশলে প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। বরং বাংলা ছোটগল্প যেন এক নতুন আঙ্গিকধারার জন্য অপেক্ষমান ছিল। সাহিত্যিক বিমল কর নিজের গল্পের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রকরণগত অভিনবত্ব নিয়ে আসতে সচেষ্ট হলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার নান্দনিক ফলশ্রুতি হল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'। এক্ষেত্রে ছোটগল্প সম্পর্কিত প্রচলিত কোনো তত্ত্বই মান্যতা পেল না। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকা ও বিমল করের সৃষ্ট বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্প নতুন প্রকরণগত ধারায় অগ্রসর হতে শুরু করে।

ছোটগল্পের সনাতন তত্ত্বে আস্থা রেখে ব্যবসায়িক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনকারী সুবোধ্য-জনপ্রিয় গল্পসৃষ্টির ধারাকে প্রত্যাঘাত করতে চাইল বিমল করের লেখনী। 'ছোটগল্পকে ছোট এবং গল্প হতে হবে'—বাজার চলতি এই সাহিত্যগত ধারণাকে তিনি অস্বীকার করলেন। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে গল্পকার সৃজনশীল হতে বাধ্য নন। এমনকি, তাত্ত্বিকদের নির্দেশিত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে 'ছোট' শব্দটির যথার্থ্যতা নিয়েই প্রশ্নমুখর হয়ে ওঠেন নতুন রীতির গল্পকারগণ। এ প্রসঙ্গে বিমল করের অনুভবী বিশ্লেষণ—

> '...আমরা ছোটগল্পের 'ছোট' কথাটির নির্দিষ্ট কোনো অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে অপারগ। ফলে, মনে করি, কোনো লেখা সম্পর্কেই চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব সম্ভব নয়। কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই বাঁধা তত্ত্ব শিল্পীকে তার প্রার্থিত স্বর্গে পৌঁছে দেয় না। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে, আমরা–এই গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকরা মনে করি, প্রচলিত তত্ত্বের প্রতি আমাদের আনুগত্য রাখার কারণ নেই, কেন না যে কোনো ধরণের লেখা হোক তার সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে না।'[১]

প্রধানত কাহিনিধর্মী ও বিবরণাত্মক বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় ধ্বনিত হলো ভিন্নসুর। 'গল্প' কথাটির বহুপ্রচলিত ব্যাখ্যা আর সমর্থিত হলো না। তথাকথিত 'সাসপেন্স', চমৎকারিত্বের চমকের আধারে আর ছোটগল্প রচিত হবে না। উদ্বেগ-চমক-স্টান্টের প্রচলিত বিন্যাস থেকে ছোটগল্পকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল। নতুন বয়ান, নব শৈলীতে ছোটগল্প সৃষ্টিতে মগ্ন হলেন বিমল কর। শুধুমাত্র বাহ্য ঘটনা পরম্পরায় কাহিনি গ্রন্থনকে যথার্থ শিল্পময় গল্প বলা সংগত নয়। নতুন রীতির গল্পধারায় বহির্বাস্তব ক্রমশ গৌণ হয়ে গেল, প্রাধান্য গেল অন্তর্বাস্তবতার উপস্থাপন। পাঠক-পাঠিকার চির অভ্যস্ত সাহিত্যরুচিকে গতানুগতিকভাবে তৃপ্ত করার পরিবর্তে তিনি তাদের রুচিবোধ প্রকাশে নতুন মাত্রা প্রত্যাশা করেন। 'গল্প বলছি, শোনো' এই ধারণায় তাঁর শিল্পীসত্তা বিশ্বাসী ছিল না। কাহিনির আরোপিত মায়ায় পাঠক-পাঠিকাকে তিনি মুগ্ধ করতে চান নি; বরং পাঠক-পাঠিকাকেই স্রষ্টার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির শরিক করে তুলতে একান্ত আগ্রহী। গল্পে অন্তর্বাস্তবতা ক্রমশ প্রাধান্য পাওয়ায় বিমল করের গল্পে আঙ্গিকগত বিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণে নতুন গল্প ক্রমশ কবিতার অন্তস্থ সুরকে আত্তীকৃত করে গড়ে উঠবে। গল্পে 'বিষয়' অপেক্ষা 'বিষয়ী'র প্রাধান্যের জন্যই কাব্যময়তা সহজেই গল্পের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মিলেমিশে গেছে। ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিক বর্ণনের পরিবর্তে অন্তর্জগত গুরুত্ব পাওয়ায় পাঠক-পাঠিকারা পাঠ-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখকের ভাবনার অংশীদার হয়ে উঠলেন। বিমল করের তীক্ষ্ণ অবলোকন —

> 'গল্প যতকাল নিছক গল্প ছিল ততকাল পাঠক ছিল শ্রোতা। গল্প যখন থেকে কাব্যের ঐশ্বর্য গ্রহণ করল, তখন থেকে পাঠক আর শ্রোতা থাকল না, লেখকের অভিজ্ঞতার সে সাথী হল। অর্থাৎ কৌতূহল মিটিয়ে সে তৃপ্তি পেল না, অন্যের অনুভূতি সবিস্তারে অনুভব করতে পারল। নিজের অভিজ্ঞতার অনুভূতির মতন।'[২]

ছোটগল্পকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই বিমল কর প্রকরণগত দিক থেকে নতুন মাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের আত্মীয়তার প্রসঙ্গে তাঁর দূরদর্শী ভাবনা প্রতিফলিত—

'...ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ দেবার এই চেষ্টা মূলত গল্পের হৃদয়কে শিল্পসম্মত শুভ্রতা দেবার অভিলাষ। যান্ত্রিকতা থেকে তাকে মুক্ত এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা।'[৩]

ঘটনার ঘনঘটা থেকে ছোটগল্প ক্রমশ মুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করল। বরং স্রষ্টার নিজস্ব অভিজ্ঞতা-অনুভূতির অন্তর্মুখীন প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠল ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের এই হৃদয়গত পরিবর্তনের শিল্পিত প্রকাশের জন্য এক নতুন আঙ্গিক-রীতির প্রয়োজন ছিল। বিমল কর যথার্থই বলেছেন—

'নতুন ধারণা বা ভাবনা, নতুনভাবে জানা অভিজ্ঞতা পুরানো রীতির বোতলে ঢোকানো যায় না। আধুনিক কবিরা যেমন তাদের নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের জন্য কাব্যের পূর্বরীতি ভেঙেছেন, তেমনি ঔপন্যাসিকরাও প্রচলিত রীতি না ভেঙে পারেন নি, এবং ছোটগল্পের লেখকরাও নতুন সুরা পুরনো বোতলে ভরতে রাজী নন'।[৪]

তাই সমকালে ছোটগল্প ক্রমশ কবিতার জগত অর্থাৎ চিত্রকল্প-প্রতীক-রূপক-ইঙ্গিতময়তার বহুল মাত্রাকে আত্মস্থ করছিল। বিমল করের নিজস্ব মতে, কবিতার জগতকে সঙ্গে নিয়েই ছোটগল্প ধীরে ধীরে উপন্যাসের ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অন্যান্য শিল্প মাধ্যম থেকে প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন নান্দনিক মাত্রা গ্রহণ করে ছোটগল্পকে নতুন প্রাকরণিক বিন্যাসে উপস্থাপিত করার শিল্পসুষম প্রচেষ্টাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিমল করে'র সৃষ্টিশীল গল্পজগত। বিশ শতকে পাঁচের দশকের শেষপর্বে ছোটগল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষাতেই নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মগ্ন হয়েছিলেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থেও সেই ভাবনা উঠে এসেছে—

'বাংলা ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক, লেখক যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর লেখাটি লিখতে পারেন– এই রকম উদ্দেশ্য নিয়েই 'নতুন রীতি'র কাজ শুরু করা গিয়েছিল।'[৫]

বাংলা গল্পে Narrative Style বা ধারাবাহিকভাবে কাহিনি বয়নের প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করলেন বিমল কর। আখ্যানগত রৈখিকতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা

করলেন, ফলে ক্রমশ ধসে পড়ল 'কাহিনি' সমন্বিত কাঠামো। অবশ্য গল্পজীবনে এক দশক অতিক্রান্তের পর প্রধানত 'সুধাময়' গল্প থেকেই এই আঙ্গিকগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পাঁচের দশকের শেষের দিক থেকে তাঁর গল্পের প্রকরণ আরো সূক্ষ্ম শীলিত রূপ লাভ করে। প্রথম দিকের ছোটগল্পের রচনা ক্ষেত্রে তিনি 'গল্প'কেই প্রাধান্য দিতেন। ঘটনার চমক ও কাহিনিসর্বস্বতায় পরিপূর্ণ ছিল এই পর্বের গল্পসমূহ। কিন্তু মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকে উন্মোচিত করার নান্দনিক উদ্দেশ্যে বিমল কর আঙ্গিক-রীতিতে নতুন মাত্রা বিন্যাস করেন। আখ্যান নির্মাণের প্রয়োজনে আর ঘটনাবহুল 'গল্প'কে গুরুত্ব নয়। 'গল্প' এখানে জীবনবোধকে গ্রাস করে না। বরং জীবন ও গল্প মিলেমিশে প্রতীতিমুখ্য ছোটগল্পের সার্থক 'বয়ান' হয়ে ওঠে বিমল করে'র বিভিন্ন ছোটগল্প। কাহিনিসর্বস্ব না হওয়ায় এই গল্পগুলিতে আখ্যানের রৈখিকতা ভেঙে যাচ্ছে, প্লট আর প্রাধান্য পাচ্ছে না। বাচনিক ক্রিয়ার নানা মাত্রার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেন ছোটগল্পের বৈচিত্র্যবহুল নানা পাঠকৃতি। তাঁর সমকালে অমিয়ভূষণ মজুমদারও ছোটগল্পের প্রচলিত তত্ত্বকে অস্বীকার করে ভিন্ন মাত্রায় সৃজনশীল হতে চেয়েছিলেন। পাঁচের দশকে কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্পও প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিককে ভেঙে চলেছিল। তাঁর রচিত 'ফৌজ-ই-বন্দুক', 'গোলাপসুন্দরী' ইত্যাদি গল্প কাব্যময় ভাষা, চিত্রকল্প প্রতীকের মিশ্রণে বিমল কর নির্দেশিত 'নতুন রীতি'র ছোটগল্প ধারার যথার্থতাকেই মান্যতা দিয়েছিল। তাই বিশ শতকে পাঁচের দশকের শেষ ও ছয়ের দশকে শুরুতে প্রধানত বিমল করকে কেন্দ্র করেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পালাবদলের সূচনা হয়। এই পালাবদলের অনুসরণে পরবর্তীকালে 'গল্পহীন গল্প' সৃজনের আকাঙ্ক্ষায় একাধিক ছোটগল্প-কেন্দ্রিক আন্দোলনের জন্ম হয়। তরুণ গল্পকারগণ এই নতুন রীতির ধারায় প্রাণিত হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ'র প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—

> '...গল্পের ক্ষেত্রে ওঁর (বিমল কর) নতুন রীতি, গল্পহীন গল্প, একসময়ে তরুণ লেখকদের মানে আমাদের সেই সময়ের কথা বলছি, আলোড়িত করেছিল। শেখর বসু, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, অভ্র রায়, সমীর রক্ষিত প্রমুখ সম্ভবত এই রীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল।'[৬]

তবে, বুদ্ধদেববাবু কথিত 'গল্পহীন গল্প' লিখতে বিমল কর কখনোই অগ্রসর হননি। ছোটগল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘটনাবহুল 'গল্প'কে প্রাধান্য না দিলেও তিনি গল্পহীনতাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর গল্প 'গল্পহীন গল্প' বা 'শুদ্ধ গল্প' লেখার উৎকট প্রকরণসর্বস্বতা থেকে দূরে থেকেছে। 'বিষয়' থেকে 'বিষয়ী' গুরুত্ব পেলেও কোথাও ভারসাম্য নষ্ট হয় নি। জীবনের নানা অনুভূতিকে ঘিরে গল্পের অবয়ব রচনা করতে চান বিমলবাবু। তথাকথিত 'Round Story' এবং 'গল্পহীন গল্প' এর উভয় ধারা থেকে সরে গিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে চান। 'ঘটনা' অপেক্ষা 'মুহূর্ত'ই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব ও প্রকল্পনার বিমিশ্রণে তাঁর লেখনীতে সৃষ্টি হয় প্রতীতীময় ছোটগল্প বা 'Story of Impression'। 'শীতের মাঠ' গল্পটি এক্ষেত্রে অন্যতম উদাহরণ। সমস্ত গল্পে তেমন নির্দিষ্ট ঘটনা নেই, আছে শুধু রোগগ্রস্ত নিঃসঙ্গ নবেন্দু'র অজস্র ব্যক্তিক অনুভূতি। যন্ত্রণাদগ্ধ এই ব্যক্তির অনুভূতিই গল্পের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে —

> 'আমি কাঁদব না, অতসী; তোমার অপেক্ষা করব না। মাঠ
> আমায় নির্বাক নিশ্চল অনড় হতে শিখিয়েছে; মাঠের মতন
> আমি অন্ধ হব। আমি অন্ধ হয়ে মনে মনে তোমার সিঁথির
> সিঁদুর দেখব, তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ।'[৭]

প্রথম দিকে বিমল করের ছোটগল্পে 'গল্প'ই ছিল মূল বিষয়। কাহিনির কাঠামোও ছিল পূর্বনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত। 'পিয়ারীলাল বার্জ', 'মানবপুত্র', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'জানোয়ার' ইত্যাদি ছোটগল্পে সুপরিকল্পিত কাহিনি বিন্যাস লক্ষ করা যায়। 'সুধাময়' (অক্টোবর ১৯৫৭) পরবর্তী পর্বে গল্পে প্রচলিত ধারায় কাহিনিবিন্যাস প্রায়শই অনুপস্থিত। 'মানসাঙ্ক', 'সে', 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া', 'অপেক্ষা' ইত্যাদি গল্পে প্লট সুগঠিত নয়, এমনকি কোনো গল্প নেই। 'অবিশ্বাস্য', 'অপেক্ষা', 'অপহরণ', 'সহচরী', 'বিচিত্র সেই রামধনু', 'সত্যদাস' গল্পে যেন অন্তর্বাস্তবতা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। 'অপেক্ষা', 'স্বপ্নের নবীন', 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পগুলি আখ্যানের রৈখিকতাকে ভেঙে কাব্যিকতাকে আত্তীকৃত করেছে। শেষ পর্বের এক গল্পে বিমল করের শিল্পসত্তার আত্ম আবিষ্কার এক মরমি কাব্যিকতায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে—

> 'আমাদের গলার স্বর প্রায় অস্ফুট। কথা বলার পর আমরা
> অনুভব করলাম এখানকার নৈঃশব্দ্যকে আমরা চঞ্চল করেছি।

কিন্তু নষ্ট করিনি। আমাদের কথা মাত্র ততটুকু কম্পন
তুলেছে, যতটুকু কম্পন থাকলে, পুকুরের জল জীবন্ত হয়।'[৮]

তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক মুহূর্ত থেকে গল্প শুরু করেন বিমল কর। যদিও প্রথম যুগের বেশিরভাগ গল্প তাৎক্ষণিক ঘটনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। 'মানবপুত্র', 'পিঙ্গলার প্রেম' ইত্যাদি অনেক উদাহরণ রয়েছে। পরে 'গল্প' বর্জন করার প্রবণতায় গল্পের সূচনায় তাৎক্ষণিক মুহূর্তই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'তুচ্ছ', 'শীতের মাঠ', 'নিষাদ' 'সত্যদাস' ইত্যাদি নানা গল্প জীবনের ভিন্ন ভিন্ন তাৎক্ষণিক অনুভূতির মুহূর্ত নিয়েই পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

আখ্যানের একরৈখিকতাকে ভাঙার জন্য তিনি Flash Back রীতিকে প্রায়শই ব্যবহার করেন। 'অপহরণ', 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি', 'সুধাময়' গল্পে এই flash back রীতির সার্থক ব্যবহার ঘটেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের বিভিন্ন অনুষঙ্গ উজিয়ে এসে গল্পকে আরো ব্যঞ্জনাবহুল করে তুলেছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে flash-back রীতির প্রয়োগে গল্পকার তিন প্রেমিক কমলেন্দু-শিশির-অনাদি'র সঙ্গে শিবানীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। শিবানীর জ্বলন্ত চিতার কাছে দাঁড়িয়ে তিন বন্ধুর অতীতচারিতার মধ্যেই লেখক জীবনের নানা মাত্রাকে উন্মোচিত করেছেন।

ছোটগল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে বিমল কর আঙ্গিকের মধ্যে নানা মাত্রা যোগ করেছেন। একাধিক গল্পে 'চিঠি' বা 'পত্রে'র ব্যবহারে কাহিনি গড়ে উঠতে চেয়েছে। 'গগনের অসুখ', 'সুধাময়' ইত্যাদি গল্পে চিঠির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'সুধাময়' গল্পে কথকের প্রতি সুধাময়ের চিঠিই যেন গল্পের বীজসূত্র হয়ে ওঠে। এই চিঠিতেই প্রেম সম্পর্কে সুধাময়ের দার্শনিক ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। আর বন্ধু পরিমলের কাছে শেষ চিঠিতে সুধাময়ের ভালোবাসার দ্বন্দ্ব-ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়েছে। 'অপেক্ষা' গল্পে ডাক যোগে আসা একটি চিঠি এবং চিঠির প্রেরকের অনুসন্ধানের মধ্যেই মৃত্যুসম্পর্কীয় দার্শনিকবোধকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এই চিঠিকে কেন্দ্র করেই শিবতোষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন বর্ণিত হয়েছে—

'চিঠিটা না পাবার অস্বস্তিতে মন এরকম ভরে থাকল যে,
শিবতোষ শান্তি পেল না।...ওই চিঠির চিন্তা ক্রমাগত মনে
পুষে রাখতে রাখতে এত অসংখ্য কথা ভাবল, বিচিত্র চিন্তা

করল শিবতোষ যে, ঘটনাটা বৃহৎ ও অদ্ভুত আকার নিল।

রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না। অশান্তি তাকে জড়িয়ে থাকল।'[৯]

বিমল করের নানা গল্পে অন্তর্বয়নের ক্ষেত্রে 'স্বপ্ন', 'রোগ', 'মৃত্যু' ইত্যাদি নানা মোটিফ (motief) ব্যবহৃত হয়েছে। 'পালকের পা', 'রামচরিত', 'সহচরী' ইত্যাদি গল্পে স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'স্বপ্নের নবীন' গল্পে স্বপ্নের মধ্যেই নবীনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন তৃপ্তি লাভ করে। 'মানসাঙ্ক' গল্পে স্বপ্নের ব্যবহারেই গল্পকার চন্দনের গহন মনের অনুভূতিকে উন্মোচিত করেছেন। শেষ পর্বে রচিত 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' বিলাসের স্বপ্নচারিতাই গল্পের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্বপ্নের মধ্য দিয়েই বিলাস নিজস্ব জীবনবোধে স্থিত হয়েছে।

এছাড়া, একাধিক গল্পে 'রোগ', 'মৃত্যু' ইত্যাদি অনুষঙ্গে কাহিনির নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন গল্পকার। 'সুধাময়' গল্পে মা পুণ্যময়ীর রোগে আক্রান্ত হওয়াতে সুধাময় যেমন জীবনের নশ্বরতায় ভয় পেয়েছে, তেমনি হৈমন্তীর আরোগ্যহীন অসুখের মধ্যে সে ভালোবাসার গভীরতাকে বুঝতে চেয়েছে। বিমল কর এই গল্পে সুধাময়ের জীবনদর্শন উপলব্ধিতে মৃত্যুভয় ও অসুখ প্রসঙ্গকে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া', 'গগনের অসুখ' ইত্যাদি গল্পেও রোগের প্রসঙ্গ এসেছে। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গের আশ্চর্য ব্যাধির অনুষঙ্গেই গল্পকার মানবমনের গভীরতর সুপ্ত অসুখের অনুভূতির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো গল্পের ভেতরে ছোটো ছোটো একাধিক গল্পের বিন্যাসে বিমল কর কাহিনি-ক্রমকে যেমন একদিকে ভেঙে দেন, তেমনি কথারূপকে আরো ব্যঞ্জনাময় করে তোলেন। 'নেশা', 'অবিশ্বাস্য', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন', 'একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ' ইত্যাদি গল্পের মধ্যে একাধিক গল্প সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যেগুলি গল্পের অন্তর্বস্তুকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'শূন্য' গল্পে 'মৈত্রসাহেবের কথা' ও 'আমার কথা' শিরোনামে দুটি ভিন্ন কথনরীতি একইসঙ্গে সহাবস্থান করে। ফলে আখ্যানের রৈখিক বিন্যাস ভেঙে এক নতুন মাত্রা সঞ্চারিত হয়। এই ভিন্ন ধর্মী আঙ্গিক তাঁর 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পেও লক্ষ করা যায়। এই গল্পের কথককে বিশ্বের রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে অবহিত করতে চান শিবতোষ। গল্পে জগতস্থিত অজ্ঞেয় সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে কথককে বিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিজীবনের এক গল্প বর্ণনা

করেন। শিবতোষের জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনিই যেন আমাদের গল্পের মূল ভাবনায় উত্তরিত হতে সাহায্য করে। 'বন্ধুর জন্য ভূমিকা'তে এই রীতির ব্যবহারের নৈপুণ্য অসাধারণ। অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখক বসুধা মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব রচিত পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। প্রতিটি গল্পের কথাবস্তুর মধ্য দিয়ে বসুধার সামগ্রিক জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত্যু-প্রেম-জীবনের প্রতি আসক্তি-অপ্রাপ্তি-যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভূতিতে পূর্ণ বসুধা'র ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুলিতে। মূল গল্পে কথকের বয়ানেই তা স্পষ্ট হয়েছে—

> 'অবশ্য প্রেমের গল্পের নাম 'নরক হইতে যাত্রা'–এ যেন খুবই অদ্ভুত শোনায়। নরক হইতে যাত্রা'য় একটি যুবকের প্রেম-পিপাসা, প্রেম এবং পরে তার ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। গল্পের নায়ক বসুধা নিজে, যদিও লেখায় নায়কের নাম পরিমল।'[১০]

গল্পকারের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথী করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকক্ষেত্রে উত্তমপুরুষ কথনরীতি গ্রহণ করেছেন। 'দরজা', 'নীরজা', 'সে', 'নরকে গতি' ইত্যাদি গল্পে উত্তমপুরুষ জবানিতে গল্পের বিন্যাস দেখা গেছে। ছোটগল্পের মধ্যে অন্তর্বাস্তবতাকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বিমল কর উত্তমপুরুষ কথনবিন্যাসকে শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করেছেন। 'সহচরী' গল্প এক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তথাকথিত প্লট এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু গল্পকার উত্তমপুরুষ কথনে যন্ত্রণাধ্বস্ত ব্যক্তি অস্তিত্বের ভাষ্য উপস্থাপিত করেছেন। সমস্ত গল্প জুড়ে উত্তম-পুরুষ কথনের মধ্যে একাধিক মনোকথনের ব্যবহার করে পাঠক-পাঠিকাকে স্বীয় অনুভূতির শরিক করে নিতে চেয়েছেন। কথকের নিজস্ব কথনে ব্যথাস্পৃষ্ট সত্তার হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে—

> 'আমি কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না। প্রেম, ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ, আদর্শ–এইসব আর কী। এমন কী, তুমি ভেবো না, আমি নারীর শরীরও বিশ্বাস করি। তাও করি না। আমি কি নিজের শরীরকেই বিশ্বাস করি। যদি করতাম, আমার ঐ জ্বলজ্যান্ত দেহটা মরার খাটিয়ায় তুলে দিয়ে আমি নিজেই হরিধ্বনি দিতে দিতে যেতাম না।'[১১]

বাস্তবধর্মী কাহিনি আরো অনুভূতিময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে তোলার উদ্দেশ্য বিমল কর গল্পের মধ্যে রূপকথা-উপকথা-লোককথাকে শৈল্পিক বয়নে সঞ্চারিত করে দেন। শেষদিকে সৃষ্ট 'উপাখ্যানমালা'র পাঁচটি গল্প ব্যতীত 'অবিশ্বাস্য', 'সোপান', 'জননী' গল্পেও লোকজ–রূপকথাধর্মী কাহিনি ব্যবহৃত হয়েছে। 'কাম ও কামিনী' গল্পে কাম-কামিনীর লোকমেলাটিই গল্পের মূল আধার হয়ে উঠেছে। 'সোপান' গল্পে 'নভস্‌তি' বা 'মিনার'কে কেন্দ্র করে মতিয়া ও ত্রিপাঠীবাবু যে দুটি রূপকথা-লোককথা জাতীয় গল্প বলেছেন, তাই যেন গল্পের চরিত্রগুলির জীবনভাবনাকে প্রভাবিত করে। সোপানের শীর্ষে অনেক কষ্টে একাকী পৌঁছে এই দুটি গল্প থেকে কথকের নিজস্ব অনুভূতির সঞ্চয় হয়েছে—

> 'সেই রাজ্যত্যাগী বৃদ্ধ রাজার কাহিনী আমার মনে পড়ল, যিনি খঞ্জ এবং অক্ষম হয়েও চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গারোহণ করার। তিনি কি পেরেছিলেন শীর্ষে পৌঁছোতে ? আমার ত্রিপাঠীবাবুর কাহিনীও মনে পড়ল। সেই রানী প্রকৃতই কী চেয়েছিলেন ! কোন অসামান্য তৃপ্তি ? কতটা উচ্চতায় এসে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন ?'[১২]

'জননী' গল্পে মেজভাই দীনেন্দ্র রাঁচিতে এক মুন্ডা পরিবারের মাটির ঘরের দেওয়ালে মৃত ছেলের ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার এক ছবি দেখেন। এই ছবির লোকজ ব্যাখ্যা অনুসারে, মৃত্যুর পর মর্ত্য থেকে স্বর্গ যাওয়ার অনেক পথ একাকী যেতে হওয়ায় তার সঙ্গে খাবার, পানীয় জল, আত্মরক্ষার লাঠি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ছবিতে স্নেহ-মমতা, ইহকালের মায়া-মমতা, পরলোকের দুর্ভাবনা-যন্ত্রণা একত্রে প্রতীকায়িত হয়েছে। দীনু ও তার ভাইবোনেরা একত্রে মৃত মায়ের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পাথেয় হিসেবে কেউ স্বার্থত্যাগ-সাহস, কেউ আবার ভালোবাসার মন দিতে চেয়েছে। একটি গ্রামীণ লোকচিত্রের লোকায়ত ভাষ্যে প্রাণিত হয়ে সন্তানরা তাদের মায়ের অনন্ত যাত্রাকে উপলব্ধি করেছে। গল্পের শেষে কথকের অনুভবে তারই প্রতিফলন—

> 'সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমার মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।'[১৩]

ছোটগল্পের ভাষাবিন্যাসে বিমল করের শিল্পিত দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। প্রথম দিকে তাঁর গল্পভাষায় সুবোধ ঘোষের প্রভাব থাকলেও শৈল্পিক তাগিদেই তিনি নিজস্ব গল্পভাষা নির্মাণ করেছিলেন। বিমল করে'র ছোটগল্প কাহিনি-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত হয়ে যতই অন্তর্বাস্তবতার ধারক হয়ে উঠছিল, ততই তাঁর ভাষাশৈলীতে নানা মাত্রায় বিবর্তন লক্ষ করা গেল। গল্পের মধ্যে 'গল্প' প্রাধান্য না পাওয়ায় অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ' সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা হয়ে গেল কাব্যিকতায় পরিপূর্ণ। জীবনের গভীরতর অনুভূতি বহনের জন্য বিমল করের গল্পভাষা বহুল ইঙ্গিতময়তায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। 'সুধাময়' গল্পে এরকম এক আবেগদীপ্ত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়—

> 'পশ্চিমের আকাশ পটে সূর্যডোবার শেষ আভাটুকু নিভু নিভু। পাখির কাকলি হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ যেন। সুধাময়ের মনে হল, বিহঙ্গহীন আকাশের দিকে সে তাকিয়ে আছে-সমুদ্রের ধূসরতা নেমেছে সামনে একটি নিঃসঙ্গ ম্লান নক্ষত্র পশ্চিমের আকাশে। এ যেন এক অনন্ত বিচ্ছেদের অথচ কী এক আনন্দের মিলনমুহূর্ত।'[১৪]

ইশারাধর্মিতায় ঋদ্ধ এই গল্পভাষা কখনোই কৃত্রিম বা আরোপিত বলে মনে হয় না। তৎসম বা অচেনা-অনভ্যস্ত শব্দে এই ভাষা ভারাক্রান্ত নয়, বরং সহজ-সরল-মার্জিত ভঙ্গিতে গল্পের মূলভাবকে প্রকাশে সক্ষম। নিজের ভাষাশৈলী সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে গল্পকারের ভাবনা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য—

> 'আমার ধারণা আরোপিত ভাষা কখনই মনকে সাড়া দেয় না। কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে ভাষাকে হতে হবে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক।'[১৫]

গল্পের বিষয়গত তাৎপর্য অনুযায়ী ভাষাবয়নে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। 'সুধাময়' গল্পে আবেগমথিত ভাষা ব্যবহৃত হলেও 'ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' গল্পের ভাষা ঋজু, আবেগহীন ও তীর্যক। শব্দের সংযত ব্যবহারে তিনি নৈঃশব্দ্যকে অর্থবহ করে তোলেন, যা আমাদের পাঠক্রিয়াকে নিজ নিজ দর্শনে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। আবার, কাব্যিক ঐশ্বর্যে এই ভাষাই অজস্র অদৃশ্য চিত্রময়তাকে অনুভববেদ্য করে তোলে। 'বিচিত্র সেই রামধনু'তে যে ভাষা ছিল হার্দ্য-মরমি, সেই ভাষাই 'নিষাদ' গল্পে হয়ে ওঠে তীর্যক, তীক্ষ্ণ

ও শ্লেষগর্ভ। গল্পকারের ভাষাবয়নের এই দক্ষতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক সমালোচকের মুগ্ধ স্বীকারোক্তি—

> 'তাঁর (বিমল কর) ভাষার বৈশিষ্ট্যও তাঁকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। তাঁর ভাষা একদিকে যেমন মধুর, অন্যদিকে তেমনই অনিবার্য। তাঁর গল্পের বিষয় ও ভাষা নিপুণ চিত্রশিল্পীর চিন্তা ও রঙের মতন, সমানভাবে মিলে এক আশ্চর্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে।'[১৬]

শৈলীগত প্রেক্ষিতের বিচারে বিমল করের গদ্যভাষা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। চিরাচরিত ধারার বাইরে গিয়ে গল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় তিনি নিজস্ব গদ্যশৈলী সযত্নে নির্মাণ করেছিলেন। গল্পকার স্বয়ং স্বীয় গদ্যে সুবোধ ঘোষ এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম পর্বে এই প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে নতুন রীতির গল্পসৃজনে তাঁর গদ্যশৈলী নিজস্ব শৈল্পিকতায় বাঙালি পাঠক-পাঠিকাকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করেছে বারে বারে। অনুভূতির গভীরতা ও চিন্তার প্রাখর্যের সমন্বয়ে এই গদ্যভাষার আবেদন স্বতন্ত্র। সমালোচকের যথার্থ বিশ্লেষণ–

> '...বাস্তব ও অবাস্তবের বা অনুভবের মিশ্রণ বেশি আছে বিমল করের গদ্যে। নানা শব্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্য বিমল করের গদ্য-সুর বৈচিত্র্য অনেক ব্যাপক।'[১৭]

নতুন ধারার গল্প সৃষ্টির তাগিদে বিমল কর ভাষাশৈলীর পুনর্নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। তাই বাংলা বাক্যগঠনের আদর্শ ক্রমবিন্যাসকে তিনি শিল্পসম্মতভাবে প্রায়শই লঙ্ঘন করেছিলেন। বাংলা গদ্যের ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পদবন্ধ সংস্থানের ক্রম অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'র বিন্যাস তাঁর লেখনীতে বারে বারে ধ্বস্ত হয়েছে। বিভিন্ন গল্পের বিষয় ও ব্যঞ্জনা অনুযায়ী গদ্যভাষা নানা মাত্রায় বিন্যস্ত হয়েছে। তাই বিবিধ ধরনের আন্বয়িক বিচ্যুতি (syntactic deviation) বিমল করের গল্পে প্রতিভাত হয়েছে। বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ব্যাকরণসম্মত সাধারণ ক্রম বজায় রাখার পাশাপাশি শৈল্পিকতাসমৃদ্ধ নিয়মভঙ্গও গদ্যরীতিতে স্থান পেয়েছে। বাক্যের অধিগঠনে (surface structure) এই রকম নানা মাত্রিক বিচ্যুতি বিষয় ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কখনো নাটকীয়, আবার কখনো গতিময়তা পরিস্ফুটনে সাহায্য করেছে। বাক্যগঠনে বিচ্যুতিজনিত নানা বৈচিত্র্য গল্পকারের শৈল্পিক অভিপ্রায়কে

সিদ্ধ করেছে। চরিত্রের মানসিক অনুভূতির গুরুত্ব বোঝাতে যেমন বাক্যের শেষে কর্তৃপদকে আনা হয়েছে, তেমনি কর্ম ও ক্রিয়াপদের প্রায়শই স্থানচ্যুতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া, ক্রিয়াপদের পূর্বস্থাপনা, যৌগিক ক্রিয়াপদের দুরান্বয় কিংবা বিশেষ্য-বিশেষণের স্থান পরিবর্তন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে গল্পকার বাক্যে বিচ্যুতি ব্যবহার করেছেন। 'দুইবোন' গল্পে এই বিচ্যুতির নানা মাত্রা প্রকাশিত—

> 'শৈল সব শুনল। এই তো প্রথম নয়। কতবারই তো শুনেছে
> শৈল। শুনে শুনে সয়ে গেছে সব। মুখ গম্ভীর করে মেয়েদের
> শুধু একবার দেখে নিল শৈল। বড় করুণা হল আজ মার
> মেয়েদের জন্যে।'[১৮]

উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যে আদর্শ ক্রমে পদবিন্যাস লক্ষ করা গেলেও পরবর্তী বাক্যগুলিতে নানা মাত্রার বিচ্যুতি প্রতিফলিত। তৃতীয় ও পঞ্চম বাক্যে কর্তা বাক্যের সব শেষে স্থান পেয়েছে। গল্পকার এখানে মেয়েদের নিয়ে তাদের মা শৈল'র ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই কর্তৃপদকে শেষে বিন্যস্ত করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে ক্রিয়াপদ কর্মের পূর্বে রয়েছে। তবে, এসকল বিচ্যুতির মাধ্যমে মেয়েদের কেন্দ্র করে মায়ের মানসিক চিন্তাকে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়েছেন গল্পকার।

নতুন ধারার গল্পসৃষ্টির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় বিমল কর সমকালীন প্রচলিত ধারার পরিবর্তে স্বতন্ত্র ধারার শৈলী নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। বাক্যনির্মাণের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর শৈল্পিক নিষ্ঠা অবশ্যস্বীকার্য। হ্রস্ব বাক্য ও দীর্ঘ বাক্যের যৌথতায় বিভিন্ন গল্পের বয়ান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাংলা বাক্যের অধিগঠনে স্থিতিক্রিয়া, বিশেষত অস্ত্যর্থক ক্রিয়া বিলোপনের স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু অস্ত্যর্থক ক্রিয়া বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিমল কর একাধিক ক্রিয়াহীন বাক্য অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। ক্রিয়াহীন বাক্যের যথাযথ ব্যবহারে গদ্য দ্রুতিময়তায় হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। ক্রিয়াহীন বাক্যের সমান্তরালে কর্তাহীন বাক্যও গল্পের গদ্যে নানা মাত্রায় ব্যবহৃত। ক্রিয়াহীন বাক্য ও কর্তাহীন বাক্য একই সঙ্গে থাকলেও গদ্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়নি। গল্পের বয়ানে এই বিন্যাস লক্ষণীয়—

> 'বিশ্বকে দেখলাম। তারাকেও। কাছাকাছি, পাশাপাশি বসে
> আছে। ছাদজোড়া ঝাপসা জ্যোৎস্নার মধ্যে আমরা তিনজন।'[১৯]

এখানে একইসঙ্গে কর্তৃপদহীন বাক্য এবং ক্রিয়াপদহীন বাক্য বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রথম তিনটি বাক্যে যেমন কর্তা অনুপস্থিত, তেমনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বাক্য ক্রিয়াপদহীন। তবুও গদ্যস্থ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় নি। এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব।

কখনো একটিমাত্র শব্দ, কখনো বা দুই-তিনটি শব্দে বাক্য গড়ে উঠেছে। অতিকথনের পরিবর্তে সংহত বাকরীতিতেই কথন ব্যক্ত হয়েছে। ছোটো ছোটো বাক্য আখ্যানকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলে। হ্রস্ব বাক্যের এই বিন্যাস এক শীতার্ত রাত্রির বর্ণনায় অব্যর্থ হয়ে উঠেছে—

> 'পৌষ মাস। পূর্ণিমা। গাছপালা মাঠঘাটের যেন সাড়া নেই
> শীতে। হিমে সবকিছু ভেজা, কুয়াশাও ঘন।'[২০]

অনেকক্ষেত্রে, বিমল কর একাধিক বাক্যের সংবদ্ধ উপস্থাপনায় একটি বাক্য নির্মাণ করেছেন। সংক্ষিপ্ত-সংহত সরল বাক্যের আধারে গতিময় যৌগিক বাক্য গড়ে উঠেছে। সরল বাক্যকে পূর্ণযতিতে সমাপ্ত করে 'কমা', 'ড্যাশ', 'সেমিকোলন' ইত্যাদি নানা বিরামচিহ্নের ব্যবহারে গল্পকার যৌগিক বাক্য রচনা করেছেন। 'সুধাময়' গল্পে এই বাক্যিক বিন্যাস লক্ষণীয়—

> 'এ ভালবাসা; আমি ভাল বেসেছি হৈমন্তীকে–সুধাময় স্পষ্ট
> অনুভব করেছিল; সমগ্র চেতনায় এই বোধ ঝঙ্কার দিয়ে
> উঠল।'[২১]

একইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিমল কর নানা জটিল বাক্য গল্পের বয়ানে উপস্থাপন করেছেন। একাধিক সমাপিকা ক্রিয়াপদকে পরপর ব্যবহার করে তিনি দীর্ঘবাক্য গঠন করেছেন। আবার, সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযুক্তিতে জটিল বাক্য গঠিত হয়েছে। দীর্ঘ বাক্য বা বাক্যগঠনের জটিল বিন্যাসে অনেকক্ষেত্রে পাঠজনিত ক্লান্তির সম্ভাবনা থাকলেও বিমল করে'র শৈল্পিক লেখনী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠজ সংবেশনে মুগ্ধ করে। 'ইঁদুর' গল্পে এ প্রকার বাক্যিক গঠন ব্যবহৃত হয়েছে—

> 'আজ যেন আরো ভয় করছে মলিনার। আকাশই শুধু
> কালো নয়, বৃষ্টির জলই শুধু জল নয়, মলিনার মন রাতের
> প্রতিটি প্রহরে প্রহরে যত রাজ্যের কালি শুষে শুষে কালো
> হতে লাগল; আর চোখের জলে সেই কালো গলে গলে ওর
> সর্বাঙ্গে কালি মাখাল।'[২২]

দীর্ঘ ও জটিল বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিমল কর বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশে বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রতিনির্দেশক ইত্যাদি যোগ করেছেন। এছাড়া, সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেও অনেকক্ষেত্রে জটিল বাক্য গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ বাক্যের ক্ষেত্রে একাধিক বাক্যখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যখণ্ড এবং অধীন বাক্যখণ্ডের সহযোগে যেমন জটিল দীর্ঘবাক্য রূপলাভ করেছে, তেমনি বাক্য মধ্যে নিরপেক্ষ খন্ডবাক্য (Parenthetic Clause) ব্যবহারে বিমল কর জটিল বাক্যকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন। একাধিক গল্পে এই নিরপেক্ষ বাক্যখণ্ডের (Parenthetic Clause) ব্যবহার লক্ষণীয়—

> 'শোনো মহারাজ, আমি মনে করি, আমার এই জীবনে
> তোমাদের ঈশ্বর আর আমি পরস্পরের অচেনা যাত্রী হয়ে
> এক রেল কামরায় বসে আছি।'[২৩]

বিমল করের নানা গল্পে প্রশ্নবোধক বাক্যের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এসকল প্রশ্নসূচক বাক্যের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিশেষ কোনো মানসিক অবস্থা সংকেতিত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নসূচক বাক্যের সঙ্গে বিস্ময়সূচক বাক্যের ব্যবহারও তাঁর গল্পভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'গগনের অসুখ' গল্পে তারই প্রতিফলন—

> 'গগন বুঝতে পারল না, কেন হৃদয়ে এত কষ্ট থাকে, এত
> অভাব ? বেদনা কেন অধিক, সুখ কম ? পৃথিবীতে জলভাগ
> বেশির মতন পর্যাপ্ত দুঃখ এবং অপর্যাপ্ত সুখ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি
> করেছিলেন!'[২৪]

ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও বিমল করের গল্পে নানা বৈচিত্র্য দেখা গেছে। বিশেষত, অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে গল্পের বর্ণনা অংশে অনুপুঙ্খতা বজায় থেকেছে, তেমনি চরিত্রের মানসিক-শারীরিক বিবরণও দ্যোতিত হয়েছে। তবে অসমাপিকা ক্রিয়ার অতি ব্যবহারজনিত কৃত্রিমতা থেকে গল্পগুলি মুক্ত থেকেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে নবেন্দু'র মনোজগত পরিস্ফুটনে অসমাপিকা ক্রিয়া সহায়ক হয়ে উঠেছে —

> 'চোখের সামনে থেকে বই সরিয়ে খাঁ খাঁ মাঠের দিকে চেয়ে
> থাকল নবেন্দু।....এই দুপুরে মাঝে মাঝে পাতা খসে পড়ে,
> উড়ে উড়ে চলে যায়। দুপুরে মাঠটাকে বড় একঘেয়ে লাগে।

যেন এই মাঠের ঘরেও কোথাও কেউ তালা ঝুলিয়ে চলে গেছে।'[২৫]

ক্রিয়াপদের কালগত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গল্পকার সুচারুভাবে ব্যবহার করেছেন। একটি দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে যেমন বিভিন্ন কালের ক্রিয়াপদ সমন্বিত হয়েছে, কখনো পর পর কয়েকটি বাক্যে ভিন্ন কালগত রূপের ক্রিয়াপদের বিন্যাস দেখা গেছে। ফলে গল্পের মধ্যে পাঠগত কৃত্রিমতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে, এমনকি ভাষাশৈথিল্যের পরিবর্তে বৈচিত্র্যময়তা এসেছে। 'বিচিত্র সেই রামধনু' গল্পে শিবতোষের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের এই কালগত ভিন্নমাত্রিক বিন্যাস ফুটে উঠেছে—

'যে যাই বলুক, আমি নিজে যা দেখেছি তা মিথ্যে বলতে পারি না, ভাবতেও পারি না। কিছু একটা হয়েছিল, সেটা কী আমি জানি না, কিন্তু হয়েছিল।...আমি মশাই, আজ দু-বছর ধরে তারই জের টেনে যাচ্ছি; শরীরে মনে।'[২৬]

বিশেষণ পদ ব্যবহারে বিমল করে'র দক্ষতা অবশ্যস্বীকার্য। বিশেষণের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারে বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-প্রেক্ষিতের বর্ণনাও অনুপুঙ্খতা লাভ করেছে। বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াবিশেষণের যথাযথ প্রয়োগ বিভিন্ন গল্পে লক্ষ করা যায়। 'তুচ্ছ', 'অপেক্ষা', 'শীতের মাঠ' ইত্যাদি গল্পে বিশেষণের এক অসাধারণ ব্যবহার শৈল্পিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পের শেষের দিকে নানা বিশেষণের সাহায্যে প্রকৃতি ও ভুবনের সত্তাগত অভিন্নতাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার—

'চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চারপাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।'[২৭]

গল্পের প্রয়োজনে কখনো তৎসম, কখনো তদ্ভব শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনার তাগিদে একাধিক বিশেষণীয় পদগুচ্ছের সংবদ্ধ বিন্যাস নানা গল্পে উঠে এসেছে। অনেকক্ষেত্রে, বিচ্যুতির মাধ্যমে বিশেষ্য পদের পরে

বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া, স্বীয় শৈল্পিক প্রতিভায় ব্যঞ্জনাময় বিশেষণ সৃষ্টি করেছেন বিমল কর—

> 'রাজেশ্বরীর অঙ্গে তার যৌবন যে লীলা করছে–সুধাময় তার দুর্বল চোখ দিয়েও তো দেখতে পেয়েছিল। এবং সেই দুধমাখা জবাফুলের মতন রঙ, ননী-কোমল তনু, কৃশ কটি, অপরূপ বাহুবল্লরী ভাল লেগেছিল সুধাময়ের। মুগ্ধ হয়েছিল বেচারি যুবক দার্শনিক।'[২৮]
>
> 'অতসীর বুটি তোলা বাসন্তী রঙের ব্লাউজটা সখী সখী সাজের মতন বিরক্তিকর লাগছিল।'[২৯]

উল্লেখিত বাক্যদুটিতে 'দুধমাখা' এবং 'সখী সখী' বিশেষণ দুটি বিমল করের নিজস্ব সৃষ্টি। ব্যঞ্জনাময় এই মৌলিক বিশেষণগুলি বাক্যের অর্থগত বিস্তারকে আরো প্রসারিত করেছে। প্রথম বাক্যে 'যুবক' শব্দের পর 'দার্শনিক' বিশেষণের ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রের দার্শনিক মানসিকতাকে দ্যোতিত করে তোলে।

'তৎসম' শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহারও বিমল করের গল্পবিশ্বে লক্ষণীয়। তদ্ভব-দেশি-আটপৌরে শব্দের পাশে সুচারুভাবে তৎসম শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। সাদৃশ্যবাচক অলংকার বা চিত্রকল্পের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বের বর্ণনাতেও তৎসম শব্দের সাহায্য নিয়েছেন গল্পকার। প্রকৃতি চিত্রণের ক্ষেত্রে নানা গল্পে তৎসম শব্দের সংবদ্ধ ব্যবহার বারে বারে হয়েছে —

> 'অতি মনোহর জ্যোৎস্না। সমস্ত পথপ্রান্তর বৃক্ষলতা যেন রুপোর জলে টলমল করছে। মাথার ওপর পূর্ণচন্দ্র। রাস্তায় কুচি পাথরগুলি কিরণে চিকচিক করছিল। ঘাস মাটি এবং শস্যক্ষেত্রগুলি নিস্তব্ধ, যেন কোনো অলৌকিক মোহে অভিভূত হয়ে আছে।'[৩০]

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার বিমল করের গদ্যশৈলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র ধ্বনিগত অনুভূতি সৃষ্টিতে নয়, একইসঙ্গে অর্থগত গভীরতা প্রকাশেও এই দু'ধরনের শব্দ বাক্যে স্থান পেয়েছে। ভাবের বৈচিত্র্য আনয়নে গল্পকার শব্দদ্বৈতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাক্যে সংযোজন করেছে। আবার, ধ্বনিরোল সৃষ্টির পাশাপাশি

ক্রিয়া-বিশেষণ, নাম-বিশেষণ বা অনুভূতির সূক্ষ্মতা প্রকাশে বিমল কর প্রচুর ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'শীতের মাঠ', 'বকুলগন্ধ', 'অশ্বত্থ', 'আঙুরলতা'সহ প্রায় সব গল্পে শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের কুশলী প্রয়োগ রয়েছে। নিম্নোক্ত বাক্যগুলির বিন্যাসে তারই পরিচয় প্রতিফলিত —

> 'প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মতো
> শরীর আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা
> একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে–দেখলেই আঙুরের
> গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত।'[৩১]

> 'পা টিপে টিপে আসছে অঞ্জনা। হাওয়া বইছে ঝিরঝির।
> ঠাণ্ডা হাওয়া। শীত শীত করছে একটু। কাঁটা দিচ্ছে গা।
> গন্ধ, গন্ধ। কী মিষ্টি, কী সুন্দর। মন সির সির করে। গন্ধে
> গন্ধে সারা জায়গাটা ভরা; মাঠ ঘাস, বাতাস, গাছ, পাতা।'[৩২]

নির্দেশক-প্রতিনির্দেশকের (correlative) সূক্ষ্ম ব্যবহারে নানা গল্পের অর্থগত বিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিনির্দেশকে'র একটি শব্দের বিলোপন অনেক সময় বাক্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। একই রকম নির্দেশক সর্বনামের পুনরুক্তিতে গল্পকার বিশেষ কোনো অর্থকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার সংযোজকের নিপুণ প্রয়োগে দীর্ঘবাক্য সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ভাবনার নানা মাত্রাও তুলে ধরেছেন —

> 'ভালবাসাটি যখন দেহ ভিন্ন আর কিছু দেখে না–তখন সেটি
> কাঁচা ভালবাসা। যেমন সোনাটি। ওটি তুমি দেহে রাখো,
> দেখাবে ভাল। কনককে তাই বলছিলাম—সোনাটি রূপোটি
> দেহের বাইরে থাকে।'[৩৩]

আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে বিমল কর বিভিন্ন নতুন ধরনের শব্দবন্ধ সৃষ্টি করেছেন। 'মানবপুত্র' গল্পে 'দুধ-আলো', 'বরফসাহেবের মেয়ে' গল্পে 'কিশোর-বৃন্দাবন' ইত্যাদি শব্দবন্ধ পাঠক পাঠিকার ভাবনাকে আরো প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অনেক সময়, একই শব্দকে পরপর দুটি বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। ফলে, শব্দগুলি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। 'গগনের অসুখ', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে এইরকম প্রয়োগ দেখা গেছে —

'গগন চোখ বুজতে বুজতে নয়নদের কথা ভাবল। নয়নরা থাকলে, গগন পরম দুঃখীর মতন ভাবল, তার গগন এত শূন্য হত না।'[৩৪]

গল্পের মধ্যে বিষয়, চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী বিমল কর ভাষার ব্যবহার করেছেন। বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কয়লাখনি অঞ্চল বা রেলশহরের পটভূমিতে একাধিক গল্প রচিত হলেও তিনি আঞ্চলিক শব্দ বা ভাষা ব্যবহারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তবে 'পিয়ারীলাল বার্জ' গল্পের পিয়ারীলাল, 'মানবপুত্র' গল্পের গঙ্গামণির সংলাপের ভাষা চরিত্র-পরিবেশ অনুযায়ী অবশ্যই ভিন্নধর্মী হয়েছে। তেমনই 'আঙুরলতা' গল্পের আঙুরলতা আর 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' গল্পে যুধিষ্ঠিরের সংলাপে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা প্রতিফলনে বিভিন্ন গল্পে নানারকম ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। শব্দ ব্যবহারে কোনো শুচিবদ্ধ মনোভাবে গল্পকারের বিশ্বাস ছিল না। একই সঙ্গে বিবিধ প্রকার শব্দ তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। 'স্বপ্নের নবীন' গল্পে পরিমলে'র সংলাপে তারই প্রমাণ—

'নিজের ফেট্ নিজে ঠিক করার আগে তোকে নতুন অভ্যেস করে নিতে হবে, এই পুরোনো মানুষ ঠকানো পরস্মৈপদী অভ্যেস চলবে না। নতুন করে কিছু ভাবতে হবে: জমি দখল, ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজেশন, রাইফেল—এসব ঠুনকোতে চলবে না। হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাই: সিমপ্যাথী, রেসপেক্ট, কো-অপারেশন। খাঁটি মধু চাই শালা, ভেজাল মধু নয়।'[৩৫]

সমান্তরালতা (Parallelism) বিমল করের গদ্যশৈলীর এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত। বিবিধ শিল্পগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানাপ্রকার সমান্তরালতা'র ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছেন। সংগঠন বা প্রায় সমগঠনের আন্বয়িক নানাপ্রকার উপাদানের বারংবার ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থগত- ব্যঞ্জনাধর্মী সৌষম্য সৃষ্টিতে সমান্তরালতা'র শৈলী প্রয়োগ করা হয়। শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যিক বিন্যাস বা বাগভঙ্গির উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিত বিন্যাসের মাধ্যমে 'সমান্তরালতা' বিমল করের গল্পসমূহকে সর্বদাই ভিন্নমাত্রিক তাৎপর্যে উন্নীত করেছে। গদ্যে কোমলতা ও কাব্যিকতা আনয়নে গল্পকার একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সমান্তরাল ব্যবহার করেছেন। কখনো ছোট বাক্যের সমান্তরালতা, আবার

কখনো ক্রিয়াপদের সমান্তরালতা ব্যবহারে তিনি বাক্যগঠনে গতিময়তা, নাটকীয়তা ও বহুবৈচিত্র্য আনতে সফল হয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে, কোনো চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বা প্রেক্ষিত-প্রসঙ্গের গুরুত্ব বোঝাতেও সমান্তরালতা শৈলী গ্রহণ করা হয়েছে–

> 'আমি সুখের অভিলাষী, আমি ভোগের ভিক্ষুক, আমি বিলাসে ক্লান্ত হইনি, আমার দেহ এই অকালে শ্লথচর্ম, লোল হয়ে যাবে— না, না–এ আমি সহ্য করতে পারব না।'[৩৬]

> 'এ জগৎ বড় বিচিত্র, কত কী অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। কিন্তু আমরা জানি না, আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে অদ্ভুত বলতে যে ধারণা রয়েছে তার বাইরেও এমন অদ্ভুত ঘটনা আগে ঘটেছে পরেও ঘটবে যার কোনো উত্তর আমরা খুঁজে পাব না বোধ হয়। আমাদের ধারণায় যা অদ্ভুত তার বাইরেও অনেক অদ্ভুত হল এ-জগৎ।'[৩৭]

উপরোক্ত প্রথম বাক্যে 'যযাতি' গল্পের নীলকন্ঠের জীবনপিপাসার তীব্রতা বোঝাতে 'আমি' পদটির 'সমান্তরালতা' দেখা যায়। দ্বিতীয় বাক্যে জগতের বিচিত্র স্বরূপ বোঝাতে গল্পকার 'অদ্ভুত' শব্দটিকে সমান্তরাল মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। অনেকসময় আবেগের প্রাবল্যকে ভাষায়িত করতে গল্পের মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদের সমান্তরালতা পরিস্ফুট হয়েছে। 'আঙুরলতা' গল্পে এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে—

> 'জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতাকে যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল আঙুর।'[৩৮]

আবার 'নিষাদ' গল্পে বিমল কর একটা বাক্যকেই সমগ্র গল্পে বারে বারে ব্যবহার করে অর্থাৎ সমান্তরালতা'য় জলকু'র অনিবার্য মৃত্যুকে পাঠক-পাঠিকার ভাবনায় প্রমুখনে'র (foregrounding) মাধ্যমে উজিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিম্নোক্ত বাক্যটি গল্পের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ঘুরে ফিরে এসেছে—

> 'ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ...কিংবা কাল।'[৩৯]

'শীতের মাঠ' গল্পে 'ঠান্ডা' শব্দের সমান্তরাল ব্যবহারে যেমন শীতকালীন প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, একইসঙ্গে নবেন্দু'র মনোজগতের শৈত্যময় অনুভূতিকে প্রমুখিত (foregrounded) করা হয়েছে—

> 'নবেন্দু অনুভব করতে পারছিল, রোদের—সামান্য একটু
> শীতের রোদের জন্যে ওর মন ছটপট করছে। নিজেকে বড্ড
> ঠাণ্ডা লাগছে, চোখ ঠাণ্ডা, ঠোঁট ঠাণ্ডা, হাত ঠাণ্ডা।'[৪০]

গল্পের সংলাপ নির্মাণেও গল্পকার বিমল করের নিজস্বতা লক্ষণীয়। 'প্রত্যক্ষ-সংলাপ রীতি' এবং 'বিবৃতি-সংলাপ রীতি' উভয়ই তিনি গল্পের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যক্ষ-সংলাপ রীতিতে পাঠক-পাঠিকা প্রসঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ অনুধাবন করতে পারেন। বিবৃতি-সংলাপ রীতির ক্ষেত্রে বিমল কর সংলাপের আগে ও পরে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, আচরণ বা শারীরিক ভঙ্গিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর শৈল্পিক দক্ষতায় সংলাপের স্বরভঙ্গিতে চরিত্রের মেজাজ মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে। অনেক সময় সংলাপে সংশ্লিষ্ট মানসিকতা প্রকাশের পাশাপাশি চরিত্রের প্রতিক্রিয়াজনিত আচরণও বিবৃত হয়েছে; শৈলীগত তাৎপর্যে যা 'প্রায়ভাষা' বা 'paralanguage' নামে চিহ্নিত হয়। 'বাঘ' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপে তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতিবিম্বন ঘটেছে —

> '–তুমি কী বাঘ ছাড়া কিছু ভাব না ? শচী আচমকা বলল।
> — আর কী ভাবব ? অচিন্ত্য স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরাল।
> — জগতে আর ভাবনা নেই ? শচী চাপা গলায় বলল।
> — থাকবে না কেন! কত আছে–। আমি ভাবি না। অচিন্ত্য
> সরল গলায় বলল,—আমার কাছে একটা বাঘ অনেক—
> — কীর্তি ? শচী যেন এই প্রথম স্বামীকে উপহাস করতে
> চাইল।
> —কীর্তি ফির্তি জানি না। অচিন্ত্য বেপরোয়া গলায় বলল,
> —একটা মানে হয়। লোকে তবু বলবে। নয়ত কিসের এই
> বনজঙ্গলে পড়ে থাকা।'[৪১]

গদ্যভাষায় বিরাম চিহ্নের বিচিত্র ব্যবহারে বিমল করের সচেতনতা সকলের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। 'কমা', 'সেমিকোলন' বা 'হাইফেন' চিহ্নের সাহায্যে কেবল নানা বাক্যের সংযোজনই ঘটে নি, অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রের মনোভাব বা পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়ে উঠেছে। বাচনের প্রবহমানতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও 'কমা', 'সেমিকোলন' এর ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময় চরিত্রের অনুভূতির প্রবহমানতা প্রকাশে বিরাম চিহ্নও সহায়ক হয়ে উঠেছে—

> 'হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে
> সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম; কে জানত—তার দেহের সঙ্গে
> এত গভীরভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে।'[৪২]

'এলিপ্‌সিস' বা ত্রিবিন্দু চিহ্ন ব্যবহারের শৈল্পিক নৈপুণ্য বিমল করের গল্পসমূহে প্রতিফলিত। এই চিহ্নের সাহায্যে গল্পকারের শিল্পগত নানা অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। মুক্তানুষঙ্গ রীতি বোঝাতে, সংলাপের প্রসঙ্গ বদলে কিংবা চরিত্রের মানসিক অবস্থা পরিস্ফুটনে এই ত্রিবিন্দু চিহ্নের প্রয়োগ ঘটেছে। অনেক সময় ত্রিবিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করে গল্পকার পাঠক-পাঠিকাকে স্বাধীন পাঠজাত অনুভূতির দিকে প্রাণিত করেছেন। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের মানসিক বিপন্নতাকে তুলে ধরতে ত্রিবিন্দু চিহ্নের শিল্পঋদ্ধ ব্যবহার লক্ষণীয়—

> 'আমি পারছি না...ভালবাসতে পারছি না।...তুমি বুঝতে
> পারবে কি মা, আমি কত নিঃসঙ্গ আর একা-একা রয়েছি।
> আমায় এখন একা একাই থাকতে হবে।...'[৪৩]

বাক্যের অধিগঠন বা মূর্ত রূপে (Surface Structure) ত্রিবিন্দু চিহ্ন তথা নানাপ্রকার বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যের অধোগঠন বা মগ্ন রূপের (Deep Structure) ভাবনাসমূহকে সংকেতিত করে তুলেছেন গল্পকার। তাঁর গল্পের শৈলীতে নানাপ্রকার বিরাম চিহ্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

'নতুন রীতি'র ছোটগল্প যখন কাব্যিকতায় আত্মস্থ হয়ে উঠেছিল, তখন গল্পে চিত্রকল্পের গুরুত্ব ক্রমশই বেড়ে যায়। বিমল করের গল্পভুবনের অন্যতম ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে অজস্র চিত্রকল্প। গল্পকার চিত্রকল্পের প্রসারী ব্যঞ্জনায় গল্পকে কাব্যময়তায় জারিত করেছেন। প্রকৃতির রূপজগতের বর্ণনা বা মানবজীবনে প্রকৃতির অমোঘ ভূমিকা বর্ণনার

ক্ষেত্রে তিনি নানা চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন। 'অশ্বত্থ', 'পলাশ', 'সুধাময়', 'কাঁটালতা' ইত্যাদি গল্পে নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ ধরা পড়েছে নানা চিত্রকল্পে। 'হেমন্তের সাপ' গল্পে প্রকৃতির ইন্দ্রিয়সংসক্ত রূপ ধরা পড়েছে নিম্নোক্ত চিত্রকল্পে —

> 'আমার দিকের জানলার কাচটা আমি ধীরে ধীরে তুলে দিচ্ছিলাম। দিতে দিতে দেখছিলাম, জ্যোৎস্নার সব আলো কুয়াশার গায়ে মাখামাখি হয়ে আছে। যেন নরম নিঃশব্দ বৃষ্টির মতন কুয়াশা সমস্ত কিছুকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের পর মাঠ ফাঁকা, নিঃসাড়। সেই অদ্ভুত গন্ধ মাঠের গাছপালার, কুয়াশার।'[৪৪]

আবার চিত্রকল্পের মাধ্যমেই বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন গল্পকার। 'ইঁদুর' গল্পে মলিনার সংকীর্ণ মানসিকতা কিংবা 'যযাতি' গল্পে নীলকণ্ঠের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশে বিমল কর আলো-অন্ধকারের দ্বৈত চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন। 'আত্মজা' গল্পে স্ত্রী যূথিকার নির্মম অভিযোগে হিমাংশুর পিতৃসত্তার যন্ত্রণাদগ্ধ রূপের পরিচয় পাই আরেকটি চিত্রকল্পে —

> '...এই অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কিছু কি আছে ? বাতাস, আলো ? কিছু না। শুধু সাপের কুন্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর প্রতি পলকে শত সহস্র বিষাক্ত দংশন। যার বিষে এখনো সে অসাড়, যার ক্রিয়ায় এখনো সে অচেতন এবং যে দংশনে তার স্নায়ু মৃত।'[৪৫]

সাপের এই চিত্রকল্প 'হেমন্তের সাপ', 'কাচঘর' ইত্যাদি গল্পেও দেখা যায়। 'কাচঘর' গল্পে সম্পর্কের ভাঙনে বিধ্বস্ত হিরণকে ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রকৃতি যেন সাপের মতো ঘিরে ধরেছে—

> '...হিরণ সভয়ে দেখলে সেই লম্বা লম্বা স্কাই লাইটের ঝুলন্ত দড়িগুলো সাপের ফণার মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, দুলছে, জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে গায়ে। শূন্য ঘরে দড়ির ফণা অদ্ভুত এক হিংস্র আকর্ষণে ডাকছে যেন।'[৪৬]

স্বপ্নদৃশ্য নির্মাণেও চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। 'জলজ' এবং 'স্বপ্নের নবীন' গল্পে অবচেতন মনের স্বপ্নগুলি চিত্রময়তায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'মানসাঙ্ক' গল্পে স্বপ্নের জগতে চন্দনের আত্মআবিষ্কারকে অসামান্য চিত্রকল্পে বিন্যস্ত করেছেন গল্পকার—

> 'এবার নতুন করে চন্দন নিজেকে দেখল। দেখল, তার মাথা আকাশছোঁয়া; কপাল গড়িয়ে চাঁদের আলোর মুকুট। মাথাটা মৃদু মৃদু দুলছে। আশ পাশে তাকাল চন্দন; দেখল, তার অসংখ্য হাত। এক হাত বাড়িয়ে দূরের কুলগাছটাকে ছোঁয়া যায়, আর এক হাত বাড়ালে চন্দনের শোবার ঘর; অন্য হাত দিয়ে বাতাসের সঙ্গে খেলা করা যায়।'[৪৭]

প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ অনুযায়ী শব্দ-দৃশ্য-স্পর্শময় চিত্রকল্পের সৃষ্টিতে বিমল কর অনন্য। তাঁর সৃষ্ট প্রায় সব চিত্রকল্পই কাব্যিক ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ। এরকমই এক কাব্যিক চিত্রকল্পের উদাহরণ—

> 'আলো যেন আরও একটু গাঢ় হয়েছে। এই আলোর রং বদলেছে। চন্দন কাঠের মতো রং। সেই রং এই ঘরের মধ্যে মিহি কুয়াশার মতন ভরে উঠেছে। জানলার তলায় ছায়ার ফুলদানি। দেওয়ালের গায়ে রেশম যেন ঝুলছে, হাতির দাঁতের রং সেই রেশমের।'[৪৮]

বিমল করের ছোটগল্পে প্রতীকময়তা এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য রূপে উপস্থিত হয়েছে। একাধিক গল্পে অজস্র প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো বা সম্পূর্ণ গল্পটাই প্রতীকী হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন 'জননী' গল্পে নির্দিষ্ট কোনো প্রতীক নেই। কিন্তু আদিবাসী ঘরে মৃত পুত্রের ঘোড়ায় চড়া'র ছবির মাধ্যমে মৃত্যুর পর এক অনন্ত যাত্রার প্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই ছবির অনুসরণে পাঁচ সন্তান তাদের মা'র মৃত্যুর পর এক অনন্ত যাত্রার পথিক হওয়ার কথা বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে মৃত্যুর পর এক অন্তহীন যাত্রার কথাই যেন পুরো গল্পে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে সন্তানদের কামনার মধ্যে যেন তারই প্রতিফলন —

> 'শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মার সৎকার যেন এইমাত্র সমাধা হল।

সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা
করেছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই
অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।'[৪৯]

'অপেক্ষা' গল্পে মৃত্যুর নিশ্চিত আহ্বান একটি 'চিঠি'র প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার 'উদ্বেগ' গল্পে মৃত্যুর প্রতীক হয়ে এসেছে মড়কের সিঁদকাঠি। প্রথম গল্পে আমাদের ব্যক্তিসত্তার অন্তঃস্থিত মৃত্যুচেতনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় গল্পে আমাদের সামাজিক সত্তা যে ক্রমশ নিস্পৃহতার ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাকেই যেন নির্দেশ করছে। আবার 'জোনাকি' গল্পে তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ না হয়েও জোনাকি যেন মানবজীবনে চাওয়া-পাওয়ার অবিরাম দ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'শীতের মাঠ' গল্পে ব্যাধিক্লান্ত নবেন্দু আশা-আনন্দ-সাহচর্য সবকিছু হারিয়ে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার এই মানসিক নিঃসঙ্গতার প্রতীকী রূপেই পাশে পাশে উপস্থিত থাকে শীতের রুক্ষ-নীরস মাঠ। এছাড়া 'নিষাদ', 'সোপান' ইত্যাদি গল্পেও শৈল্পিকভাবে প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমদিকে 'ইঁদুর' গল্পে বিমল কর অসামান্য দক্ষতায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত করেন। এই গল্পে সম্পর্কের টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবচেতন মনের রহস্যও ধরা পড়েছে। বাসুদেবের মনের অন্ধকার দিক অন্বেষণ করতে গিয়ে মলিনা নিজের অজান্তেই আপন মনের আলো-আঁধারি জগতকে উপলব্ধি করে। ইঁদুরকলের মাধ্যমে আবর্জনার প্রতীক ইঁদুর ধরে পরিষ্কার করতে করতে মলিনা নিজের মনের অন্তঃস্থিত অন্ধকারকে আবিষ্কার করে ফেলে। গল্পের শেষে ইঁদুরের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তারই প্রতিফলন—

'স্বামীর কথার জবাব দেয় না মলিনা। মনে মনে ভাবে: ওঁর
ইঁদুর তো বাইরে নেই–ঘরেই রয়েছে। কুর কুর করে কাটছে
দিনরাত–কত যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা-জোখা আছে–
না থাকবে কোনও দিন।'[৫০]

বিমল করের নানা গল্পে অন্ধত্বের প্রসঙ্গ প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অঙ্গগত অন্ধতা'র প্রতীকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির স্বরূপ উন্মোচনই এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য। একটি সাক্ষাৎকারে গল্পকার স্বয়ং বলেছিলেন—

'অন্ধত্ব এখানে প্রতীক অর্থে ধরতে হবে। মানে চর্মচক্ষের
গভীরে, আড়ালে এক গভীরতর দৃষ্টি থাকতে পারে। বলা
যেতে পারে ইনার ভিশন্।'[৫১]

'শীতের মাঠ' গল্পে নবেন্দু জীবনের প্রতি তীব্র অনাসক্তিতে মাঠের মতো অন্ধ হতে চেয়েছে। আবার, 'জননী' গল্পে শারীরিকভাবে অন্ধ মেজছেলে নিজের মায়ের দৃষ্টিগত অন্ধত্বকে মুছে দিতে চেয়েছে। তাই মৃত মাকে সে মর্মগত দৃষ্টিতে পূর্ণ করতে চেয়েছে। তার উক্তি লক্ষণীয় —

'...মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত
অন্ধ আমি জানতাম। ...এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে
ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'[৫২]

শেষ দিকে বিমল কর জীবনের দার্শনিকবোধকে প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি প্রতীকধর্মী গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। 'উপাখ্যানমালা' গল্প সংকলনের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য—

'অনেককাল ধরেই আমার ইচ্ছে ছিল, কয়েকটি
অ্যালিগরিক্যাল বা প্রতীকধর্মী গল্প লিখব। ইচ্ছে থাকলেও
লেখা হয়ে উঠত না। আজ, জীবনের শেষ বেলায় এসে
গল্পগুলি যে লিখতে পারলাম–তাতেই আমি খুশী।'[৫৩]

'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'তে মহারাজ ও নন্দকিশোরের কথোপকথনের মধ্যে গল্পকার জীবন-মৃত্যুর অন্তহীন কথালাপকে প্রতীকায়িত করেছেন। 'সত্যদাস' গল্পে সত্যদাসের ফেলে যাওয়া দুটি আংটির দুটি পাথর দিন-রাতের প্রতীক। আর ছয়টি মোহর প্রকৃতপক্ষে ছয়টি ঋতুকেই চিহ্নিত করেছে। আবার 'যুধিষ্ঠিরের আয়না'তে আরশি বা আয়নার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর্জগতকে প্রত্যক্ষ করার কথাই বলা হয়েছে। বিশ্বজগতের দর্পণে সত্যনিষ্ঠ মনে অন্তদর্শনের মাধ্যমে মানুষের আত্মোপলব্ধির ভাবনাই পরিস্ফুট হয়েছে আলোচ্য গল্পে। মূল চরিত্র যুধিষ্ঠিরের ভাষ্যে তারই অনুরণন—

'...এই সংসারে একটি আরশি আছে। নিজের মুখটি সেই
আরশিতেই দেখতে হয় মাঝে মাঝে। দেখলে বোঝা যায়,
কার মুখটি কেমন! ওটি তো আপনার অন্তরে আছে!
নাই, বলুন!'[৫৪]

প্রতীকের সমান্তরালে রূপকধর্মিতা বিমল করে'র গল্পকে আরো নান্দনিক করে তুলেছে। রূপকের আড়ালে বহমান জীবনের গভীরতর সত্য অনুভূতি নানা মাত্রায় গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'নীরজা' গল্পে সোনামাসি সৌমতীর কাহিনি'র অন্তরালে মানবজীবনে প্রেমের একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার স্বরূপ কথককে বোঝাতে চেয়েছেন। 'সোপান' গল্পে মিনারের শীর্ষে ওঠার রূপকে জীবনের পথে এগিয়ে চলার সাফল্য-ব্যর্থতাকে বিম্বিত করা হয়েছে। এছাড়া 'হরিশের বিষাদ', 'নরকে গতি' গল্পেও রূপকধর্মিতার প্রভাব রয়েছে। আবার 'রামচরিত' গল্পে পৌরাণিক কাহিনিকেই রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দশরথের মতোই পরিতোষের বাবা জীবনে কামনা-ভোগবিলাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে যন্ত্রণা পেয়েছিল। দশরথের দুর্বলতাতেই যেমন রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল, তেমনি নিজের বাবার ত্রুটিতে পরিতোষ যেন যন্ত্রণার বনবাসে পদার্পণ করতে বাধ্য হয়। গল্পের উপসংহারেই এই রূপক পরিস্ফুট হয়েছে—

> 'জ্বরের ঘোরে এবং যাতনায় পরিতোষ অনুভব করল, সে
> বনবাসী রামের মতন পিতাকে শোক ও মৃত্যুর হাতে সমর্পণ
> করে বনপথে যাত্রা করেছে। একা। তার বনবাস দীর্ঘ।'[৫৫]

'উপাখ্যানমালা'র গল্পগুলির সবগুলিই রূপকধর্মী। 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে মৃত্যু-রূপী মহারাজের সঙ্গে নন্দকিশোরের আলাপচারিতায় বিশ্বজগতে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়েই মানবজীবনের বেঁচে থাকার গভীর দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর অনিবার্যতাকে স্বীকার করেই খণ্ডকালের জীবনে মানুষকে তৃপ্ত হতে হয়। 'সত্যদাস' গল্পে যেমন প্রকৃতিকে রূপক হিসেবে আনা হয়েছে তেমনি 'যুধিষ্ঠিরের আয়না' গল্পে মিথকেই রূপক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাম ও কামিনী' গল্পে কাম-কামিনীর মেলা মানবজীবনের রঙ্গমঞ্চকেই দ্যোতিত করেছে। পাহাড়ের চারটি পথের মাধ্যমে নারী-পুরুষের নিজস্ব কামনা, ভিক্ষা ও প্রার্থনার ভিন্ন পথগুলিকে বোঝানো হয়েছে। এই চারটি পথ মিলেমিশে জীবনের সত্যপথে অগ্রসর হওয়ার কথাই গল্পে বিম্বিত হয়েছে। 'ফুটেছে কুসুমকলি' গল্পে 'ভালবাসার তিনটি ঘর' এর রূপকে গল্পকার প্রেমের সারসত্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। দেহ আর রূপে আবদ্ধ ভালোবাসা অপূর্ণ। ভালোবাসা যখন দেহ-রূপ'কে অতিক্রম করে হৃদয়-মনকে স্পর্শ করে, তখনই মানুষ ভালোবাসার পূর্ণতা উপলব্ধি করে। নীলমণিকে রূপকের বিশ্লেষণে ইন্দ্র যথার্থই বলেছে—

'...দেহ আর রূপ যদি ভালবাসার প্রথম ঘরটি হয় তবে তার
অন্য দুটি ঘর হল–মন আর হৃদয়। প্রথমটি দৃশ্য। অন্য দুটি
দেখা যায় না। সেখানেই তো তোমার প্রাণটিকে পাবে।'[৫৬]

জীবনের সারসত্যের স্বরূপ গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে বিমল কর নানা মাত্রায় মিথ বা পৌরাণিক কাহিনিকে নান্দনিকভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য 'মিথ' (myth) ও 'পুরাণ' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় 'পুরাণ' ধর্মীয় অনুষঙ্গে বিন্যস্ত; অন্যদিকে ধর্মীয় আবেগকে বর্জন করেই মিথ গড়ে ওঠে। মিথ হল আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রার অনুষঙ্গে জায়মান চূড়ান্ত বাস্তব কাহিনি। মিথ বা পুরাণের ব্যাখ্যায় প্রাথমিকভাবে ফ্রয়েডের ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের ভাবনাকে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীকালে ইয়ুং'এর যৌথ নির্জ্ঞানের (Collective Unconciousness) ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিমল করে'র গল্পে পৌরাণিক কাহিনিরই বিচিত্র বিন্যাস লক্ষণীয়। মিথ বা পুরাণ কাহিনি ব্যবহার করে তিনি দেশ-কালের সীমানা অতিক্রমণে মানবজীবনের শাশ্বত রূপ'কে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। পুরাকথা ও মিথের নান্দনিক স্পর্শে তাঁর গল্পবিশ্ব জীবনবোধে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মহাভারত সম্পর্কীয় পৌরাণিক কাহিনির অনুষঙ্গ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন বিমল কর। 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' গল্পে মৃত্যুরূপী মহারাজ ও নন্দকিশোরের কথালাপকে গল্পকার মহাভারতের বিখ্যাত যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদের আদলেই গড়ে তোলেন। মৃত্যুর প্রতীক মহারাজই হয়ে ওঠেন মহাভারতের ধর্মরাজ। এই পৌরাণিক কাহিনির অনুষঙ্গেই মানবজীবনের মৃত্যুর একান্ত অনিবার্যতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে জীবনের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মহারাজের মুখে উচ্চারিত হয়েছে চিরকালীন শাশ্বতবাণী—

'স্বপ্ন দেখা তার স্বভাবধর্ম। আশা তাকে বাঁচিয়ে রাখে।
আশা, ভালোবাসা, প্রত্যাশা। গাছ বাঁচে তার শেকড়ের রসে।
জীবন বাঁচে স্বপ্নে আর আশায়।'[৫৭]

'সোপান' গল্পে 'নভস্তি' বা 'মিনার'কে কেন্দ্র করে প্রচলিত গল্পে মহাভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। রামভক্ত ধার্মিক রাজা মহাদেও পর্বতমালা অতিক্রম যুধিষ্ঠিরের মতন স্বর্গে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিল। পাণ্ডবদের এই মহাপ্রস্থান যাত্রা পরবর্তীকালে

মিনারে আরোহণকারী মানুষগুলির জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে যেন মিলে মিশে যায়। প্রবল আত্ম অহংকার, স্বার্থময়তার জন্য দ্রৌপদী ও চার পাণ্ডবের লক্ষ্যস্থলের পূর্বেই পতন ঘটে। তেমনি, মিনারের শীর্ষে পৌঁছানোর আগেই হেম-পুষ্পরেণু নিজস্ব নানাবিধ প্রবৃত্তির প্রভাবে নানা সিঁড়িতে আটকে যায়। অন্ত এগোতে পারলেও চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে শেষমুহূর্তে রুখে দেয়। পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে দিয়ে এই গল্প মানবজীবনের চিরন্তন পাঠে আমাদের দীক্ষিত করে।

'যযাতি' গল্পের নামকরণের মাধ্যমেই মহাভারতীয় কাহিনিসূত্রের প্রভাব নজরে আসে। বৃদ্ধ রাজা যযাতির মতোই নীলকন্ঠ আজীবন ভোগতৃষ্ণায় তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে। প্রবল আত্মরতি বোধে পালালেখক নীলকন্ঠ প্রবলভাবে বাঁচতে আগ্রহী। এমনকী পুত্রের প্রার্থিত নারী অষ্টাদশী কুসুমও তার কামতাড়িত দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়। পিতার এই প্রবল তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে রাজা পুরুর মতোই ললিত নিজের ভালোবাসার মানুষকে অর্পণ করতে চায়। পুরাকালের রাজা যযাতি-পুরু বিশ শতকের নীলকন্ঠ-ললিতের জীবনের চর্যায় যেন এক হয়ে মিলে যায়—

> 'নীলকন্ঠ নয়, রাজা যযাতি যেন পুত্র পুরুর কাছে করজোড়ে
> ভিক্ষুকের মতন অশ্রুসজল কন্ঠে ভীষণ একটা আবেদন
> জানিয়ে কাতর প্রত্যাশী চোখে চেয়ে থাকল।'[৫৮]

'অপহরণ' গল্পে রামায়ণের রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ কাহিনির অন্তর্বয়নে উঠে এসেছে। চিত্রকর উমাপ্রসাদ স্বসৃষ্ট চিত্রে রাবণ চরিত্রের মাধ্যমে সংসারের কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসায় আসক্ত মানুষদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। আবার, জটায়ুর মরণপণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনসৌন্দর্য রক্ষায় ক্লান্তহীন প্রতিবাদী মানুষের প্রতি যেন বিশ্বাস রাখতে চেয়েছেন। রামায়ণ-কেন্দ্রিক কাহিনির ব্যবহারে গল্পটি ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

বিমল করের কয়েকটি গল্পে খ্রিস্টিয় অনুষঙ্গের সার্থক বিন্যাস দেখা যায়। 'মানবপুত্র' গল্পে সমাজের হিংস্র-স্বার্থমগ্ন-অন্ধকারময় রূপকে তুলে ধরতে খ্রিস্টিয় কাহিনি 'বেলসেবুবে'র (Beel zebub) সাত অনুচর অর্থাৎ সাত শয়তানের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ এসেছে। এই গল্পে গঙ্গামণির উপর অত্যাচার, লাঞ্ছনায় কেষ্ট পৃথিবীতে মনুষ্যপুত্র হিসেবে যীশু'র আগমনের অপেক্ষা করছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে কমলেন্দু তার প্রেমিকা শিবানীকে যীশু'র সঙ্গে তুলনা করেছিল। যীশুর মতো ক্রুশবিদ্ধ না হলেও শিবানী তার

তিন প্রেমিকের দেওয়া সকল কষ্টকে বহন করে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যু করেছিল। যীশুর যন্ত্রণা ধারণ ক্ষমতার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে শিবানী চরিত্রটিকে গল্পকার স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করেন।

এছাড়াও 'জননী' গল্পে রাঁচি এলাকার মুন্ডা পরিবারে মৃত পুত্রের ঘোড়সওয়ার হয়ে অনন্ত পথ অতিক্রমণের মিথ ব্যবহৃত হয়েছে। এই লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে মৃত্যুর পরে মানুষের পরবর্তী যাত্রার প্রতি দার্শনিক ইঙ্গিত রয়েছে। বিমল কর তাঁর বিভিন্ন গল্পে পুরাণকাহিনি ও মিথের সাহায্যে জীবনের বহুস্বরিক বিন্যাসের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের সমৃদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন।

প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্প-মিথের নানাবিধ শৈল্পিক বয়নে উজ্জ্বল বিমল করের ছোটগল্প কাব্যিকতাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে উপন্যাসের জগতকেও স্পর্শ করতে উদগ্রীব হয়েছে। নতুন রীতির ছোটগল্পের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় গল্পকারের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য—

> 'নাটক এবং কবিতার পর গল্প এখন আরেক রাজ্যের দিকে
> হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। সে-রাজ্য উপন্যাসের রাজ্য।'[৫৯]

আয়তনের মাপকাঠিতে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি 'ছোট' শব্দটিকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্ববাদী হতে চান নি। বরং প্রায় সমসাময়িক কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো বিশ্বাস করতেন—গল্প তৈরি হতে যত সময় বা আয়তন প্রয়োজন ততটাই তার প্রাপ্য হবে। তাই বিমল করের 'অপেক্ষা', 'আয়োজন', 'বিচিত্র সেই রামধনু', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা', 'অনাবৃত', 'স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ' ইত্যাদি গল্প প্রকৃতি-আকৃতিতে উপন্যাসের নান্দনিকতা বহন করেছে।

গল্পের পরিণতিতে পাঠককে সুলভে তৃপ্তি দেওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল বারে বারে এড়িয়ে গেছেন গল্পকার। প্রথম দিকে সুবোধ ঘোষের অনুসরণে গল্পের সমাপ্তিতে চমক দেবার প্রয়াস দেখা যায়। 'মানবপুত্র', 'আঙুরলতা' ইত্যাদি গল্পে এই চমকপ্রদ উপসংহার রয়েছে। পরবর্তীকালে নাটকীয়তা ক্রমশ বর্জন করায় তাঁর গল্পে নিশ্চিত নাটকীয় পরিণতি তেমন দেখা যায় না। বিমল কর বাহ্যিক চমকে আমাদের পাঠজাত অভিজ্ঞতাকে তৃপ্ত করতে চান নি, বরং সৃজনশীল ভাবনায় নিমগ্ন হতে আহ্বান করেছেন। তাঁর ছোটগল্প পাঠককে নিছকই 'গল্প' পাঠের আনন্দ দেয় না, একইসঙ্গে দার্শনিকবোধে

প্রাণিত করে। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচকের দীপ্ত বিশ্লেষণ —

> 'নতুন রীতির প্রতি উৎসাহী বিমল কর নিছক গল্পের মধ্যে গল্প লিখতে চাইছিলেন না পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। সেইজন্যেই আইডিয়ার দিকে ঝোঁক, পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিকে ঝোঁক, সন্ধান ও জিজ্ঞাসার দিকে ঝোঁক, সংলাপের গভীরতা ও মিতব্যয়িতার দিকে ঝোঁক, চিন্তা এবং সংলাপকে একাকার করার দিকে ঝোঁক, গল্পের তথাকথিত ধড়াচুড়ো ছাড়তে ছাড়তে সহজ ও গভীর হতে চেয়েছিলেন তিনি।'[৬০]

'গল্পতন্ত্র'কে অস্বীকার করে ছোটগল্পের প্রাকরণিক কৌশল নিয়ে বিমল করের নিজস্ব ভাবনা ও প্রয়োগ বাংলা গল্পধারায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তাঁর 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'কে কেন্দ্র করে বাংলা গল্পজগতে নানা বিন্যাসের সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিককে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন তা বিশ শতকের ছয়ের দশকে 'গল্পহীন গল্প' রচনার প্রাথমিক প্রেরণা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে বিমলবাবু সম্পূর্ণ 'গল্প' বর্জিত ছোটগল্প রচনা করেন নি, তবে ছোটগল্পে ঘটনাবহুল নাটকীয় 'গল্প' বলার প্রাধান্যকে মানতে পারেন নি। উত্তরসূরি গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর অবস্থান যথার্থভাবে চিহ্নিত হয়েছে—

> 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা থেকে সরে এসেছিলেন কল্লোলের লেখকরা। নিয়মভাঙ্গার খেলায় মেতে তাঁরা অনবদ্য কিছু ছোটগল্প দিয়ে গেছেন আমাদের।...নতুন রীতির ছোটগল্প জন্ম নিয়েছিল বিমল করের হাতে। আর সেই স্রোতে যোগ দিয়েছিলেন পঞ্চাশের তরুণরা। ছোটগল্পের অন্তর্মুখী মেজাজ ও বিশদ বুননই শুধু নয় মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা বিষয় হয়ে উঠল।...কিন্তু নতুন রীতি করতে গিয়ে বিমলদা কখনও হাংরি জেনারেশন বা শাস্ত্রবিরোধীদের মতো আন্দোলনের পতাকা তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না।'[৬১]

নানা মাত্রার অন্তর্বয়নে তাঁর গল্পের বয়ান অনেক ক্ষেত্রে বহুস্বরিক হয়ে উঠেছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে নতুন প্রকরণে ঋদ্ধ করে ছোটগল্পের মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করাই ছিল মূল লক্ষ্য। ইঙ্গিতময় উপস্থাপনায় তিনি নিজের গল্পগুলিকে করে তুলেছিলেন অনেকার্থদ্যোতক। শৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তাঁর গল্প যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত হয় নি। বরং আরো প্রসাদগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। সচেতন নির্মাতা হলেও তিনি একইসঙ্গে হয়ে উঠেছিলেন নিমগ্ন স্রষ্টা। বিশ শতকে পাঁচের দশকের শেষ লগ্নে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিমল করে'র সৃষ্ট নতুন প্রকরণ শৈলীর ঐতিহাসিক ভূমিকা আজও সর্বজননন্দিত।

তথ্যসূত্র :

১. 'ছোটগল্প : 'নূতন রীতি': বিমল কর; বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক: সন্দীপ দত্ত; র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন; ১৯৯৩; পৃ. ৩০

২. তদেব; পৃ. ৩১

৩. তদেব; পৃ. ৩১

৪. তদেব; পৃ. ৩২

৫. 'উড়োখই'(২) : বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; জুলাই, ১৯৯৭: পৃ. ৯১

৬. 'সারস্বত': বুদ্ধদেব গুহ; সাহিত্যম; বৈশাখ, ১৪১১; পৃ. ৭৮

৭. 'শীতের মাঠ' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০০৫; পৃ. ১৯৬-১৯৭

৮. 'সেই ঘর, এই বাসা': বিমল কর; ছত্রিশ রাগিণী: মজলিসী গল্পের সংকলন; সম্পা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়; বিকাশ গ্রন্থ ভবন; ২০০২, পৃ. ১৯

৯. 'অপেক্ষা' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ; জুলাই, ২০০৫; তদেব; পৃ. ৩২৭

১০. 'বন্ধুর জন্য ভূমিকা'; তদেব; পৃ. ৩৭৫

১১. 'সহচরী'; তদেব; পৃ. ৪৮৭

১২. 'সোপান'; তদেব; পৃ. ৩৫৪

১৩. 'জননী'; তদেব; পৃ. ৩১০

১৪. 'সুধাময়'; তদেব; পৃ. ২৬৬-২৬৭

১৫. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা; ড. সুব্রত ঘোষ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০০৬; পৃ. ২০৩

১৬. ভূমিকা : সাগরময় ঘোষ; শ্রেষ্ঠ গল্প : বিমল কর; প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

১৭. 'বিমল কর' : উজ্জ্বল কুমার মজুমদার; 'দেশ'; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩; পৃ. ৪২

১৮. 'দুই বোন' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৯৪

১৯. 'নেশা' : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; দীপ প্রকাশন; কলকাতা বইমেলা, ২০০৬; পৃ. ৩১

২০. 'যুধিষ্ঠিরের আয়না': বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১০৯

২১. 'সুধাময়': বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৬৭

২২. 'ইঁদুর'; তদেব; পৃ. ২৬

২৩. 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা'; তদেব; পৃ. ৭২৫

২৪. 'গগনের অসুখ'; তদেব; পৃ. ২৯৯

২৫. 'শীতের মাঠ'; তদেব; পৃ. ১৯৩

২৬. 'বিচিত্র সেই রামধনু'; তদেব, পৃ. ৬৭৯

২৭. 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন'; তদেব; পৃ. ৩৮৯

২৮. 'সুধাময়'; তদেব, পৃ. ২৬০

২৯. 'শীতের মাঠ'; তদেব; পৃ. ১৮৭

৩০. 'অপহরণ'; তদেব; পৃ. ৪৬০

৩১. 'আঙুরলতা'; তদেব; পৃ. ২২৪

৩২. 'বকুলগন্ধ'; তদেব; পৃ. ৭৭

৩৩. 'ফুটেছে কুসুমকলি' : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১০১

৩৪. 'গগনের অসুখ' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩০০

৩৫. 'স্বপ্নের নবীন' : বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; পৃ. ১৮৫

৩৬. 'যযাতি' : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ২৩৮

৩৭. 'বিচিত্র সেই রামধনু'; তদেব; পৃ. ৬৮০

৩৮. 'আঙুরলতা'; তদেব; পৃ. ২২৮

৩৯. 'নিষাদ'; তদেব; পৃ. ২৮১

৪০. ‘শীতের মাঠ’; তদেব; পৃ. ১৮৮

৪১. ‘বাঘ’; তদেব; পৃ. ২৪৯

৪২. ‘সুধাময়’; তদেব; পৃ. ২৬৮-২৬৯

৪৩. ‘সুধাময়’; তদেব; পৃ. ২৫৫

৪৪. ‘হেমন্তের সাপ’; তদেব; পৃ. ৬৬৫

৪৫. ‘আত্মজা’; তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮

৪৬. ‘কাচঘর’ : বিমল কর; কাচঘর, ক্লাসিক প্রেস; জ্যৈষ্ঠ; ১৩৬২; পৃ. ২৫

৪৭. ‘মানসাঙ্ক’ : বিমল কর; সুধাময়; এভারেস্ট বুক হাউস; ১৯৫৯; পৃ. ১১৯

৪৮. ‘সেই ঘর, এই বাসা’: বিমল কর; ছত্রিশ রাগিণী; তদেব; পৃ. ১৯

৪৯. ‘জননী’ : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩১০

৫০. ‘ইঁদুর’; তদেব; পৃ. ২৯

৫১. সাক্ষাৎকার: বিমল কর; বিমল করের কথাসাহিত্য; সুমনা দাস সুর; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯; পৃ. ৩৮৯

৫২. ‘জননী’ : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৩১০

৫৩. ভূমিকা : ‘উপাখ্যানমালা’; বিমল কর; আনন্দ পাবলিশার্স; ১৯৯৫

৫৪. ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’: বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১৩৫

৫৫. ‘রামচরিত’ : বিমল কর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৬৮; পৃ. ২১০

৫৬. ‘ফুটেছে কুসুমকলি’ : বিমল কর; সাহিত্যের সেরা গল্প; তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮

৫৭. ‘নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা’ : বিমল কর; পঞ্চাশটি গল্প; তদেব; পৃ. ৭২৭

৫৮. ‘যযাতি’; তদেব; পৃ. ২৩৮

৫৯. ‘ছোটগল্প: নূতন রীতি’: বিমল কর; বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক; সন্দীপ দত্ত; তদেব; পৃ. ৩২

৬০. ‘বিমল কর’: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার; ‘দেশ’; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩; পৃ. ৪৬

৬১. ‘কইতে কথা বাধে’ : সমরেশ মজুমদার; আরুণি পাবলিকেশনস; ২০০০; পৃ. ৩৮

দশম অধ্যায়

উপসংহার :
একালের প্রেক্ষিতে বিমল করের ছোটগল্প–ফলপরিণাম

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনে বিমল করের সৃষ্টির দিকনির্দেশী প্রভাব সর্বতোভাবে স্বীকৃত। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পাঁচ দশক ব্যাপী বাংলা গল্পের ভুবন তাঁর লেখনীর দ্বারা নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়েছে। কল্লোল-উত্তর যুগে তাঁকে কেন্দ্র করেই বাঁক বদলের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বাংলা ছোটগল্প। প্রাথমিক পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সুবোধ ঘোষ-বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিমল কর শৈল্পিক স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র ধারার গল্পকার রূপে পাঠকসমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির আচ্ছন্নতা থেকে বাংলা গল্পজগতকে মুক্ত করার সৃজনশীল স্পর্ধা তাঁর আয়ত্তে ছিল। দার্শনিক ভাবনা ও প্রাকরণিক নতুনত্বের যৌথতায় বাংলা গল্পকে নিজস্ব ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বিমল করের গল্পকারসত্তার নান্দনিক অভিপ্রায়।

বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে বহমান জীবনের শাশ্বত স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন বিমল কর। 'সুধাময়', 'অপেক্ষা' থেকে 'জলজ', 'সত্যদাস', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে জীবনসম্পর্কীয় অজস্র জিজ্ঞাসা। কল্লোলীয় বা বামপন্থী গল্পকারদের অনুসরণে বিশেষ কোনো তত্ত্বের নিরিখে তিনি জীবনকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী হননি। বরং পারিপার্শ্বিক নানা অভিজ্ঞতা-অনুভূতির সঙ্গে সংহত কল্পনা ও স্বজ্ঞার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ। এ প্রসঙ্গে গল্পকারের নিজস্ব বয়ান লক্ষণীয়—

> 'আমার সমস্ত গল্প আমার ধারণা মতন লেখা, তা ভালই
> হোক অথবা মন্দ।'[১]

বিমল করের গল্পে প্রধানত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির জীবনায়ন রূপায়িত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জীবনের বাহ্যিক বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে চলিষ্ণু সময়ে আলোড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তর্জগতকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন। বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা।

বিমল করের নানা গল্পের মধ্য দিয়ে যেন মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মদর্শন ঘটে। সময়জাত বিচ্ছিন্নতা-নৈরাশ্য-মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনকে তিনি সংকীর্ণ পরিসর থেকে বৃহত্তর জীবনবোধে অন্বিত হতে উৎসাহ দিয়েছেন। জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেই উপলব্ধ হয়েছে চিরন্তনের গভীরতর স্বাদ। মানুষের সামাজিকসত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কায়নের কথাই বারে বারে উঠে এসেছে। তাই 'আঙুরলতা', 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি', 'নেশা' প্রভৃতি গল্পের চূড়ান্ত পরিণতিতে মানবিক সম্পর্কের কথাই দ্যোতিত হয়ে ওঠে।

আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিমল কর সর্বদাই জীবনের দার্শনিক নির্যাসের অন্বেষণ করেছেন। তাঁর গল্পের পাঠজ সংবেশনে পাঠক-পাঠিকারাও ক্রমশ জীবনজিজ্ঞাসায় প্রাণিত হয়েছে। সমকালীন যুগের প্রবণতা অনুসরণে পরাবাস্তবতা, মার্কসবাদ বা কোনো তাত্ত্বিক দর্শনের প্রতি আকর্ষণে তিনি আমাদের প্ররোচিত করেন নি। বরং জীবনপ্রবাহের অবিরত মন্থনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে জীবনদর্শন। অস্তিত্বের সারাৎসার উপলব্ধিই হল তাঁর জীবনদর্শনের প্রধান লক্ষ্য। অনিকেত সময়ের ইশারায় মানুষ আপন অস্তিত্বের শূন্যতাবোধে বারংবার বিপর্যস্ত হয়েছে। বিমল করের সৃষ্টি অস্তিত্বের সংকটে বিধ্বস্ত মানুষকে শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসরণে সহায়তা করে। মৃত্যুর অনিবার্য অমোঘতাকে অস্বীকার করেননি; বরং গভীর মৃত্যুবোধের মধ্য দিয়েই তিনি শাশ্বত জীবনবোধে উত্তরিত হতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে জীবনের এই শাশ্বতবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব অনুভবের প্রতিফলন ঘটেছে নিম্নোক্ত বক্তব্যে—

> 'এক ধরনের জীবনকে পাওয়া যায় বইয়ের পাতায়। অত্যন্ত কুশলী যাঁরা, অসাধারণ কল্পনাশক্তি যাঁদের তাঁরা বইয়ের পাতার জীবনকেও বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় করে তুলতে পারেন। অন্য যে-জীবন তা বইয়ের পাতাতে থাকলেও সেই জীবন যেন কেতাবের পাতা ছাড়িয়ে অন্য মাত্রায় উঠে আসে। সে-জীবন 'লাইফ্ ইটারন্যাল'। শাশ্বত জীবন। এ জীবনকে ভোলা যায় না। আমাদের সাধ্য নেই তা বিস্মৃত হব।'[২]

এই শাশ্বত জীবনবোধের যথার্থ রূপকার হলেন গল্পকার বিমল কর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবজীবন যেন এক অন্তহীন যাত্রা। সেই যাত্রাপথে একমাত্র পাথেয় হল আত্মঅন্বেষণ। এই অন্বেষণের কথকতাতেই ভরে উঠেছে তাঁর গল্পজগত।

বিমল করে'র সমকালে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সন্তোষ কুমার ঘোষ-রমাপদ চৌধুরী-ননী ভৌমিক-নবেন্দু ঘোষ-সমরেশ বসু প্রমুখের লেখনী নানা মাত্রার সঞ্চার করেছিল। বিশ শতকে চার-পাঁচ দশকে আর্থ সামাজিক জীবনে অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অন্তঃসারশূন্য মানবিক সম্পর্কায়ন ইত্যাদির ভাষ্যরূপ তাঁদের গল্পে স্থান পায়। সমাজসচেতন দৃষ্টিতে, মননের তীক্ষ্ণতায় বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রমবিচ্ছিন্নতা, নৈতিক স্খলন, স্বার্থপরতা, অস্তিত্বের লড়াইকে সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু ও রমাপদ চৌধুরী নানা গল্পে প্রতিবিম্বিত করেছেন। অন্যদিকে বামপন্থী ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, তপোবিজয় ঘোষের কলম নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম বর্ণনায় মুখরিত হয়েছে। সমকালীন গল্পকারদের মতো বিমল করের গল্পে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্যার টানাপোড়েন উঠে এলেও মানুষের অন্তরমহলের বাস্তবতাই শৈল্পিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে পরিধিবহুল না হলেও তাঁর গল্পে প্রতিফলিত গভীরতর জীবনবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। এই দার্শনিক জীবনবীক্ষার মরমি প্রকাশেই বিমল কর বাংলা গল্প ধারায় এক স্বতন্ত্র স্রষ্টারূপে সর্বজননন্দিত।

বিশ শতকে পাঁচের দশকে অমিয়ভূষণ মজুমদার ও কমলকুমার মজুমদারের লেখনী বাংলা গল্পের প্রচলিত ধারাকে বিমল করের মতোই অগ্রাহ্য করেছিল। ছোটগল্পকে গদ্যে লিখিত কবিতা বলেই মনে করতেন অমিয়ভূষণ। পাঠকপ্রিয়তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকতাবিরোধী মনোভাবে জীবনের জটিল অন্তর্মুখী রূপ, দ্বান্দ্বিকতা গল্পে পরিস্ফুট করেছেন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বিভিন্ন অণুপত্রিকাতে প্রকাশিত গল্পে অমিয়ভূষণ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পাঠক-পাঠিকার অভ্যস্ত রুচিকে আঘাত করে কমলকুমার কাহিনি-পরম্পরাহীন ছোটগল্পে আধুনিক জীবনে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছেন। নাট্য-সংগীত-দৃশ্যকলার অন্তঃস্থ মিলনে তিনি ব্যাকরণের সীমাকে ধ্বস্ত করে নতুন ভাষাশৈলীতে গল্প সৃষ্টি করেছেন। বাণিজ্যিক পত্রিকার জনপ্রিয় ধারাকে অগ্রাহ্য করেই কমলকুমার ভিন্ন ধারার গল্পে আত্মপ্রকাশী হয়েছেন। কাহিনিসর্বস্ব

গল্পধারায় আঘাত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, জনপ্রিয় ধারাকে অস্বীকার করার শৈল্পিক দৃঢ়তা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণ-কমলকুমারের সঙ্গে বিমল করে'র লেখনীর প্রবল সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অমিয়ভূষণ-কমলকুমার যখন বাণিজ্যিক পত্রিকাকে এড়িয়ে অণুপত্রিকাতেই প্রধানত গল্প লিখে চলেছিলেন, তখন বাণিজ্যিক পত্রিকাতেই স্বতন্ত্র ধারার গল্প লিখে বিমল কর জনপ্রিয় ধারায় অভ্যস্ত পাঠকসমাজের রুচি বদলে চেষ্টা করে গেছেন। এ যেন বাণিজ্যিকতার চক্রব্যূহে প্রবেশ করে তাকেই শৈল্পিক আঘাতে ধ্বস্ত করা। এই দুই স্বতন্ত্র ধারার গল্পকারের ন্যায় তিনিও প্রচলিত তাত্ত্বিকতার বাইরে গিয়ে গল্প লিখেছেন। তবে, অমিয়ভূষণ-কমলকুমার মতো সম্পূর্ণ এককভাবে বিমল কর স্বতন্ত্র ধারার গল্প লিখতে চান নি; বরং নতুন ধারার গল্প লিখনে তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহদানের মাধ্যমে এক সুদূরপ্রভাবী গল্প-আন্দোলনের সূচনা করেছেন।

জীবনের এই গহন উপলব্ধির ভাষ্যকে গল্পের প্রথাবদ্ধ ধারায় প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না বিমল কর। ভিন্নধর্মী গল্প লেখার এই ভাবনা লেখনীর মাধ্যমে ক্রমশ বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করল। গল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি। কল্লোল-পরবর্তীকালে বাংলা গল্পধারা বিবিধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছিল। গল্পকার বিমল করই প্রথম এই প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। সমকালীন গল্পধারার বিপ্রতীপে তিনি গড়ে তুললেন 'ছোটগল্প: নতুন রীতি'। তাঁর অনুভবী দৃষ্টিভঙ্গির অবলম্বনে শৈল্পিকভাবে বিনির্মিত হল ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা। নবীন গল্পকারদের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বাংলা গল্পকে 'প্লট' নির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই গল্পভাবনাই পরবর্তীকালে 'গল্পহীন গল্প' ধারার সৃষ্টিতে বীজসূত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল।

নিজের সৃষ্ট গল্পের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিমল কর স্বয়ং সচেতন ছিলেন। প্রধানত শহুরে নাগরিক পটভূমিকায় তাঁর গল্প রচিত হয়েছে; গ্রামবাংলার বাস্তব চিত্র পরিবেশনে স্বীয় ব্যর্থতা তিনি স্বীকার করেছেন। বিমল করে'র গল্পভুবনে বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব বারে বারে অনুভূত হয়েছে। মানবজীবনে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে অনেকসময় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিসরকে বিস্তৃত হতে দেখা যায়নি। প্রাকরণিক অভিনবত্বের প্রতি প্রথমদিকে গুরুত্ব আরোপ করলেও পরবর্তীকালে যথাযথ অনুসরণ বা অগ্রসরণের ক্ষেত্রে এক অসম্পূর্ণতা তাঁর লেখনীকে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু সীমাবদ্ধতা

সত্ত্বেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিমল কর নানা মাত্রার গল্পসৃজনে উৎসাহী ছিলেন।

বাণিজ্যিক পত্রিকার লেখক হলেও বিমল কর নিজের লেখনীকে সর্বদাই বাণিজ্যিকরণের আবর্ত থেকে মুক্ত রাখতে সচেতন ছিলেন। লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশের দ্বারা তিনি কখনোই নিয়ন্ত্রিত হন নি। সতীনাথ-কমলকুমার-অমিয়ভূষণের মতো তাঁরও পাঠক তোষণ করা মূল লক্ষ্য ছিল না। জনপ্রিয়তা লাভের স্থূল আকাঙ্ক্ষায় বিমল কর নিজের সৃষ্টির সঙ্গে আপোস করতে চান নি। বাণিজ্যিক মূল ধারার মধ্যে থেকেই তিনি সেই ধারার স্বরূপকে ভিন্ন মাত্রায় চালিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে, জনপ্রিয় পত্রিকাগুলিতেই 'সুধাময়', 'অপহরণ', 'গুণেন একা', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি মতো ভিন্নধর্মী গল্প প্রকাশিত হয়েছে। একজন গল্পকার হিসেবে বাংলা গল্প সম্পর্কে পাঠকপ্রিয় পত্রিকাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সুপ্ত ইচ্ছা তাঁর মনে সদাজাগ্রত ছিল।

ভিন্নধর্মী গল্প লেখার সমান্তরালে বিমল কর পাঠক-পাঠিকার সাহিত্যরুচিকেও পুনর্নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জনপ্রিয় ধারার লেখক হিসেবে পাঠকের গল্পপিপাসু মনকে তৃপ্ত করার দায় তাঁর ছিল; আবার প্রচলিত ধারার কৃত্রিমতা থেকে বাংলা গল্পকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। নতুন মাত্রার গল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য পাঠক-পাঠিকার পাঠ-অভ্যাস পরিমার্জন করার প্রয়োজন ছিল। বিমল কর গল্পের সৃজনে পাঠক-পাঠিকাদের নিজের অভিজ্ঞতার শরিক করে তুলতে চেয়েছেন। গল্পলোলুপ পাঠকের চাহিদা পূরণের পরিবর্তে তাদের ভাবজগতকে সমৃদ্ধ করার তাগিদ তাঁর লেখায় লক্ষণীয়। তিনি পাঠকের পাঠপ্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান নি, বরং পাঠকের কাছে সৃজনশীল পাঠপ্রস্তুতির প্রত্যাশা করেছেন।

বিষয় ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র মাত্রার ছোটগল্প সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাতেই বিমল কর 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' পত্রিকার সূচনা করেন। এই নতুন ভাবনাঋদ্ধ গল্প সৃষ্টিতে তিনি অনুজ গল্পকারদের বারে বারে উৎসাহিত করেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক রূপে বিমলবাবু নবীন লেখকদের সর্বদা বেশি করে সুযোগ দিতে চেয়েছেন। বাণিজ্যিক পত্রিকার লেখক হয়েও তাঁকে 'গল্পপত্র' ইত্যাদি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হতে দেখা গিয়েছে। 'ছোটগল্প: নতুন রীতি', 'গল্পপত্র' পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের নতুন ধারার গল্পসৃষ্টিতে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর

ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে —

> 'যেসব লেখা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের অসুবিধা ছিল, বিশেষ করে একেবারে নতুন লেখক, যারা ফর্ম ভাষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছে, তা প্রকাশের সুযোগ করে দেবার ব্যাপারটাও ছিল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।...নতুন রীতি ছিল সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক প্রচেষ্টা।'[৩]

বিমল করের প্রেরণায় নতুন ধারার ছোটগল্প সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন অনুজ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। পরবর্তীকালে তাঁর ভাবনার অনুসরণে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা গল্পকে নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তিনিই প্রথম যথার্থ অর্থে গল্প-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ দশক সময়কালে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে বিমল কর যেমন গল্প লিখেছেন, একই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদেরও বহুমাত্রিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মনোজগতে আলোড়ন তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্প নবীন গল্পকারদের কাছেও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠে এসেছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, তার নিঃসঙ্গ রূপ প্রকাশ কিংবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে মানুষের অস্তিত্বগত সংকট, জীবনসংবেদী আত্মজিজ্ঞাসা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিমল করের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, চরিত্রচিত্রণ, মানবিকতা বোধের শৈল্পিক ভাষায়নে উজ্জ্বল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব বিমল কর সৃষ্ট 'ছোটগল্প' : নতুন রীতি'র সার্থক উত্তরাধিকার বহন করছে। গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ বিশ্লেষণ—

> 'একজন জাত লেখক পাঠকের মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন। লেখকদের মধ্যেও যিনি তাঁর সাহিত্য মহিমায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে জানেন, তিনি বিমল কর।'[৪]

নিজস্ব দ্রোহাত্মক ভাবনা নিয়েই বিমল কর বাংলা গল্পকে নতুন ধারায় এগিয়ে

নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল 'ছোটগল্প: নতুন রীতি'। কাহিনিসর্বস্বতা থেকে বাংলা গল্পকে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার মাধ্যমে মুক্তি দিতে উদ্যোগী হয়েছিল এই 'নতুন রীতি'। পরবর্তীকালে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'র পথ ধরেই একাধিক গল্প-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। মলয় রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে 'হাংরি আন্দোলন', রমানাথ রায়ে'র পরিকল্পনায় 'এই দশক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলনের সূচনা হয়। বিমল করের ভাবনা অনুসরণে এই আন্দোলনকারীরা প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতায় কাহিনিহীন গল্পসৃজনে সচেষ্ট হন। পাঠকচিত্তের তৃপ্তিদায়ক ফরমায়েশি গল্প লেখার পরিবর্তে মানুষের অন্তর্জগতের উন্মোচনে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সুব্রত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 'গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গল্প আন্দোলন' কিংবা সাতের দশকে 'নতুন নিয়ম' আন্দোলনে নব ভাষাশৈলীতে প্লটবিহীন গল্প লেখার যে শৈল্পিক ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার প্রাথমিক প্রেরণাই ছিল বিমল করের গল্পবিশ্ব। বাংলা গল্পধারায় বিমল করের অবদান মূল্যায়নে গল্পকার অমর মিত্র যথার্থই বলেছেন —

> 'আমাদের ছোটগল্পের যে আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথে শুরু, তাকেই
> সমৃদ্ধ করেছেন বিমল কর।'[৫]

শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতায় বিমল কর হলেন এক আপোসহীন শিল্পী। জনপ্রিয়তা লাভের ব্যক্তিগত স্পৃহা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি স্বয়ং নিজের গল্পের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু বাংলা গল্পের ঐতিহ্যে তাঁর সৃষ্ট গল্পসমূহ ঐশ্বর্যময় সম্পদ রূপে অবশ্যস্বীকার্য। কোনো নির্দিষ্ট দশকের গল্পকার রূপে বিমল কর'কে মান্যতা দেওয়া যায় না। একবিংশ শতকের পাঠক-পাঠিকাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় তাঁর গল্প একইরকম প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবময়। নৈরাশ্যময় অন্তঃসারশূন্য সময়ের ব্যূহে দাঁড়িয়ে বিমল করের মানবিকতাবোধ সমৃদ্ধ জীবনদর্শন আমাদের ক্রমশ প্রত্যয়ী করে তোলে। খণ্ডকালের জীবনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট নানা গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠক-পাঠিকাকে জীবনের শাশ্বত সত্যের স্বরূপ সন্ধানে প্রাণিত করেন। কালের সীমানা পেরিয়ে গল্প ও জীবন যেন একাকার হয়ে যায়। তাই আমাদের কাছে তীব্রভাবে সমকালীন হয়েও বিমল কর একজন চিরন্তন স্রষ্টা।

তথ্যসূত্র :

১. ভূমিকা : বিমল কর; বিমল করের বাছাই গল্প; মণ্ডল বুক হাউস; পঞ্চম মুদ্রণ; বৈশাখ ১৪০০

২. ভূমিকা : বিমল কর; সেরা নবীনদের সেরা গল্প; মিত্র ও ঘোষ; দ্বিতীয় মুদ্রণ; আষাঢ়, ১৪২১

৩. বিমল করের একটি সাক্ষাৎকার; 'নহবৎ' পত্রিকা; ত্রিংশতিবর্ষ; ১৪০০; পৃ. ৪৩

৪. 'বিমলদা': অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; 'নহবৎ' পত্রিকা; ত্রিংশতিবর্ষ; ১৪০০; পৃ. ৪৩

৫. 'সমস্ত জীবনের সহযাত্রী': অমর মিত্র; 'কোরক' পত্রিকা; বইমেলা, ১৯৯৭; পৃ. ৩২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ক) আকর গ্রন্থ :

বিমল কর : 'অসময়'; আনন্দ পাবলিশার্স; ষোড়শ মুদ্রণ; ফাল্গুন, ১৪১৫

বিমল কর : 'আঙুরলতা', নিউ স্ক্রিপ্ট; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ; ভাদ্র, ১৮৭৯ শকাব্দ

বিমল কর : 'উড়োখই'(১); আনন্দ পাবলিশার্স; ৪র্থ মুদ্রণ; মে, ২০০৮

বিমল কর : 'উড়োখই'(২); আনন্দ পাবলিশার্স; ২য় মুদ্রণ; জুলাই, ১৯৯৭

বিমল কর : 'উপাখ্যানমালা'; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

বিমল কর : 'এ আবরণ'; উপন্যাস সমগ্র (৩); আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ২০০০

বিমল কর : 'কাচঘর'; ক্লাসিক প্রেস; কলকাতা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

বিমল কর : 'কিশোর গল্প সংকলন'; বিকাশ গ্রন্থ ভবন; ২য় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৯৭

বিমল কর : 'খড়কুটো'; আনন্দ পাবলিশার্স; পৌষ, ১৪১০

বিমল কর : 'দেওয়াল'; আনন্দ পাবলিশার্স; ৫ম মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০০৮

বিমল কর : 'পঞ্চাশটি গল্প'; আনন্দ পাবলিশার্স; চতুর্থ মুদ্রণ; জুলাই, ২০০৫

বিমল কর : 'পাল্টাপাল্টি'; কসমো স্ট্রিট; কলকাতা; ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯

বিমল কর : 'পূর্ণ অপূর্ণ'; উপন্যাস সমগ্র (২); আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

বিমল কর : 'ফানুসের আয়ু'; উপন্যাস সমগ্র (৪); আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ২০০১

বিমল কর : 'বরফসাহেবের মেয়ে'; ভারতী গ্রন্থ ভবন; ১৯৫৭

বিমল কর : 'বিমল করের বাছাই গল্প'; মণ্ডল বুক হাউস; পঞ্চম মুদ্রণ; ১লা বৈশাখ, ১৪০০

বিমল কর : 'যদুবংশ'; উপন্যাস সমগ্র (৩); আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ২০০০

বিমল কর : 'সরস গল্প'; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০০৫

বিমল কর : 'সাহিত্যের সেরা গল্প'; দীপ প্রকাশন; কলকাতা বইমেলা, ২০০৬

বিমল কর : 'সুধাময়'; এভারেস্ট বুক হাউস; প্রথম সংস্করণ; আষাঢ়, ১৩৬৬

বিমল করে'র অগ্রন্থিত (বিবিধ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত) গল্পসমূহ

খ) বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : 'কল্লোল যুগ'; এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স; সপ্তম প্রকাশ; আশ্বিন, ১৩৯৫

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য : 'কথাগঠন'; সুজন প্রকাশনী; ফেব্রুয়ারি, ২০১২

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের দর্শন'; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা; ১৯৮৪

অপূর্ব কুমার রায় : 'শৈলীবিজ্ঞান'; দে'জ পাবলিশিং; অক্টোবর, ২০০৬

অপূর্ব কুমার রায় : 'সাহিত্য : রূপবিচিত্রা'; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ, ২০০২

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক'; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০১১

অমিতাভ দাস : 'আখ্যানতত্ত্ব'; ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স; ২য় মুদ্রণ; মার্চ, ২০১৪

অমিয়ভূষণ মজুমদার : 'লিখনে কী ঘটে'; আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ১৯৯৭

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের পুত্তলিকা'; দে'জ পাবলিশিং; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা'; দে'জ পাবলিশিং; এপ্রিল, ১৯৯১

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস'; দে'জ পাবলিশিং; ২০০০

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস'; দে'জ পাবলিশিং; ১ম সংস্করণ, ২০০২

অর্ণব সেন : 'শৈলীভাবনায় কথাসাহিত্যের কয়েকজন'; দি সী বুক এজেন্সী; কলকাতা; বইমেলা, ২০১৪

অলোক রায় : 'কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা'; সাহিত্যলোক; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

অলোক রায় (সম্পাদিত) : 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য'; সাহিত্যলোক; ২য় সংস্করণ; ১৯৯৩

অশীন দাশগুপ্ত : 'ইতিহাস ও সাহিত্য'; আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ১৯৮৯

আশিস কুমার দে : 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান'; সাহিত্যপ্রকাশ; কলকাতা; ১৯৯২

উত্তম দাস : 'হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন'; মহাদিগন্ত; ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬

কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং : 'স্বপ্নপ্রতীক'; দীপায়ন; ২০০২

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'; রত্নাবলী; ১৯৯৯

ক্ষেত্র গুপ্ত : 'রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব'; পুস্তক বিপণি; ১ম প্রকাশ; ১৯৮৬

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'; দে'জ পাবলিশিং; ১৩৮০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা'; পুস্তক বিপণি; ১ম সংস্করণ, ১৯৯১

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : 'কল্লোলের কাল'; দে'জ পাবলিশিং; ১ম সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৮৭

ড. অভিজিৎ মজুমদার : 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব'; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৭

ড. গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি'; প্রজ্ঞাবিকাশ; মহালয়া; ২০০৭

ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : 'লাকাঁ'; আন্ডারগ্রাউন্ড লিটারেচর; কলকাতা; ১লা বৈশাখ, ১৪১৬

ড. সরোজ কুমার পান : 'বাংলা ছোটগল্প : নববীক্ষণ'; ডাভ পাবলিশিং হাউস; প্রথম প্রকাশ, ২০১২

ড. সরোজমোহন মিত্র : 'রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প-সমীক্ষা'; গ্রন্থবিকাশ; আশ্বিন, ১৪১২

ড. স্বপন কুমার মণ্ডল : 'মধ্যবিত্ত বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী'; করুণা প্রকাশনী; ১ম সংস্করণ, ২০০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য : 'আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তরে'; পুস্তক বিপণি; ১৯৯৬

তপোধীর ভট্টাচার্য : 'ছোটগল্পের বিনির্মাণ'; অঞ্জলি পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ২০০২

তপোধীর ভট্টাচার্য : 'পড়ুয়ার ছোটগল্প'; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ; মেদিনীপুর; ডিসেম্বর, ২০০৫

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'বাংলা ছোটগল্প : পর্ব পর্বান্তর'; অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স; ১ম সংস্করণ; ২০০৫

ধীমান দাশগুপ্ত : 'গদ্যগঠন'; বাণীশিল্প; ১ম সংস্করণ, ২০০৭

ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী : 'মনের বিকার ও প্রতিকার'; আনন্দ পাবলিশার্স; মাঘ, ১৪০০

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার : 'মানবিক চেতনার স্বরূপ সন্ধানে'; মানবমন; ২০০২

নবনীতা চক্রবর্তী : 'বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী'; পুস্তক বিপণি; ২০০২

নবেন্দু সেন : 'বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস্'; পুস্তক বিপণি; ২য় সংস্করণ; ১৯৯০

নবেন্দু সেন (সম্পাদিত) : 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা'; রত্নাবলী; কলকাতা; জুন, ২০০৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'ছোটগল্পের সীমারেখা'; বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প'; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; ফাল্গুন, ১৩৬৫

পবিত্র সরকার : 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি'; সাহিত্যলোক; জানুয়ারি, ২০০২

পরেশচন্দ্র মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার : 'বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন'; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১০

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : 'অন্তর্বয়ন : কথাসাহিত্য'; একুশে; কলকাতা; ১৯৯০

পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র : 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা'; নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ; জানুয়ারি, ২০০১

প্রমথনাথ বিশী : 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী'; বাংলা আকাদেমি; ১ম সংস্করণ; ২০০১

বসুধা চক্রবর্তী : 'মানবতাবাদ'; দীপায়ন; ২০০২

বিজয়কমার দত্ত : 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড'; গ্রন্থতীর্থ; কলকাতা; ১ম সংস্করণ, ২০০৯

বিনয় ঘোষ : 'মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ'; ওরিয়েন্ট লংম্যান;

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১-২); নবপত্র প্রকাশনী; ২য় সংস্করণ; ২০০৫

বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : 'শৈলী চিন্তাচর্চা'; রত্নাবলী; কলকাতা; জুলাই, ২০০৩

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় : 'সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ'; দে'জ পাবলিশিং; ১ম সংস্করণ; এপ্রিল, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব গুহ : 'সারস্বত'; সাহিত্যম; বৈশাখ, ১৪১১

ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'; মডার্ণ বুক এজেন্সি; ১৯৮৯

মৃণালকান্তি ভদ্র : 'অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ'; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; ২য় সংস্করণ; ১৯৯৫

মৃণালকান্তি ভদ্র : 'অস্তিবাদ : জ্যাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য'; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; ৩য় সংস্করণ; ১৯৯৯

মৃণাল নাথ : 'ভাষা ও সমাজ'; নয়া উদ্যোগ; কলকাতা; ১৯৯৯

রথীন্দ্রনাথ রায় : 'ছোটগল্পের কথা'; পুস্তক বিপণি; জুন, ১৯৮৮

রবিন পাল : 'কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প'; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ১৯৯৪

রবিন পাল : 'বাংলা ছোটগল্প : কৃতি ও রীতি'; ব্রহ্মাপুর প্রকাশন; পৌষ, ১৪০৯

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় : 'ছোটোগল্প তত্ত্বানুসন্ধান ও সমালোচনা চিন্তা'; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা বইমেলা; ২০১২

শিশির কুমার দাস : 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'; দে'জ পাবলিশিং; ২য় সংস্করণ; ২০১১

শিশির কুমার দাস : 'বাংলা ছোটগল্প'; বুকল্যাণ্ড; ১ম সংস্করণ; ১৯৬৩

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : 'বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ'; বিশ্বাস বুক স্টল; ৬ষ্ঠ মুদ্রণ; ১৪১০

শ্রাবন্তী ভৌমিক : 'বেঁচে থাকার দর্শন'; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৮

সন্দীপ দত্ত : 'বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক'; র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন; মে, ১৯৯৩

সমরেশ মজুমদার : 'কইতে কথা বাধে'; আরুণি পাবলিকেশনস্; আগস্ট, ২০০০

সরোজমোহন মিত্র : 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা'; ভারতী ভবন; ১৯৬৪

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'; দে'জ পাবলিশিং; ডিসেম্বর ১৯৮৮

সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্ত্তী : 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট'; পুস্তক বিপণি; জুন, ২০০৪

সিগমুন্ড ফ্রয়েড : 'স্বপ্ন'; দীপায়ন; ২০০২

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড : 'স্বপ্ন সমীক্ষণ' (প্রথমভাগ); দীপায়ন; জানুয়ারি, ২০০২

সুদীপ বসু : 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা'; পুস্তক বিপণি; ১ম সংস্করণ; ১৯৯৭

সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই'; ধ্রুবপদ; ২০০০

সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'; এম.সি.সরকার; ৬ষ্ঠ সংস্করণ; ১৩৯৬

সুনীল কুমার সরকার : 'ফ্রয়েড' (জীবন ও মনঃসমীক্ষণ); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; ১৯৮৫

সুবল সামন্ত (সম্পাদিত) : 'বাংলা গল্প ও গল্পকার' (৫ম); এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৩

সুভাষ ভট্টাচার্য : 'ভাষা ও শৈলী'; বঙ্গীয় সাহিত্যসংসদ; কলকাতা; ২০০৬

সুমনা দাস সুর : 'বিমল করের কথাসাহিত্য'; এবং মুশায়েরা; জানুয়ারি, ২০০৯

সুমিতা চক্রবর্তী : ‘বাংলা ছোটগল্পের বিষয় আশয়’; পুস্তক বিপণি; জুন, ২০০৪

সুমিতা চক্রবর্তী : ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’; মুক্তাক্ষর; কলকাতা; ১৯৯২

সোহারাব হোসেন : ‘বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি’ (১ম খণ্ড); করুণা প্রকাশনী; ২য় সংস্করণ; সেপ্টেম্বর, ২০১২

স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত) : ‘বিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি’; পুস্তক বিপণি; ২য় সংস্করণ; এপ্রিল, ২০১০

গ) ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

Abrams, M.H. & Geoffrey Harphan : 'A Glossary of Literary Terms'; Cengage Learning India Private Limited; Delhi; Eleventh Ed, 2015

Cuddon, J.A. (Ed.) : 'A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory'; Blackwell Publishers; 4th Ed; 1998

Forster, E.M. : 'Aspects of the Novel'; Penguin Books; 2005

Hudson, W.H. : 'An Introduction to the Study of Literature;' Lyall Book Depot ; 1967

Jefferson, Ann And David Robey (Ed.) : 'Modern Literary Theory : A Comparative Introduction'; B.T. Balsfrod Ltd.; London

Lodge, David : 'Modern Criticism and Theory;' Longman; 1988

Reid, Ian : 'Problems of Definition, Short Story'; 1986

Richards, I.A. : 'Principles of Literary Criticism'; Routledge and Kegal Paul; London, 1967

Tolstoy, Leo : 'Selected Stories' ; Projapati ; 2010

ঘ) পত্রপত্রিকা :

অমৃতলোক : প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প; ১৯৯৫

এবং মুশায়েরা : কিয়ের্কেগার্দ বিশেষ সংখ্যা; ৪র্থ সংখ্যা, দশম বর্ষ; জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৪

এবং মুশায়েরা : জাঁ পল সার্ত্র বিশেষ সংখ্যা; ৪র্থ সংখ্যা, একাদশ বর্ষ; জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৫

এবং মুশায়েরা : তলস্তয় বিশেষ সংখ্যা ; ৪র্থ সংখ্যা; ষোড়শ পর্ব; জানুয়ারি-মার্চ; ২০১০

এবং মুশায়েরা : সিগমুন্ড ফ্রয়েড বিশেষ সংখ্যা; ৪র্থ সংখ্যা, বিংশতি বর্ষ; জানুয়ারি–মার্চ; ২০১৪

কোরক : বিমল কর সংখ্যা; বইমেলা; ১৯৯৭

তীব্র কুঠার : বিমল কর বিশেষ সংখ্যা; বইমেলা; ২০০৩

দিবারাত্রির কাব্য : উপন্যাস সংখ্যা ৩; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা; একাদশ বর্ষ; ২০০৩

দেশ : সাহিত্যসংখ্যা; ১৩৮২

দেশ : ১৬ ডিসেম্বর ; ১৯৯৫

দেশ : ১৭ সেপ্টেম্বর; ২০০৩

দোতারা : বিষয় মিথ; প্রথম বর্ষ, সূচনা সংখ্যা; মার্চ, ২০১২

নহবত : ত্রিংশতি বর্ষ; ১৪০০ বঙ্গাব্দ

নীললোহিত : মৃত্যুচেতনা; জানুয়ারি-জুন, ২০০৭

পদক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে মিথ; ৩২ সংখ্যা; ২৭ বর্ষ; ডিসেম্বর ২০০১

পদক্ষেপ : বর্ষ ৩৪; সংখ্যা ৩৯; ডিসেম্বর, ২০০৮

পরিকথা : প্রথম সংখ্যা; ষষ্ঠ বর্ষ; ডিসেম্বর, ২০০৩

পরিকথা : বাংলা ছোটগল্পের বিস্তার; ষোড়শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা; মে, ২০১৪

শুভশ্রী : বাংলা কথাসাহিত্যে নারী; ৪৩ বর্ষ; ২০০৪-২০০৫

সময় তোমাকে : আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মিথ; বিশেষ সংখ্যা; পঞ্চম বর্ষ, ২০১১

ছোটগল্পকার বিমল কর : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. (কলা)
উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

স্নেহাংশু লোধ

রেজিস্ট্রেশন নং - ০১৪৪

তারিখ : ০১.১২.২০১১

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৬

VIDYASAGAR UNIVERSITY

MIDNAPORE ★ WEST BENGAL ★ PIN 721102

Phone : (03222) 276554 :: 276555 :: 276557 :: 276558 :: 262297

Ref. No..... *Date.....*

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri Snehangshu Lodh has completed his research work on the topic titled '**ছোটগল্পকার বিমল কর : স্রষ্টা ও সৃষ্টি**' (Ph.D. Registration No.- 0144, dated 01.12.2011) under my supervision at the Department of Bengali, Vidyasagar University.

It is certified that neither any part nor as a whole the thesis has been published anywhere either for any scholarly degree or for financial benefit. He has proved his original thinking faculty through every chapter of the thesis.

Now he is permitted to submit his thesis for Ph.D. degree (Arts) in Bengali to the Vidyasagar University.

I wish him every success.

Midnapore

Date :

Dr. Saroj Kumar Pan

Assistant Professor

Department of Bengali

Vidyasagar University

Fax : (91) 03222, 275329, 264338

e-mail : vidya295@mail.vidyasagar.ac.in // website : url : http//www.vidyasagar.ac.in

DECLARATION OF CANDIDATE

I do herewith declare that the thesis entitled **'ছোটগল্পকার বিমল কর : স্রষ্টা ও সৃষ্টি'** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at the Vidyasagar University is based upon my own work carried out under the supervision of Dr. Saroj Kumar Pan, Assistant Professor, Department of Bengali, Vidyasagar University. I do further declare that neither this thesis nor any part of it has been published before for any degree or diploma elsewhere.

Midnapore
Date :

Snehangshu Lodh

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			ক - জ
প্রথম অধ্যায়	:	বিমল কর : জীবন ও সমকাল	১ - ১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বিমল করের সৃষ্টিলোক	১৯ - ৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	বিমল করের ছোটগল্পের শ্রেণিবিন্যাস	৩৯ - ৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	জীবনদর্শন	৬০ - ১০০
পঞ্চম অধ্যায়	:	মৃত্যুচেতনা : নিগূঢ় উপলব্ধি	১০১ - ১২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপচিত্রণ	১২৮ - ১৬০
সপ্তম অধ্যায়	:	প্রকৃতিচেতনা : নিসর্গ ও মানবজীবনের অন্তর্লীন সম্পর্ক	১৬১ - ১৮৫
অষ্টম অধ্যায়	:	চরিত্র নির্মাণ কুশলতা	১৮৬ - ২০২
নবম অধ্যায়	:	প্রাকরণিক কৃৎকৌশল	২০৩ - ২৩৬
দশম অধ্যায়	:	উপসংহার : একালের প্রেক্ষিতে বিমল করের ছোটগল্প – ফলপরিণাম	২৩৭ - ২৪৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	:		২৪৫ - ২৫২

ভূমিকা

বহুল বিবর্তনে ঋদ্ধ বাংলা গল্পের বহমান ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হলেন বিমল কর। তাঁর সৃষ্ট গল্পবিশ্বের সৃজনী-সংরাগ সমকালীনতার সীমাকে অতিক্রম করে চিরন্তনের সংবেদনাকে দ্যোতিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে উপেক্ষা করে বাংলা গল্পের ইতিহাস নির্মাণের সমস্ত রকম শৈল্পিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া অবশ্যাম্ভাবী। উনিশ শতকের শেষপর্বে বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে যথার্থরূপে বিকশিত হয়ে বিশ শতকে প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের কলমে সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানিক-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর প্রমুখের সমান্তরালে কল্লোলীয় সাহিত্যিকরা বাংলা গল্পকে নতুন নতুন ভাবনায় বিন্যস্ত করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সুবোধ ঘোষ-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-নরেন্দ্রনাথ মিত্র-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সহ একাধিক গল্পকারের শিল্পিত লেখনীতে বাংলা গল্পের ভুবন নানা মাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে কল্লোল-কালিকলম হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-স্বাধীনতা পেরিয়ে বিশ শতকে পাঁচের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলা গল্পধারায় দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিষয়গত নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়; কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংগঠন বা আঙ্গিকগত নতুনত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় নি। ফলে, এক অসম্পূর্ণতার সংরেশ বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অনুভূত হয়ে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে আবর্তিত সমকালীন সময়-পরিসরে বাংলা গল্পধারা শিল্পগতভাবে এক বাঁকবদলের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পাঁচের দশকে বিমল করের গল্পকে কেন্দ্র করেই বাংলা গল্প নতুন এক স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হয়েছিল। তাই বাংলা গল্পধারার বিবর্তনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আপন লেখনীর শৈল্পিকতায় বিমল কর অপরূপভাবে বিনির্মাণের মাধ্যমে নতুন ধারার গল্পসৃজনে প্রয়াসী হন। অন্তর্বস্তুর বহুস্বরিকতা ও প্রাকরণিক অভিনবত্বের যৌথতায় তিনি বাংলা গল্পে রূপান্তর আনয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' আন্দোলন। এই গল্প-আন্দোলনে 'কী লিখব' এবং 'কেমন করে লিখব' উভয় ভাবনাই যথাযথভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

বহির্জগতের প্রাবল্যে মানুষের সত্তাস্থিত অন্তর্বাস্তবতাকে ভাষারূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে বিমল কর গল্পকে কাহিনি তথা প্লট-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক চেতনা বাহিত তত্ত্বনিষ্ঠতা থেকে বিচ্যুত হয়ে বাংলা গল্পের নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর নান্দনিক অভিপ্রায়। ঐতিহ্যকে অস্বীকার নয়, বরং ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে গতানুগতিক ধারায় গল্পসৃজনের তীব্র বিরোধী ছিলেন বিমল কর। স্থূল অনুসরণের পরিবর্তে ঐতিহ্যকে আত্তীকরণে তিনি বাংলা গল্পকে স্বতন্ত্র এক নান্দনিকতায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তাই বাণিজ্যিক পত্রিকার পেশাদারি লেখক হয়েও বিমল কর দ্বিধাহীনভাবে নতুন রীতির গল্প রচনা করেছেন। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ধারার বিপ্রতীপতায় ভিন্ন মাত্রার গল্প সৃজনের শৈল্পিক দৃঢ়তা তাঁর কলমে মজুত ছিল। পাঠক-পাঠিকার গল্প পিপাসাকে তৃপ্ত করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে তিনি আগ্রহী ছিলেন না; বরং তাদের চির-অভ্যস্ত পাঠ-অভিজ্ঞতাকে নতুন ধারার গল্পের মাধ্যমে সমৃদ্ধময় করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রয়াস লক্ষণীয়। পণ্যধর্মী সাহিত্যের চোরাটান থেকে বিমল কর স্বীয় লেখনীকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাণিজ্যিক পত্রিকার শীর্ষপদে থেকেও মোহগ্রস্ত না হয়ে তিনি একইসঙ্গে অবাণিজ্যিক সাহিত্যপত্রিকাকে নির্ভয়ে ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষণায় প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'গল্পবিচিত্রা', 'গল্পপত্র' পত্রিকা যথার্থ নিদর্শন। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার আবেগে তিনি নিজে কখনো প্রতিষ্ঠানকল্প হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নি; পরিবর্তে উত্তরসূরি গল্পকারদের নতুন ধারার গল্পসৃজনে উৎসাহ দিয়েছেন অবিরত। তাঁর ভাবনাসম্ভূত 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' পরবর্তীকালে 'হাংরি', 'শাস্ত্রবিরোধী' প্রভৃতি নানা গল্প-আন্দোলনের সূচনায় অনুপ্রেরক হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের শেষ ছয় দশকে বিমল করে'র লেখনীর সৃজনশীলতা শুধুমাত্র সমকালকেই প্রভাবিত করেনি, একইসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে গল্পে নতুন নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনুঘটক রূপে সক্রিয় রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক জনপ্রিয় ধারার বিপ্রতীপে ভিন্ন ধারার গল্পসৃজনে উৎসুক নবীন গল্পকারদের কাছে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আজও দিকনির্দেশক রূপে প্রতীত হয়।

বাংলা সাহিত্যের যুগজয়ী স্রষ্টা বিমল করের জীবন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে অনুপুঙ্খ আলোচনার অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হয়। সাহিত্যের বিবিধ সংরূপ অর্থাৎ

গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার সৃজনীশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। তবুও কয়েকটি অণুপত্রিকা এবং একটি-দুটি গ্রন্থ ব্যতীত তাঁর সম্পর্কে গবেষকদের উৎসাহের অভাব আমাদের পাঠ-সংস্কৃতির দৈন্যতাকে চিহ্নিত করে দেয়। ছক-ভাঙা এই সাহিত্যিকের সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনার বীতস্পৃহা সকলের কাছেই পীড়াদায়ক। বিশেষত, স্বাধীনতা-উত্তর কালে তাত্ত্বিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ বাংলা গল্পধারাকে যিনি স্বতন্ত্র ধারায় সঞ্চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁর গল্পসমগ্র আজ পর্যন্ত প্রকাশ না হওয়ার ব্যর্থতার দায় আমাদের সকলকেই বহন করতে হবে। সাহিত্যজীবনে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের একনিষ্ঠতার প্রতি তীব্র অনীহাই তাঁর সৃষ্টিকে প্রচারের আলোকবৃত্তে উঠে আসার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। তবুও পাঠঋদ্ধ পাঠক-পাঠিকার কাছে বিমল কর চিরকালীন স্রষ্টারূপে উপস্থিত থাকবেন।

বাংলা গল্পধারায় বিমল করের বৈপ্লবিক অবদান স্মরণে রেখেই আমরা তাঁকে ও তাঁর সৃষ্ট গল্পসমূহকে কেন্দ্র করে গবেষণা কর্মে ব্যাপৃত হয়েছি। 'ছোটগল্পকার বিমল কর: স্রষ্টা ও সৃষ্টি' নামাঙ্কিত বিষয়ে আমরা গল্পকার বিমল করের জীবন ও সৃষ্টিশীলতাকে নানা মাত্রায় উন্মোচনে প্রয়াস করেছি। উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পকুশলতা প্রকাশ পেলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি নতুন যুগের ঋত্বিক। নানাবিধ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বিমল করে'র গল্পকারসত্তার অমোঘ প্রভাব অন্যান্য সবকিছুকে অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতেও তীব্রভাবে জায়মান। তাই সৃজনশীল পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় গল্পকার বিমল কর ও তাঁর গল্পবিশ্বের স্বরূপকে আমরা নিবিড়ভাবে বুঝতে চেয়েছি।

'ছোটগল্পকার বিমল কর: স্রষ্টা ও সৃষ্টি' গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে আমরা দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। এসকল অধ্যায়গুলির মাধ্যমে গল্পকার বিমল করের জীবনকথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি দৃষ্টিকোণের মৌলিকতায় তাঁর সৃষ্ট গল্পসমূহে প্রতিফলিত নানা বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনচর্যা ও সমকাল তাঁর সৃষ্টিকে নানা মাত্রায় জারিত করে। চলমান সময়ের আধারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে চলে। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিমল করের ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠা। শৈশব-কৈশোরে বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের সীমানাবর্তী নানা রেলশহর,

কয়লাখনি অঞ্চলে ও যৌবনে চাকরিসূত্রে বেনারসে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। ব্যক্তিগত জীবনে নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, মানসিক টানাপোড়েন, বিষাদগ্রস্ততার সমান্তরালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খণ্ডিত স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ভারত-চিন যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা জারি ইত্যাদি বিমল করের জীবনকে যেমন আলোড়িত করেছিল, তেমনি তাঁর সৃজনশীলতায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গিয়েছিল। ব্যক্তিজীবনে অজস্র ঘটনা ছাড়াও সমকালীন যুগের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ী মূল্যবোধ, যৌথ পরিবারে ভাঙন, ভোগবাদের প্রতি স্পৃহা ইত্যাদি তাঁকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে যায়, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সৃষ্টি হতে থাকে নানা গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ। চাকরির মাধ্যমে জীবনের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাকে অবহেলা করে সাহিত্যকেই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন বিমল কর। জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তিনি সাহিত্যের নানা মাধ্যমে আপন সৃজনশক্তিকে প্রকাশ করেন। তবুও ছোটগল্পের মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্পপ্রতিভার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। বাণিজ্যিক সাহিত্যপত্রিকার দপ্তরে চাকরি করেও বিমল কর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ধারার ছোটগল্প সৃষ্টির উৎসাহ সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে 'ইঁদুর', 'সুধাময়', 'আত্মজা' থেকে উত্তর পর্বের 'যুধিষ্ঠিরের আয়না', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি নানা গল্পে তাঁর নিরীক্ষামূলক সৃজনশীলতা শৈল্পিকতায় ঋদ্ধ হয়েছে।

১৯৪২ খ্রিঃ 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় 'গিনিপিগ, এস্রাজ ও রাত্রি' নামক ছোটগল্পের মাধ্যমে বিমল করে'র সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়। ছয় দশক ব্যাপী সময়কালে দু'শতাধিক ছোটগল্পের সমান্তরালে তিনি 'দেওয়াল', 'খড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'অসময়' ইত্যাদি নানা উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর কলমের নিপুণতায় 'শঙ্খ', 'ঘাতক' ইত্যাদি নাটকের সঙ্গে সঙ্গে 'উড়োখই' নামক স্মৃতিকথামূলক গদ্যগ্রন্থও সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তনে বিমল কর কালজয়ী অনন্য স্রষ্টারূপে চিরনন্দিত। চিরাচরিত ধারা অনুসরণের পরিবর্তে স্বতন্ত্র ভিন্ন ধারার ছোটগল্প সৃজনের মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পভুবন মৌলিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্রধানত বিশ শতকের সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সৃষ্ট বিমল করের গল্পসমূহকে নানা

মাত্রায় শ্রেণিকরণ করা যায়। সূচনা পর্বের পর ভাবনার বিকাশ-বিবর্তনের প্রবণতা অনুসারে অন্বেষণ-উপলব্ধি-উত্তরণ পর্ব হয়ে অন্তিম পর্ব পর্যন্ত তাঁর গল্পধারাকে একাধিক পর্বে বিন্যস্ত করা সম্ভব। আবার, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তিনি মনস্তাত্ত্বিক, মৃত্যুচেতনাধর্মী গল্পের পাশাপাশি সরস গল্প, গোয়েন্দাগল্পও রচনা করেছেন। প্রেমমূলক, দার্শনিকতাবোধে সমৃদ্ধ গল্পের সঙ্গে রূপকাশ্রিত, প্রতীকধর্মী গল্পের নির্মাণে তাঁর সাবলীল দক্ষতা প্রশংসনীয়। গভীরতর জীবনদর্শনের অনুভবী প্রকাশে বিমল করের গল্পবিশ্ব চিরন্তন হয়ে উঠেছে। কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিকতার সাপেক্ষে নয়, চলমান জীবনায়নের মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে এই মরমী জীবনবোধ। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির জীবনপ্রবাহের আধারে গল্প সৃজন করলেও তাঁর জীবনদর্শন সব মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। বহির্জগত ও অন্তর্জগতের অবিরত দ্বিরালাপে মানুষ খণ্ডকালের জীবনে শাশ্বতসত্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। এই জীবনদর্শনের মূল সুরই হল সত্তাগত অপূর্ণতা অতিক্রমণে মানুষের পূর্ণতা উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বিচিত্র মাত্রায় জীবনের পরমসত্যের অন্বেষণ তাঁর 'সুধাময়', 'সত্যদাস', 'জননী', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। 'অপর' ও 'আত্ম'এর দ্বান্দ্বিকতার স্পন্দনকে বহন করেই বিমল করের গল্পের চরিত্ররা জীবনের গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করতে উদগ্রীব হয়েছে। মানবিকতাবোধে আস্থা রেখে তিনি প্রত্যয়ী জীবনবোধে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। মৃত্যুশাসিত জীবনে দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা অন্বেষণের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই বিমল করের গল্পে প্রতিফলিত জীবনদর্শনের সারভাষ্য।

মানবজীবনের অনিবার্য অমোঘ সত্যরূপে মৃত্যুবোধ বিমল করের নানা গল্পে উঠে এসেছে। রহস্যময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে যথাযথভাবে অনুভবের ভাবনা তিনি গল্পের মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। প্রথম দিকে 'অম্বিকানাথের মুক্তি' থেকে শেষজীবনে সৃষ্ট নানা গল্পে বিমল কর মৃত্যুকে নানা দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পকারের ব্যক্তিজীবনে নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও যুগজাত শূন্যতাবোধ, অনিশ্চয়তা, ধ্বংসমূলক বর্বরতা ইত্যাদির সমন্বয়ে এই মৃত্যুবোধ গড়ে উঠেছিল। 'অপেক্ষা', 'নিষাদ', 'শীতের মাঠ', 'উদ্বেগ', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পে মানুষের জীবনে সমান্তরাল 'অপর' সত্তারূপে মৃত্যুর উপস্থিতি বারে বারে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুকে প্রতি

মুহূর্তে অনুভব করে জীবনে বেঁচে থাকার অন্তহীন সংগ্রামই বিমল কর গল্পে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বিভিন্ন গল্পের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণই মধ্য দিয়ে আমরা গল্পকার বিমল করকে মনস্তত্ত্বের এক শৈল্পিক ভাষ্যকার হিসেবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। বহির্জগতের নানাবিধ রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে মানুষের অন্তর্জগতের গূঢ় রহস্যময়তা উন্মোচনে তিনি সর্বদাই উৎসুক ছিলেন। মানবমনের চেতন-অবচেতন-অচেতন স্তরে সক্রিয় অবদমিত বা নিরুদ্ধ বাসনা, মরণ প্রবৃত্তি-কামপ্রবৃত্তির টানাপোড়েন 'আত্মজা', 'যযাতি', 'মানসাঙ্ক', 'বিচিত্র সেই রামধনু' ইত্যাদি গল্পে শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদের তত্ত্বের প্রেক্ষিতে তাঁর গল্পের নানা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতাকে ব্যাখ্যা করা গেলেও বিমল করের গল্পে বিম্বিত মানুষের অন্তর্জগতের বহু ভাষ্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিধির বাইরে রয়ে গেছে। মনস্তত্ত্বসম্পর্কীয় গ্রন্থপাঠের পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি গল্পে মনস্তত্ত্বের বিন্যাসে অগ্রসর হননি, বরং যাপিত জীবনে মানুষের অন্তর্জগতের নানান রহস্যময় জটিলতাকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর্লীন সম্পর্ক বিমল করের গল্পে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিবিম্বিত। রহস্যময় নিসর্গপ্রকৃতির আধারে তিনি মানবজীবনের নানা মাত্রিকতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পে শীত ঋতুর প্রাধান্য দেখা গেলেও কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রাণময় সত্তা রূপে প্রকৃতি যেমন 'অশ্বত্থ' গল্পে চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে, তেমনি 'শীতের মাঠ', 'গগনের অসুখ' গল্পে মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনচর্যার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'মানসাঙ্ক', 'অশ্বত্থ' প্রভৃতি গল্পে নিসর্গপ্রকৃতি 'অপর' সত্তা হিসেবে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে উপস্থিত হয়েছে।

গল্পকার বিমল কর চরিত্র নির্মাণে শৈল্পিক স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ বিভিন্ন গল্পে উঠে এলেও সবক্ষেত্রেই তিনি চরিত্রের সামাজিকসত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। গল্পসৃজনে 'কাহিনি' নির্ভরতা প্রাধান্য না পাওয়ায় তাঁর গল্পে চরিত্র চিত্রণ সর্বদাই গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে চরিত্রসমূহ নির্মিত হয়েছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ,

বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সহজাত কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে বিমল করের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ আমাদের মুগ্ধ করে।

প্রাকরণিক কৃৎকৌশলের সৌকর্য বিমল করকে স্বতন্ত্র ধারার গল্পকার রূপে চিহ্নিত করেছে। এডগার অ্যালেন পো, নাথানিয়েল হথর্ন নির্দেশিত তাত্ত্বিক রীতিকে অগ্রাহ্য করে তিনি নতুন ধারার গল্প নির্মাণে ব্রতী হন। কাহিনিসর্বস্বতার পরিবর্তে অন্তর্বাস্তবতা গুরুত্ব পাওয়ায় তাঁর গল্প ক্রমশ কাব্যের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল। গল্পের পরিণতিতে নাটকীয় চমকে পাঠক-পাঠিকাকে তৃপ্ত করার পরিবর্তে গভীর জীবনবোধে প্রাণিত করাই ছিল বিমল করের শিল্পিত ইচ্ছা। ভাষার কাব্যিক মূর্চ্ছনা, চিত্রকল্প-রূপক-প্রতীকের শীলিত বিন্যাসে বিমল করের গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা আনয়নে সমর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের প্রেক্ষাপটে শিল্পগত চাহিদার ঐকান্তিকতায় বিমল কর বাংলা ছোটগল্পকে স্বতন্ত্র মাত্রায় উন্নীত করতে সফল হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা গল্পধারায় যুগস্রষ্টা শিল্পী রূপে বিমল কর সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর 'ছোটগল্প: নতুন রীতি'কে অনুসরণ করেই ছয় ও সাতের দশকে একাধিক প্রতিষ্ঠান-বিরোধী গল্প-আন্দোলন গড়ে ওঠে। আপন লেখনীর মাধুর্যময় বলিষ্ঠতায় বিমল কর বাংলা গল্পধারায় বাঁকবদলে সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদেরও ভিন্নতর সৃজনে প্রাণিত করেছেন। তাঁর সৃষ্ট গল্পের পাঠজ সংবেশনে বর্তমান কালের পাঠক-পাঠিকাদের জীবনবোধ সমৃদ্ধ হয়; একইসঙ্গে পাঠজাত সৃজনশীল ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে।

যুগোত্তীর্ণ স্রষ্টা বিমল করের গল্পের মরমী আবেদন এই একুশ শতকেও অমলিন। একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে বাংলা গল্প নানা মাত্রা সমন্বয়ে আরো এক নতুন বাঁকবদলের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। এই স্বতন্ত্র ধারা সৃজনের আবহে বিমল করের গল্পসমূহের সৃজনাত্মক পুনর্পাঠ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই 'ছোটগল্পকার বিমল কর: স্রষ্টা ও সৃষ্টি' শিরোনামের গবেষণা-অভিসন্দর্ভে আমরা তাঁর জীবন-সমকালের প্রেক্ষিতে গল্পসমূহের অনুপুঙ্খ পুনর্মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড.সরোজ কুমার পান মহাশয়ের কাছে আমি চিরঋণী। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নানা অসুবিধা

হাসিমুখে স্বীকার করে তিনি প্রতি মুহূর্তে আমায় সৃজনশীল আলোচনায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যময় সাহচর্য ও প্রশ্রয়ী স্নেহ আমাকে নানা দৃষ্টিকোণে গবেষণা সম্পাদনে প্রাণিত করেছে। তাঁর প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বিমল করের গল্প সংগ্রহ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে নানা আলোচনার তথ্য লাভে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার', 'ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার', সন্দীপ দত্ত পরিচালিত 'লিটল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্র' এর কর্মী-আধিকারিকরা ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। আর পরিবারের সকলের মিলিত সাহচর্য আমাকে 'ছোটগল্পকার বিমল কর: স্রষ্টা ও সৃষ্টি' নামাঙ্কিত গবেষণা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রাণিত করেছে। গবেষণা-কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় **স্নেহাংশু লোধ**
মেদিনীপুর